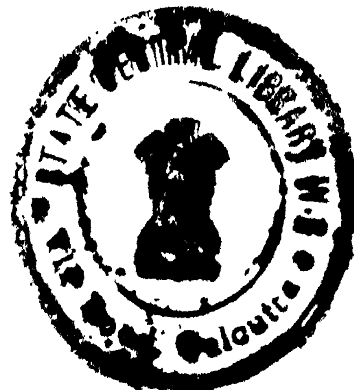

গল্প

প্রমথনাথ বিশীর

স্বনির্বাচিত গল্প





ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ

৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই মাঘ, ১৩৬২

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬



পূর্বকথা

সঙ্কলন গ্রন্থ কেন?

আমার বিশ্বাস পৃথিবীময় সঙ্কলন গ্রন্থের চর্চা অব্যাহত হইয়া আসিয়াছে। অত, ভারতেও তার গ্রন্থাগারে, স্তূপ সমুদ্র সঙ্কলন গ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। এমন মনে হওয়া কোন গ্রন্থের উভয়, প্রয়োজন আছে। আর, পাঠক কিম্বা ইহারা, তাহার পরে, সবার লইয়া সঙ্কলন গ্রন্থ কেবল কোথা দেখা দিত। তাই সবার দাবী মিটে হইত না। এমন অবস্থায় সমস্যা

সমাজবিদের প্রয়োজন উদার প্রকৃ-
-সম্পন্ন। তাহার জন্য এ সকল
প্রশ্ন উঠিবে প্রথম মনে হইতে পারে
যদি, তবে এইটাই প্রয়োজন বেশি।
অর্থাৎ প্রশ্ন প্রসঙ্গে সকলের
প্রশ্ন এই আলোচনা।

সাহিত্যিক হইলাম কেন?

ভাষাতত্ত্বের কাজের তাগিদে
অনেক সময় কিছু জানা ভাষার
উচ্চারণ শুনতে হয় এবং করতেও
আমার অনেক ভুল হয়। লেখাতে
কিছু যার প্রকাশ ইতিহাসে সম্পূর্ণ
নিয়ে সম্বন্ধের সামাজিক কাহিনী
লেখা যায়, বস্তুতঃ আর কিছু না
হোক সম্বন্ধে লোকেদের মিল
আর ভাষা প্রকাশ পায়। সেটাও
আমাদের বোঝা দরকার।

সম্পদ কেন?

গুজরাটী লোকের এই কার্য্য সত্ত্বেও ভালো পারে। ক্ষুদ্র মাপের রচনা গুজরাটীর অন্তঃস্থলের [illegible] চরিত্রের বেশী নিজ সম্পদ প্রকাশের সাহিত্যের সংস্কার। অতএব সর্বভারতীয় সম্পদ সাহিত্যের।

সাহিত্যের মানবের অন্তর্নিহিত মানবতা ইত্যাদি প্রশ্ন প্রত্যেক সাহিত্যের আছে বলেই।

শ্রী. পা. চি.

অসমাপ্ত কাব্য

সম্প্রতি যুবরাজ কুমারগুপ্ত হূণদের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বয়ং সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিলেন ; সীমান্ত অবধি যাওয়া সম্ভব হয় নাই, সীমান্ত বহুদিনের পথ, তিন দিনের পথ অগ্রসর হইয়া গিয়া যুবরাজকে স্বাগত করিলেন। পিতা ও পুত্রে সাক্ষাৎ হইলে, যুবরাজ পরাজিত হূণ সেনাপতির বিচিত্র অসি মহারাজার পদপ্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিলেন। তিনি আশীর্বাদ করিলেন,—বৎস, তুমি সর্বজয়ী হও।

মহারাজকে অভিবাদন সারিয়া কুমারগুপ্ত অন্যান্য রাজসঙ্গীর সহিত যথোপযুক্ত প্রণাম ও সম্ভাষণাদি করিলেন। প্রথমে কুলগুরুকে, পরে রাজপুরোহিতকে প্রণাম করিলেন, মহামাত্যকে নমস্কার করিলেন, প্রধান ধর্মাধিকরণকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং সবশেষে রাজসভার যুবক কবিকে সখ্যভাবে সম্বোধন করিলেন,—এই কবি ও কুমারগুপ্ত প্রায় সমবয়সী। কবি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া 'হূণারি' বলিয়া সম্বোধন করিল।

'হূণারি' ঐ শব্দটি অদূরবর্তী মহারাজার কানে গেল, তাঁহার বড় ভাল লাগিল, তিনি দেখিলেন, ঐ শব্দ কে উচ্চারণ করিল, সহজেই বুঝিতে পারিলেন, ঐ অভিধার উদ্গাতা রাজসভার যুবক কবি ছাড়া আর কেহ নয়। তিনি মনে মনে কবির প্রতি আরও সন্তুষ্ট হইলেন ; কেন না, প্রিয়জনকে যে যোগ্য সম্বর্ধনা করে, সেও প্রিয় হইয়া ওঠে।

এই যুবক কবি রাজসভাতে নবাগন্তুক। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিভাবলে সে রাজার প্রিয়পাত্র এবং রাজকুমারের প্রিয় সখা হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্যই তিনি রাজসভায় প্রাচীন কবি ও পণ্ডিতগণকে উপেক্ষা করিয়া নবাগন্তুক এই যুবককেই সঙ্গে আনিয়াছেন। নবীনের প্রতি এই অহেতুক সম্মান প্রকাশে প্রাচীনেরা তর্ক তুলিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাট্ বলিয়াছিলেন, বয়স কাহারো অধীন নয়, এই কবির বয়স অল্প সত্য, কিন্তু প্রতিভায় সে কাহারো ন্যূন নহে, আর কবির মধ্যে আমরা প্রতিভার সম্মান করি, বয়সের নয়।

তারপরে তিনি বলিলেন—তাঁহার সেই সুধাক্ষরী অপূর্ব নাটকখানির কথা কি আপনারা ভুলিয়া গেলেন ?

প্রাচীনেরা আর কি উত্তর দিবেন ! তখন তাঁহারা সকলেই নাটকখানির প্রশংসাবাদ করিয়াছিলেন।

কবি রাজসভায় প্রথম আসিবার অল্পদিন পরেই চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে একখানি নাটক রচনা করিতে তিনি কবিকে আদেশ করেন। বলেন যে, যুবক! অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তোমাকে কবিরূপে গ্রহণ করিয়াছি। এবারে যে সুযোগ পাইলে, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ভুলিও না।

সুযোগের অপব্যবহার কবি করে নাই। এই উপলক্ষ্যে লিখিত বিক্রমোর্বশী নাটক রসিকসমাজকে সাধারণ ভাবে ও নবগৃহীত-অভিধা স্বয়ং বিক্রমাদিত্যকে বিশেষভাবে প্রীত করিয়াছিল। তারপর হইতে যুবকের প্রতি মহারাজার স্নেহ সবিশেষ বর্ধিত হইল। অনুক্ষণ তাহাকে তিনি সঙ্গে রাখিতেন, এখনও সঙ্গে অনিয়াছেন।

সৎ কাব্য রচনার ক্ষমতা ছাড়া কবির আর একটি বিশেষ গুণ ছিল, যে জন্য সে কাব্যরসিক মহারাজা ও যুবরাজের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

সাধারণ লোকের পক্ষে নিশ্বাস প্রশ্বাস যেমন সহজ, কবির পক্ষে সরস ও হৃদয়গ্রাহী বাক্যপ্রয়োগ তেমনি অনায়াস ছিল। অনেক কবি সৎকাব্য লেখেন বটে, কিন্তু অন্য সময় তাঁহারা অত্যন্ত নীরস। ইহার স্বভাব স্বতন্ত্র, সর্বদা একটি রসের পরিমণ্ডল যেন ইহার চারিদিকে বিরাজিত, সৎকাব্যও তাহারই অন্যতম। চাঁদ সুধা ধরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার জ্যোৎস্না কেন ধরিয়া রাখে না, রাখিলে তাহাতেও সুধার স্বাদ পাওয়া যাইত। তাহার বিদগ্ধ বাক্‌প্রবাহের যে অনায়াস সরসতায় সকলে আনন্দিত হইত, তাহা কেহ সঞ্চয় করিয়া রাখিত না, রাখিলে এমন কত কাব্য ও নাটক হইতে পারিত। তাহা হয় নাই বটে, কিন্তু কবি নিজে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। মহাকবিগণের সঙ্গ কখনোই নীরস হতে পারে না।

ঐ হুণারি শব্দে অনেক কথাই মহারাজার মনে পড়িল ; মনে পড়িল, প্রাচীনগণের বাধার বিরুদ্ধে তাহাকে গ্রহণ ; মনে পড়িল, প্রাচীন সভাকবি দেবভট্টের সুস্পষ্ট ঈর্ষ্যা সত্ত্বেও নবাগন্তুকের উপরে নাটক রচনার ভার সমর্পণ ;

মনে পড়িল, বিশ্রম্ভক্ষণের আনন্দদায়ক তাহার অজস্র কৌতুকস্ফুরী বিদগ্ধ সুভাষিতাবলী—অবশেষে মনে পড়িল, ঐ হূণারি শব্দটি! কত স্বল্পে, কত সংক্ষেপে, কত অনায়াসে সকলের মনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে উহাতে। প্রাচীন দেবভট্ট মাথা কুটিয়া মরিলেও উহা বাহির হইত না। মহারাজা স্থির করিলেন, কুমারকে 'হূণারি' উপাধিতে ভূষিত করিবেন আর সেই উপলক্ষ্যে কবিকে একখানি কাব্য রচনা করিতে আদেশ দিবেন।

২

রাজধানীতে ফিরিয়া মহারাজা ঘোষণা করিলেন যে, হূণজয়ী যুবরাজ কুমারগুপ্তকে তিনি 'হূণারি' উপাধিতে ভূষিত করিবেন। এই সংবাদে রাজধানীর উচ্চনীচ সকলেই খুশী লইল। খুশী হইবার কথাই তো, যুবরাজ সকলের প্রিয়পাত্র, তাঁহার গৌরবে সকলেরই গৌরব। তা ছাড়া অন্য কারণও আছে। এই উপলক্ষ্যে রাজধানীতে জনসমাগম হইবে, কেনাবেচায় বিলক্ষণ দু' পয়সা লাভ হইবে; যাহাদের কিনিবার বেচিবার নাই, তাহারা এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত কত কৌতুক তামাসা দেখিতে পাইবে, আর ফলাহারের তো কথাই নাই, রাজবাড়ীর ব্যাপার, সে এক 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' ব্যাপার, কেহই বাদ পড়িবে না।

মহারাজার আদেশে দূর-দূরান্তে নিমন্ত্রণপত্রসমূহ প্রেরিত হইল। হূণযুদ্ধে যে-সব সামন্ত নৃপতিগণ সাহায্য করিয়াছিল, তাহারা আসিবে; সাম্রাজ্যের বাহিরে যে-সব স্বাধীন নৃপতি আছে, তাহারাও আসিবে; ছোট বড়, আহুত অনাহুত, রবাহুত কেহই বাদ পড়িবে না।

একদিন রাজসভায় মহারাজা যুবক কবিকে বলিলেন—কবি, উপাধিদান উপলক্ষ্যে তোমাকেও কিছু কাজের ভার দিব।

কবি বলিল—মহারাজার অর্পিত ভার মহারাজার প্রদত্ত মালার মতোই গৌরবে মস্তকে বহন করিব।

সম্রাট্ বলিলেন—তোমাকে একখানি কাব্য রচনা করিতে হইবে।

কবি বলিল—যে-আজ্ঞা, মহারাজ!

—তোমাকে বিশদভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই, তুমি রসজ্ঞ, উপলক্ষ্যের

মর্ম তুমি জানো, অধিক বলা অনাবশ্যক, যেহেতু কল্পনাদীন ব্যক্তিকেই বুঝাইয়া বলিবার দরকার হয়।

—মহারাজ, আপনার কথাগুলি আমার সম্বন্ধে সত্য না হইলেও মধুর, উহাতে আমার পরিচয় না থাক, আপনার পরিচয় অবশ্যই আছে।

তারপর কবি বলিল—আপনার কাছে একটি প্রার্থনা আছে। সে প্রার্থনা পূরণ হইবার আশা আছে কি না জানি না, কিন্তু পূরণের আশা না থাকিলেও মহতের কাছেই যাচ্ঞা করিতে হয়, অধমের কাছে কখনোই নয়। কাব্য রচনার জন্য কিছু সময় দিতে হইবে।

—অবশ্যই সময় পাইবে। উৎসবের এখনো বিলম্ব আছে।

—অনুগৃহীত হইলাম, মহারাজ!

রাজা ও কবিতে যখন এইরূপ আলাপ হইতেছিল, তখন অদূরে উপবিষ্ট দেবভট্ট ঈর্ষ্যায়, ক্ষোভে, সংসারে ন্যায়বিচারের অভাবে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিল। তাঁহার প্রতি কাব্যরচনার ভার পড়িল না, পড়িল ঐ নবাগন্তুক গ্রাম্য কবিটার উপরে—ইহাতেই তিনি নতমস্তক হইয়াছিলেন। তারপরে যখন কবির মুখে মধুক্ষরী বাক্য বাহির হইতে লাগিল, তিনি স্থির করিলেন, লোকটা ঐ সব বাক্য সংগ্রহ করিয়া সভায় আসে, নতুবা অকস্মাতের তাগিদে মানুষ যে এমন ভাবে কথা বলিতে পারে, তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু বিপদ্ এই যে, কবির দৃষ্টান্তে নিজেও ঐরূপ বাক্য ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছেন—ভাবিয়া পান নাই। দু'একবার কবির অনুরূপ বাক্য সভাস্থলে প্রয়োগও করিয়াছেন—কিন্তু তাহা মোহকর হয় নাই, হাস্যকর হইয়াছে।

আজ যাচ্ঞার পাত্র সম্বন্ধে সুভাষিতটি শুনিয়া দেবভট্ট ভাবিলেন, ভণ্ড কোথাকার! ধার-করা ময়ূরপুচ্ছ গায়ে লাগাইয়া আসিয়াছ, কিন্তু তুমি দাঁড়কাক ছাড়া আর কিছুই নও।

সভা ভঙ্গ হইলে সন্ধ্যার পরে তিনি রাজপুরোহিতের আবাসে গিয়া দেখা দিলেন।

৩

দেবভট্ট যখন রাজপুরোহিতের আবাসে যাইতেছিলেন, কবি যুবক তখন আর্যা শিলাবতীর গৃহাভিমুখে চলিতেছিল। আর্যা শিলাবতী মহাকালমন্দিরের

প্রধানা দেবদাসী, নগরের প্রান্তে শিপ্রা নদীর তীরে তাঁহার বাসভবন। সে আপন মনে কত কি ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিল। পথ সংকীর্ণ এবং সর্পিল, তারপরে সর্বত্র সমতল নয়, কাশীর গলিতে মাঝে মাঝে যেমন সোপানাবলী আছে, তেমনি সোপানাবলীহেতু বন্ধুর। কিন্তু এ পথ তাহার বহুদিনের পরিচিত বলিয়া অন্যমনস্কতা তেমন বাধা জন্মাইতে পারে না। অর্ধমনস্ক কবির প্রথম হুঁশ হইল মহাকালমন্দিরের গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনিতে। সে চমকিয়া উঠিল—এ কি, ইতোমধ্যে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছি? তাহার মনে পড়িল—সেই প্রথম সভার স্মৃতি, যখন সে রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; মনে পড়িল, এখানেই তাহার সঙ্গে আর্যা শিলাবতীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়! সেদিন কীই বা তাহার পরিচয় ছিল, 'ঋতুসংহার' নামে একটি খণ্ড কবিতামাত্র ছিল, গ্রামে থাকিতেই লেখা, সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। শিলাবতীর রসবোধ আছে বটে—ঐ কবিতাটি শুনিয়াই কবির গৌরবময় ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তারপরে একদিকে শিলাবতীর সহায়তার দাক্ষিণ্য; আর এক দিকে মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী; সেদিনকার অখ্যাত অজ্ঞাত কবি আজ রাজার সভাসদ্, মহারাজার অনুগৃহীত—শুক্লা তৃতীয়ার চন্দ্রকলা যেমন একটি সুকুমার সোনার বন্ধনী পৃথিবী ও আকাশকে সংযুক্ত করিয়া রাখে, শিলাবতীর সুকরুণ সান্নিধ্য তেমনি কবির অতীত ও বর্তমানকে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

চিন্তায় শিথিলগতি কবি পুনরায় দ্রুত পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু মনটাকে অতীতের স্মৃতি হইতে ফিরাইতে পারিল না; কবি ভাবিল, রথ সম্মুখের দিকে চলিলেও পতাকার টান পিছনের দিকেই থাকিয়া যায়।

৪

শিষ্টসম্ভাষণাদির পরে দেবভট্ট ও রাজপুরোহিতের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্তা হইতেছিল—

দেবভট্ট। তারপরে দেখলেন ব্যাপারখানা।

পুরোহিত। দেখলাম বই কি। এ তো মহারাজার যোগ্য ব্যবহার বটে।

দেবভট্ট। শেষে আপনিও এই কথা বললেন।

পুরোহিত। কেন, আপনি কি অন্যরূপ মনে করেন নাকি?

দেবভট্ট। করবো না? ঐ অর্বাচীন যুবককে।

পুরোহিত। এ কি বলছেন! যুবক অল্পবয়স্ক হ'তে পারে, কিন্তু অর্বাচীন কেন?

দেবভট্ট। অর্বাচীন নয়? এক শ বার অর্বাচীন। তারপরে কি দম্ভ?

পুরোহিত। আমি এরূপ পাপমন্ত্রণায় নাই।

দেবভট্ট। পাপমন্ত্রণা? পাপমন্ত্রণা তো অপর পক্ষে। আমি এখনও সেই অহঙ্কারবাণী শুনতে পাচ্ছি—"শৃণুত জনা। অর্বানাৎ ক্রিয়ামিমাং কালিদাসস্য।" মহাকবি কালিদাসের সৎপ্রবন্ধ মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন।

পুরোহিত। ওঃ, আপনি কালিদাসের কথা বলছেন? আমি ভেবেছিলাম যুবরাজের কথা।

দেবভট্ট। শান্তম্ পাপম্! যুবরাজের কথা। কি আপদ্।

পুরোহিত। হাঁ, এ বিষয়ে আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। আপনাকে অবহেলা করে তাকে কাব্য রচনার ভার দেওয়া উচিত হয় নি।

দেবভট্ট। মহারাজ বিস্মৃত হ'য়েছেন যে, পুরাতন তণ্ডুল কীটদষ্ট হ'লেও যথার্থ পণ্য! আমি বলছি, যুবক এবারে একটা অনর্থ ঘটিয়ে বসিবে। ঐ নবাগন্তুক অর্বাচীন দেবতার বিভূতি ও রাজবংশের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জানে কি?

পুরোহিত। এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত।

দেবভট্ট। ওর কবিত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচীন কবিগণের অনুকরণ, আমি পুঁথিপত্র ঘেটে সব প্রমাণ ক'রে দেবো। কেবল ওর নিজস্ব অহঙ্কার আর চাটুবাজী।

পুরোহিত। আপনি এ বিষয়ে একদিন প্রবন্ধ করুন।

দেবভট্ট। করবো কি! লোকটা চাটুবাদের মধু দ্বারা মহারাজা, যুবরাজ ও পাণ্ডিত্যহীন সভাসদ্গণকে যেরূপ মুগ্ধ ক'রে রেখেছে।

পুরোহিত। কিন্তু বিক্রমোর্বশী নাটকখানার আপনিও তো প্রশংসা ক'রেছিলেন।

দেবভট্ট। না ক'রে উপায় কি? মহারাজা প্রশংসা করলেন, কাজেই আমাকেও করতে হ'ল।

পুরোহিত। কিন্তু নাটকখানায় কবির প্রতিভাই প্রকাশ পেয়েছে।

দেবভট্ট। প্রকাশ পেয়েছে ওর চাটুবাদের কৌশল আর গ্রাম্যতাজাত দম্ভ! মহারাজার বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ উপলক্ষ্যটাকে সূত্র ক'রে নাটকের নাম ছিল বিক্রমোর্বশী! ব্যঞ্জনা দ্বারা বুঝিয়ে দিল যে, মহারাজাই বিক্রম আর উর্বশী হচ্ছে যে পৃথিবীজাত কন্যা, অর্থাৎ কি না মহারাজা বিক্রমের দ্বারা সসাগরা পৃথিবীকে জয় করলেন। আর অমনি মহারাজকে চন্দ্রবংশোদ্ভূত বলে বর্ণনা করাও হ'ল। কি চাটুবাদ!

পুরোহিত। আমার কিন্তু এত মনে হয়নি।

দেবভট্ট। আপনার সরল মন। যার মনে হ'বার ঠিক হ'য়েছে, তারপর থেকেই লোকটার প্রতি মহারাজার প্রসাদ শতগুণে বেড়ে গিয়েছে।

পুরোহিত। সে কথা সত্য বটে।

দেবভট্ট। আমি বলে রাখছি, এই নূতন কাব্য প্রণয়ন উপলক্ষ্যে এমন নূতনতর, মধুরতর চাটুবাদ বর্ষণ করবে যে, মহারাজা আর যুবরাজ দু'জনেই অধিকতর বশীভূত হয়ে পড়বে।

পুরোহিত। তা হ'লে বলতে হবে, লোকটার শক্তি আছে।

দেবভট্ট। শক্তি না শক্তু! মাথা আর মুণ্ডু! ওর পিছনে রয়েছে সেই ডাকিনীর ছায়া।

পুরোহিত। ডাকিনী? কে?

দেবভট্ট। শিলাবতী।

পুরোহিত। এ কি অনার্য উক্তি! আর্যা শিলাবতী মহাকালের প্রধানা দেবদাসী।

দেবভট্ট। দেবদাসী! বলুন দৈত্যদাসী! ডাকিনী, নাগিনী, পাপিনী, তাপিনী! রাজসভা ও রাজদেবালয়ের মধ্যে আপনার গতিবিধি। নগরের লোক ওদের নিয়ে কি বলাবলি করে, তা আপনি জানেন না!

পুরোহিত। জনশ্রুতিতে কর্ণপাত অবিধেয়!

দেবভট্ট। জনশ্রুতি! ও লোকটা প্রথমে এসে শিলাবতীর গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল।

পুরোহিত। এরূপ শুনেছি বটে!

দেবভট্ট। তারপরে শিলাবতীর অনুগ্রহেই প্রধানামাত্যের প্রসাদ লাভ করে লোকটা!

পুরোহিত। তাও শুনেছি! কিন্তু তর্ক এই যে, সবাই কেন ওকে প্রসাদ দিতে উদ্যত।

দেবভট্ট। উদ্যত হবে না? প্রধানামাত্যের প্রধানা উপপত্নী মালব দেশের মেয়ে।

পুরোহিত। তা হবে!

দেবভট্ট। আর কালিদাসের প্রথম নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র।

পুরোহিত। সে নাটকের অভিনয়ে আমি উপস্থিত ছিলাম।

দেবভট্ট। আপনি তো কেবল নাটকই দেখেছেন।

পুরোহিত। আর কি দেখবার থাকতে পারে?

দেবভট্ট। ঐ তো বললাম, প্রধানামাত্যের প্রধানা উপপত্নী মালবকন্যা আর নাটকখানির নাম মালবিকাগ্নিমিত্র! এবার যোগাযোগ ক'রে নিন।

পুরোহিত। ওঃ, বুঝেছি! প্রকারান্তরে তাকেই মালবিকা বলা হ'ল।

দেবভট্ট। আরও প্রকারান্তরে প্রধানামাত্যকে অগ্নিমিত্র বলা হ'ল।

পুরোহিত। অহো, কি বুদ্ধি!

দেবভট্ট। একেই বলে পাপবুদ্ধি। তারপরে প্রধানামাত্য খুশী হয়ে মহারাজার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলেন। নিছক চাটুবাদের সোপানে লোকটা উঠছে—আরও উঠবে। দেখুন না, এবার কি ক'রে বসে! হয় তো মহারাজকে এবার স্বয়ং মহাদেব বা ইন্দ্র বলে বসবে।

পুরোহিত। আপনার উপর অবিচার হয়েছে সন্দেহ নেই। শুনুন পণ্ডিত-প্রবর, আমি বরঞ্চ এক কাজ করি। আমি যুবকের আবাসে গিয়ে বোঝাই যে, এ ভার তার পক্ষে গ্রহণ করা অকর্তব্য। সে ছেড়ে দিলে এ ভার আপনার উপরে আপনি এসে পড়বে।

দেবভট্ট। আপনি ধার্মিক পুরুষ আর সরলচিত্ত ব্যক্তি, এ সঙ্কল্প আপনার মতোই হয়েছে। কিন্তু পাষাণে নাস্তি কর্দমঃ—পাষণ্ড ও-সব শুনবে না। তা'ছাড়া, আপনি কি তাকে আবাসে গিয়ে পাবেন?

পুরোহিত। এত রাত্রে আর কোথায় যাবে?

দেবভট্ট। অনেক স্থান আছে, সেখানে যাওয়ার পক্ষে রাত্রিই প্রশস্ত সময়।

পুরোহিত। কোথায়?

দেবভট্ট। কোথায়? তবে শুনুন, আমি নিশ্চয় ক'রে বলছি, এখন সে শিলাবতীর কুঞ্জে।

পুরোহিত। কাব্যরসচর্চা হচ্ছে নিশ্চয়।

দেবভট্ট। নবরসের মধ্যে যে-কোন একটা রসের চর্চা যে হচ্ছে, তা নিশ্চয়।

ঠিক সেই সময়ে আর্যা শিলাবতী ও কালিদাসের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইতেছিল—

শিলাবতী। কবি, আমি জানি, আচার্য দেবভট্ট তোমার প্রতি সন্তুষ্ট নয়, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? মহারাজা উপলক্ষ্য মাত্র, তোমার জন্মমুহূর্তে স্বয়ং দেবী সরস্বতী এ ভার তোমাকে দিয়েছেন। কাজেই তোমার দ্বিধা করা অনুচিত।

কালিদাস। আর্যে, আমার কাছে তুমিই মূর্তিমতী বাণী।

শিলাবতী। আমিও উপলক্ষ্য। সুর বীণাকে আশ্রয় ক'রেই জাগে, তবু বীণাযন্ত্র উপলক্ষ্যের অধিক নয়। যে গান বীণাকে অতিক্রম ক'রে না যায়, সে তো গানই নয়। তোমার কাব্যও উপলক্ষ্যকে অতিক্রম ক'রে যাবে! যখন তা' সম্পূর্ণ হবে, দেখতে পাবে—কোথায় উজ্জয়িনী, কোথায় উজ্জয়িনীর মহারাজা, আর কোথায়ই বা হূণযুদ্ধবিজয়ী যুবরাজ! সকলকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে সত্যতর হ'য়ে উঠেছে তোমার কাব্য, উপলক্ষ্যের মূল সূত্র ঢাকা পড়ে গিয়েছে তার বিকশিত দলগুলির অন্তরালে, যেমন ঢাকা দিয়েছে তোমার গলার মালার ফুলগুলিতে মালার সূত্রটি।

কালিদাস। এ মালাও যে তোমারি দান।

শিলাবতী। কিন্তু মালাও যে উপলক্ষ্য।

কালিদাস। এ কথা বার বার কেন বলছ? আজ আমি যা, তার মূলে যে তুমি।

শিলাবতী। আমার সেই প্রেরণার মূলে রয়েছে তোমার প্রতিভা। আমার সহচরী নিপুণিকা সন্ধ্যাবেলায় ঐ যূথীর মালাটি গেঁথেছিল, কিন্তু ওখানে থাকলে তো চলবে না, যাও সিপ্রাতীরের যূথীবনে, সেখানে ফুলের প্রাচুর্য তো নিপুণিকার সৃষ্টি নয়।

কালিদাস। আমার অতদূর গিয়ে কাজ নেই।

শিলাবতী। এ কবির মতো উক্তি নয়।

কালিদাস। কেন ?

শিলাবতী। যূথীবন যেমন ফুল না ফুটিয়ে পারে নি, তোমারও কাব্য না লিখে উপায় নেই।

কালিদাস। তাতে যদি লোকে অপ্রসন্ন হয়।

শিলাবতী। সিপ্রাতীরে এমন কীট থাকা অসম্ভব নয়, যার কাছে যূথীর সুগন্ধ মধুর নয়, তাতে কি আসে যায় ?

কালিদাস। আসল কথা কি জানো ? এসব যুদ্ধ কলহ দ্বন্দ্ব আমার ভালো লাগে না—আমার ইচ্ছা করে, তোমাকে অবলম্বন ক'রে একটি পরিপূর্ণ কাব্য রচনা করি।

শিলাবতী। সে কাব্য রচিত হ'লে দেখবে, তা আমাকে অতিক্রম ক'রে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে।

কালিদাস। তার কারণ, তোমার বাস্তব সত্যকে অতিক্রম ক'রে বিরাজ করছে তোমার পরম সত্য, ফুলকে অতিক্রম ক'রে যেমন বিরাজ করে তার গন্ধের পরিমণ্ডল।

শিলাবতী। সত্য কথাই বলেছ। তেমনি মানব সংসারের একটি বৃহত্তর কাজেই সত্যতর রূপ বিরাজ করছে এই যুদ্ধ বিগ্রহের ক্ষুদ্র রূপের ঊর্ধ্বে।

কালিদাস। পড়ে মরুকগে যুদ্ধবিগ্রহ আর তার ক্ষুদ্র রূপ বৃহৎ রূপ! শিলাবতি, তুমি সুন্দর, তুমি অপরূপ সুন্দর।

শিলাবতী। এখানেও আমি উপলক্ষ্য। তোমার মনে সৌন্দর্যের যে আদর্শ নীহারিকারূপে ঘূর্ণ্যমান, আমাকে অবলম্বন ক'রে তা একটা রূপ পাবার চেষ্টা করছে।

কালিদাস। লোকে ভাবে, আমি চাটুবাক্যের দ্বারা উন্নতির পথ প্রশস্ত করছি। তারা বলে যে, মালবিকাগ্নিমিত্রে মহামাত্যের স্তুতি করেছি, বিক্রমোর্বশীতে মহারাজার স্তুতি করেছি—সব মিথ্যা, মিথ্যা। তারা যদি সত্যিই জানতো আমি কার স্তুতি করছি……

শিলাবতী। কার স্তুতি করছো ?

কালিদাস। মালবিকা যার ছায়া, উর্বশী যার ছায়া, সেই নারীর।

শিলাবতী। কে সেই সৌভাগ্যবতী ?

কালিদাস। তুমিও জানো না ? কেন ছলনা করছো—তুমি! তুমি! তুমি!

শিলাবতী। অবশ্যই জানতাম, কিন্তু ছলনায় যে তুমিই পড়েছো।

কালিদাস। কেন?

শিলাবতী। মালবিকা আর উর্বশী আর এই শিলাবতী, তিনজনেই সেই নারীর ছায়া।

কালিদাস। কোথায় সে?

শিলাবতী। তোমার কল্পনায়।

কালিদাস। কি তার নাম?

শিলাবতী। সৌন্দর্যলক্ষ্মী—অন্য যে-কোনও নাম দিতে পারো—তাতে কিছু আসে যায় না।

কালিদাস। শিলাবতি, তুমি পাষাণী।

শিলাবতী। তুমি আগেই তো একবার বলেছ সুন্দর।

কালিদাস। ও দুই কি তবে এক?

শিলাবতী। নয় কেন? আমাদের মহাকালমন্দিরের উত্তর দিকে সেই যক্ষিণীমূর্তিটি দেখনি?

কালিদাস। সুন্দর বটে।

শিলাবতী। ও সৌন্দর্য কি পাথরে ছাড়া আর কিছুতে ফুটতে পারতো!

কালিদাস। কেন, রতির আশ্রয় কি মদন নয়?

শিলাবতী। রতি যে মুগ্ধ সৌন্দর্যের প্রতীক, তাই তার আশ্রয় মদন। তাঁর সঙ্গে তুলনা করো পার্বতীর, সে যে অপরূপ, সে যে তুলনারহিত, তাই সে অবলম্বন করেছে মহাদেবীকে! মহৎ সৌন্দর্যের মহৎ অবলম্বন। কবি, শুনেছি তোমার ঋতুসংহার কাব্য, মুগ্ধ সৌন্দর্যের সুনিপুণ আলিম্পন। দেখেছি তোমার মালবিকা আর বিক্রমোর্বশী, এ দু'টি জ্যোৎস্না রাত্রির কুমুদ কহ্লার! কিন্তু তোমার কাছে যে আমার প্রত্যাশার অবধি নেই! ওতে আমি সন্তুষ্ট হব না। এবারে যাও, করো মহৎ সৌন্দর্যের জয়ধ্বনি, পূর্ণ বিকশিত হোক সেই শতদল প্রচণ্ড সূর্যের তাপকে অঙ্গের বিভূতি ক'রে! কবি, এবারে গাও হর-পার্বতীর মিলনবার্তা, পুড়ে মরুক তোমার মুগ্ধ মদন মহৎ সৌন্দর্যের আত্মদানের হোমপূতাগ্নিশিখায়।

কালিদাস। এ কি মানুষে সম্ভব?

শিলাবতী। মহামানুষে সম্ভব।

কালিদাস। মহামানুষ কে?

শিলাবতী। মহাকবি! আমি তো তোমার প্রতিভার অন্ত দেখি না, পূর্বাপর-সাগরবিস্তৃত হিমালয়ের ন্যায় তোমার প্রতিভা পৃথিবীর মানদণ্ড—তার অসম্ভব কিছু দেখি না।

কালিদাস। শিলাবতি, তোমাতে সবই গুণ, কেবল একটিমাত্র দোষ।

শিলাবতী। গুণ তো বুঝলাম, দোষ কি শুনি।

কালিদাস। আমার প্রতিভার প্রতি অহৈতুক আস্থা।

শিলাবতী। এ ছাড়া আর কিছু নয় তো! তা, চাঁদের অনেক গুণের মধ্যে একটি মাত্র দোষের মতো চোখে পড়বে না।

কালিদাস। তোমার উক্তিগুলি মুক্তাফল, সংগ্রহ ক'রে রাখলে বাণীর অলঙ্কার হবে।

শিলাবতী। রাখো, রাখো, তুমি পাকা জহুরী।

কালিদাস। এবারে উঠি, অনেক রাত্রি হল।

শিলাবতী। মনে পড়েছে?

কালিদাস। তোমার কাছে এলে সব ভুলে যাই।

শিলাবতী। কিন্তু তারা ভোলে না, যারা অনেক রাত্রে তোমাকে ফিরে যেতে দেখে আমার কুটীর থেকে।

কালিদাস। তারা একেবারেই অভাজন। হৃদয়কে নাড়া দিতে পারে অনেক রমণী, কিন্তু যার আবেগ কল্পনা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়, তাকে নাড়া দেয় —এমন নারী দুর্লভ!

শিলাবতী। এবারে সেই দুর্লভই হোক তোমার কাব্যের বিষয়!

কালিদাস। তারই তো সাধনা করলাম এতক্ষণ, এতদিন।

শিলাবতী। এতদিন সে ছিল কবির বিষয়, এবারে হোক কাব্যের বিষয়। দু'য়ে অনেক প্রভেদ।

কালিদাস। শিলাবতী জানো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

শিলাবতী। আমি তো জানিই—এমন কি, পাড়ার লোকেরও জানতে বাকি নেই।

কালিদাস। মানে, তারা কিছুই জানে না! তারা কি জানে যে,

জোয়ারের তরঙ্গদলের মধ্যেই চাঁদের ছায়া থাকে—যে চাঁদ তাকে জাগিয়ে দেয়, তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

শিলাবতী। কেমন ক'রে জানবে? সংসারে সবাই তো কবি নয়। তারা সাদা চোখে দেখে, মধ্যরাত্রে এক যুবক নিঃসঙ্গ এক রমণীর ঘর থেকে বেরোচ্ছে। এই কি যথেষ্ট নয়?

কালিদাস। নিন্দার পথ আর প্রশস্ত হবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।

শিলাবতী। আগামী রাত্রি পর্যন্ত, কি বলো?

কালিদাস। নেহাত মিথ্যা বলোনি, যাই আজ, আর সুযোগ দেওয়া নয়—অতএব চললাম।

শিলাবতী। পথ নির্বিঘ্ন হোক।

কালিদাস। তোমার সুপ্তির মতো!



শিলাবতীর কুটীর নগরের একান্তে অবস্থিত। তার পরে একখানি মাঠ। মাঠের পরেই নদীতীরে মহাকালের মন্দির, সেখান হইতেই রীতিমত নগরের আরম্ভ। কালিদাস কুটীর ছাড়িয়া মাঠের মাঝে পড়িল। যূথী-পরিমলের সহিত মিশিয়া কেতকীর আর্দ্র সুগন্ধ বাতাসে একখানি চন্দ্রাতপ বুনিয়া দিয়াছে। রাত্রি গভীর। কৃষ্ণা দশমীর চাঁদ অর্ধবিকশিত কহ্লারের মতো আকাশে ভাসিতেছে, তাহার কিরণ এমন সতেজ নহে যে, নিদ্রিত পাখীর স্বপ্নভঙ্গ করিয়া অকালকূজন জাগাইয়া দেয়। নির্জন পথ ধরিয়া কবি আপন মনে চলিতেছে, মহাকালের মন্দিরের নিকটে আসিয়া তাহার চৈতন্য হইল। সেই অন্ধকারে ঘনতর অন্ধকারের মতো কালো পাথরে গড়া মন্দিরটি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। কবি কি ভাবিয়া তাহার অলিন্দে একটি স্তম্ভের নিকট বসিল। তাহার নিভৃত চিত্তে, গিরিগুহায় প্রতিধ্বনির মতো শিলাবতীর বাক্যগুলি ঘুরিয়া মরিতেছে। কতক্ষণ সে এভাবে বসিয়াছিল জানি না—যখন তাহার সম্বিৎ হইল, উত্তর দিকের আকাশে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। এক দিগন্ত হইতে অন্য দিগন্ত অবধি মেঘমালা প্রসারিত, স্তরে স্তরে মেঘ, মেঘের উপরে মেঘ, কবির মনে হইল, দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় যেন আপন রহস্যময় বিশাল পট সন্ধানী কবির চোখের সম্মুখে মেলিয়া দিয়াছে। মেঘান্তরালে দশমীর চন্দ্রের অধিকাংশ লুপ্ত,

যেটুকু দৃশ্যমান, তাহাতে রহস্য লঘুতর না হইয়া আরও ঘন হইয়া উঠিয়াছে। জলদজালের কোথাও কোথাও চন্দ্রালোক পড়িয়া গৈরিকোজ্জ্বল গিরিগাত্রের মতো প্রতিভাত; কোথাও ঘনান্ধকার গিরিগুহার মতো রহস্যময়, মেঘগাত্রে ছোট ছোট বিদ্যুৎশিখা গিরিগাত্রে সঞ্চরণশীল কিন্নররমণীগণের মতো চঞ্চলা; মাঝে মাঝে চাপা মেঘের ধ্বনি গিরিকন্দরে বিবর্ধিতশব্দ কুঞ্জরবিজয়ী সিংহ-গর্জনের মতো গম্ভীর; আবার সব নিস্তব্ধ! এই মেঘমালা দর্শনে কবির কল্পনায় নগাধিরাজের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল আর জোয়ারের সূত্রপাতে যেমন একপ্রকার স্বতঃস্ফূর্ত অস্ফুট কল্লোল জাগে—তেমনি করিয়া মনে জাগিল,

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা

হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

চকিত কবি বুঝিল যে, কবির প্রতি সদয় মহাকাল অনাগত কাব্যের বাণীময় প্রথম ইঙ্গিতটি দান করিয়াছেন। আর বিলম্ব না করিয়া মহাকালের উদ্দেশ্যে একটি প্রণতি নিবেদন করিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

৬

কালিদাস নূতন কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়াছে। প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে নূতন রচিত সর্গটি শিলাবতীকে সে শুনাইয়া যায় আর তার পরিবর্তে শিলাবতীর প্রসন্ন হাসি ও কণ্ঠের মালা লাভ করে।

ওদিকে নগরে আসন্ন উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। উজ্জয়িনী সুবৃহৎ নগর, তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ নগর, কিন্তু হইলে কি হয়, এত লোকসমাগম হইবে যে, কুলাইবার কথা নয়। তাই নগরের বাহিরে শিবির-সন্নিবেশ চলিতেছে। উজ্জয়িনীর এক দিকে সিপ্রা নদী, তিন দিক্ প্রাচীরে বেষ্টিত, মাঝে মাঝে বিরাট্ সব সিংহদ্বার। প্রাচীরের বাহিরে কতক দূর পর্যন্ত উচ্চ প্রান্তর, তারপরে শস্যক্ষেত্র। ঐ মাঠের মধ্যে সারি সারি শত শত শিবির পড়িতেছে, অসমতল স্থান কাটিয়া সমান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চকমিলান আকারে শিবিরসন্নিবেশ হইতেছে—এক একটি চকের মাঝে ফুলের বাগান রচিত হইয়াছে, ফুলের বাগানের মাঝে ফাঁক, লোক বেড়াইতে পারিবে। মাঠের একদিকে বিপণি-শ্রেণী বসিয়াছে, দূরদূরান্ত হইতে ব্যবসায়ী, বণিক্ আসিয়াছে, আনিয়াছে—মনোহর সব শিল্পজাত দ্রব্যাদি। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা, গুর্জর

হইতে মগধ, বঙ্গ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ সকল দেশের নৃপতিগণ, পণ্ডিতগণ, ব্যবসায়িগণ আসিবে, অনেকে ইতোমধ্যেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কেহ অশ্বে আসিয়াছে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ হস্তীতে, বাজে লোকেরা গো-যানে। এই সব ভারবাহী শত সহস্র পশুর খাদ্য যোগানো দায়, সুযোগ পাইলেই তাহারা শস্যক্ষেত্রে গিয়া পড়ে, তখন কৃষকে আর পশুর মালিকে কলহ বাধিয়া যায়। সমগ্র ভারতবর্ষের যাহা কিছু রম্য, যাহা কিছু কাম্য, সবই আজ উজ্জয়িনীর প্রান্তে সমবেত।

একদিকে স্বাধীন নৃপতিগণের শিবির, একদিকে মিত্র-নৃপতিগণের শিবির। প্রত্যেক নৃপতির সঙ্গে তাঁহার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীর, শ্রেষ্ঠ কবি ও পণ্ডিত, শ্রেষ্ঠ সব ব্যবসায়ী আসিয়াছে ; একের সহিত অপরের ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতা পড়িয়া গিয়াছে—কেহ হার মানিতে রাজী নয়।

নগরের মধ্যেও জনতা অল্প নয়। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আসিয়া ভিড় করিয়াছে, কাহারো গৃহে আর তিলধারণের স্থান অবশিষ্ট নাই। পথে চলা দায়। অল্পদিনের মধ্যে সরোবর যেন কূল ছাপাইয়া গিয়াছে—এমনি থমথমে থই থই ভাব।

রাজপ্রাসাদে আয়োজনের আড়ম্বরের বর্ণনা সম্ভব নয়।

কালিদাস যেদিন নূতন কাব্যের শেষ সর্গটি আর্যা শিলাবতীকে শোনাইল, শিলাবতী গলার মুক্তার হার খুলিয়া কবিকণ্ঠে অর্পণ করিল। কালিদাস বলিল—আজ পুষ্পহারের বদলে মুক্তাহার কেন !

শিলাবতী। পুষ্পহার যে প্রতি দিন গাঁথ্‌তে হয়, প্রতি দিন ফেলে দিতে হয়। সে তোমার মধুর আলাপের মতো সুন্দর বটে, কিন্তু ধরে রাখবার উপায় নেই। তোমার অমর কাব্যের যোগ্য প্রতিদান এই মুক্তাহার।

কালিদাস। এবারে বলো—কেমন লাগলো ?

শিলাবতী। ভাষা অক্ষম বলেই সে কথা বলবার ভার ঐ মুক্তামালার উপরে দিয়েছি।

কালিদাস। এ কি সামাজিকগণের রুচিকর হবে ?

শিলাবতী। সমাজ তো ঐ রাজসভার মধ্যে আবদ্ধ নয়, দূরদেশে ও দূর কালে তা' ছড়িয়ে রয়েছে।

কালিদাস। আমার আগের রচনার তুলনায় কেমন লাগলো ?

শিলাবতী। আগের রচনায় ছিল তোমার কল্পনার লীলা, এবার তোমার কল্পনা সৃষ্টি-কার্য্যে নেমেছে।

কালিদাস। মহারাজ কি খুশী হবেন ?

শিলাবতী। মহারাজ তো দিঙ্‌নাগাচার্য নন। বেশি কি বলবো—এ কথা শুনলে স্বয়ং হরপার্বতী তোমাকে পুরস্কৃত করবেন।

তারপরে শিলাবতী বলিল—কবি, তোমার পুঁথিখানা রেখে যাও, রাত্রে আর একবার পড়বো। কাল সন্ধ্যায় এসে আবার নিয়ে যেও। পরশু তো তোমার রাজসভায় পড়বার কথা।

কালিদাস পুঁথিখানা রাখিয়া বিদায় লইল।

পরদিন সন্ধ্যায় কালিদাস শিলাবতীর ভবনে পৌঁছিলে শিলাবতী বলিল, আমার সঙ্গে এসো।

দু'জনে একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। সেখানে একটি ক্ষুদ্রায়ত শ্বেতপাথরের জলচৌকির উপরে পুঁথিখানি রক্ষিত, আর পুঁথিখানির উপরে একটি সুকুমার ময়ূরপুচ্ছ রহিয়াছে কালিদাস দেখিতে পাইল।

সে শুধাইল—ব্যাপার কি ? ময়ূরপুচ্ছ রাখলে কেন ?

—আমি রাখিনি।

—তবে রাখলে কে ?

—তা হ'লে শোনো।

—কাল অনেক রাত্রি জেগে পুঁথিখানা আবার শেষ করলাম। তারপরে কখন ঘুরিয়ে পড়েছি জানি না। স্বপ্ন দেখলাম, স্বয়ং কুমারজননী উমা আবির্ভূত হয়েছেন, হ'য়ে বলছেন যে, কবির কাব্য শুনে আমি খুশী হ'য়েছি—আরও খুশী হ'য়েছি যে, কবি আর অধিক দূর অগ্রসর না হ'য়ে আমাকে লজ্জা থেকে রক্ষা করেছে। তারপরে 'এই নাও' ব'লে কর্ণালঙ্কার থেকে একটি শিখণ্ডি বর্হ খুলে আমার হাতে দিলেন, বললেন যে, কবিকে আমার নাম ক'রে দিও।

—স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠ্‌লাম, ভাবলাম, নিশ্চয়ই বর্হটি পাবো। কিন্তু স্বপ্নমাত্র মনে হ'ল, হাসি পেলো, ভাবলাম—যাক, স্বপ্ন বৃথা, কাল তোমাকে বলা যাবে—সে মন্দ মজা হবে না।

আজ সকালে উঠে পুঁথিখানার কাছে গিয়ে দেখি—এ কি ! পুঁথির উপরে এ শিখিপুচ্ছ এলো কোথা থেকে ? তবে কি কুমারজননীর আশীর্বাদ স্বপ্ন মাত্র নয় !

আর বলিবার প্রয়োজন হইল না—আর বলিবার ছিলই বা কি !

দুটি বিস্মিত নরনারী হতবুদ্ধি হইয়া রোমাঞ্চিত দেহে আকাশের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অন্ধকার আকাশে তখন স্তরে স্তরে মেঘ দিব্য শিখিকলাপের মতো বিস্তারিত হইয়া গিয়াছে, তাহার নখরে বিধৃত বিদ্যুৎ ক্লিষ্ট সর্পের মতো চেষ্টা করিতেছে, মেঘমৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনির তালে তালে মেঘকলাপ নড়িতেছে, আর অর্ধান্তরিত শুক্লা শশীর স্তিমিত আলোতে কুমার-জননীর স্নেহের স্মিতকৌতুক যেন কিছুতেই বাধা মানিতেছে না। দুজনে মুগ্ধের মতো এই অলৌকিক দৃশ্য দেখিতে লাগিল। কতক্ষণ দেখিল জানি না, অবশেষে শিলাবতী বলিল—দেখ্‌লে ?

কালিদাস বলিল—দেখলাম।

শিলাবতী আবার বলিল—দেবী আবির্ভূত হ'য়ে আশীর্বাদ ক'রে গেলেন।

কালিদাস উঠিয়া পড়িল, বলিল—আর ভয় নাই।

৭

আজ উৎসবের দিন। সূর্যোদয়ের শুভ মুহূর্তে মহারাজা, যুবরাজ, কুলগুরু, রাজপুরোহিত ও অন্যান্য সভাসদ্‌গণ পদব্রজে মহাকালমন্দিরে গিয়া পূজা দিয়া আসিয়াছেন। ইহাই উৎসবের কার্যসূচীর প্রথম অঙ্গ।

তারপরে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজসভার অধিবেশন বসিয়াছে। মহারাজা স্বয়ং অভ্যাগত নৃপতি ও পণ্ডিতবর্গকে স্বাগত জানাইয়াছেন, তাঁহারাও সময়োচিত উত্তর দিয়াছেন। তৎপর মহারাজা হূণসমরবিজয়ী কুমারগুপ্তকে 'হূণারি' উপাধি দানের প্রস্তাব করিলে সমগ্র সভা একবাক্যে 'সাধু সাধু' ধ্বনির দ্বারা মহারাজার প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়াছেন। প্রাহ্ণের অধিবেশন এখানেই সমাপ্ত। তারপর সারাদিন ধরিয়া নৃত্য গীত, কৌতুক প্রদর্শন চলিয়াছে, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' চলিয়াছে—মহারাজা অন্যান্য নৃপতিগণ সহ নগর পরিদর্শনে বাহির হইয়া, দর্শন দিয়া এবং দর্শন করিয়া উৎসবের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

এখন সন্ধ্যাবেলা। পুনরায় রাজসভার অধিবেশন বসিয়াছে। এবারে রাজকবি সদ্যপ্রণীত কাব্য পাঠ করিবেন—সান্ধ্য অধিবেশনের ইহাই প্রধান অঙ্গ।

রাজসভার মধ্যস্থলে সিংহাসনোপরি মহারাজা উপবিষ্ট, তাঁহার বামে যুবরাজ

কুমারগুপ্ত, দক্ষিণে শুভ্রকেশ, শুভ্রবেশ কুলগুরু ; আরও বামে স্বাধীন ও মিত্র নৃপতিগণ, আরও দক্ষিণে ভারতের যাবতীয় কবি ও পণ্ডিতগণ। পণ্ডিতগণের মধ্যে, তারাগণের মধ্যে বৃহস্পতির ন্যায় আলঙ্কারিকশ্রেষ্ঠ দিঙ্নাগাচার্য উপবিষ্ট ; তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু শরীর এখনো ঋজু ও সবল, চোয়াল ভারি, মস্তক প্রকাণ্ড, প্রকাণ্ড একটা হাতুড়ির ন্যায়, ঐ হাতুড়ির আঘাতে কত কবিযশঃপ্রার্থীর যশঃস্তম্ভকে ভূগর্ভে সমূলে তলাইয়া দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই, স্বয়ং সরস্বতী তাঁহাকে ভয় করিয়া চলেন ; তাঁহার মস্তকের চারি দিক্ ক্ষুর দিয়া কামানো, মাঝখানে একগুচ্ছ দীর্ঘ কেশ, দিঙ্নাগাচার্য দুর্ধর্ষ দ্রাবিড়ী পণ্ডিত। তাঁহার পাশে বসিয়া আছেন রাজসভার প্রাচীন কবি দেবভট্ট।

সিংহাসনের সম্মুখে অদূরে, সিংহাসনের দিকে মুখ করিয়া শ্বেত প্রস্তরের সামনে কালিদাস উপবিষ্ট ; তাঁহার কণ্ঠে শ্বেত উত্তরী ও শ্বেতপদ্মের মালা, কুঞ্চিত কেশদামে একটি আকন্দ ফুলের মালা জড়িত, সম্মুখে তাঁহার ভূর্জপত্রের পুঁথি, সদ্যপ্রণীত কাব্য। কবির পাশে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু নিচুল। দু'জনে সমবয়সী, দু'জনেই কবি ; কবিত্বে নিচুল কালিদাসের সমকক্ষ নয়, কিন্তু কাব্য-রসাস্বাদে, সরসতায় বড় ন্যূন নহে, কবি শ্লেষ করিয়া বলিয়া থাকেন 'সরস নিচুল', নিচুল মানে একপ্রকার বেতগাছ। কালিদাস সখাকে বলেন—তোমরা দু'জনেই সমান সরস! নিচুল কালিদাসের গ্রামের লোক, সেখানেই থাকেন, এই উপলক্ষ্যে আসিয়াছেন।

কালিদাসের পিছনে সভাসদ্, সামাজিক ও নাগরিকগণ, আর দ্বিতলের চক-মিলানো অলিন্দে জালায়তনের অন্তরালে পুরস্ত্রীগণ। উপর হইতে রাজসভার মধ্যে অবতরণের জন্য শ্রেণীবদ্ধ মর্মরসোপান—ভিতরে গতায়াত-সোপানও আছে।

সভাস্থল পুষ্পগন্ধে, ধূপ ও অগুরুর সৌরভে আমোদিত। শত শত দীপের প্রভাবে আলোকিত, সমস্ত সভা নিস্তব্ধ, তবু জনপূর্ণ বলিয়া থমথম করিতেছে। এমন সময়ে সময়সূচী শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, মহারাজার ইঙ্গিতে কুলগুরু উঠিয়া মঙ্গলাচরণ করিলেন—এবং তারপরে সভাস্থ সকলের অনুমতি লইয়া মহারাজা কবিকে কাব্য পাঠ করিতে অনুরোধ জানাইলেন।

কবি উদ্দেশ্যে মহাকালকে প্রণাম করিলেন, মহারাজকে নমস্কার করিলেন, সভাকে নমস্কার করিলেন, এবং একবার ঊর্ধ্বে জালায়তনের দিকে সকরুণ দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া পুঁথির গ্রন্থি উন্মোচন করিলেন। কবিকে যেন কিঞ্চিৎ দ্বিধা-যুক্ত বলিয়া মনে হয়—নিচুল কাণে কাণে বলিল—ভয় নাই, প্রথম রসিকসম্ভাষণে কবিতা ও বনিতা ভীত হ'য়েই থাকে।

কালিদাস অস্ফুটস্বরে বলিল—সবাই কি রসিক, দিঙ্‌নাগের ভাবখানা দেখো না।

—বেশি শুঁড় নাড়লে বেতের কাঁটা ফুটবে! তুমি নির্ভয়ে স্বরু করো। কবি নতমস্তকে কাব্যের নাম ঘোষণা করিল—

—'কুমারসম্ভবম্ মহাকাব্যম্।'

তারপরেই আবৃত্তি স্বরু করিল—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥

কবির কণ্ঠস্বরে একটি মোহিনী শক্তি ছিল! সে যেন শব্দের ইন্দ্রধনু, তার মধ্যে সাতটি স্বর এমন অঙ্গাঙ্গী মিশ্রিত যে, একটি হইতে আরটিকে স্বতন্ত্র ধারণা করা যায় না—অথচ একই সঙ্গে সাতটির স্বাদ পাওয়া যায়, সমস্ত ইন্দ্রিয়-গ্রামের উপরে, মনের উপরে একটি রঙের আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া দেয়। সেই স্বরে সেই স্বরে একটির পরে একটি শ্লোক ধ্বনিত হইয়া চলিল। হিমালয়ের বর্ণনায় উদাত্ত অনুদাত্ত শ্লোকমালা শব্দের হিমালয় সৃষ্টি করিয়া দিল। তারপরে উমার জন্মবৃত্তান্ত ও বাল্যলীলা কথিত হইল। দৈত্যভয়ে ভীত দেবতাগণ ব্রহ্মাসমীপে উপস্থিত হইলেন, স্বাধিকারপ্রমত্ত মদন দগ্ধ হইল। রতিবিলাপের শ্লোকগুলি আকুলমূর্ধজা রতির ন্যায় নিস্তব্ধ সভাকক্ষে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, তারপরে তপঃফলোদয়, উমাপ্রদান এবং সপ্তম স্বর্গে উমাপরিণয়ে বিশ্বব্যাপী আনন্দোৎসব ধ্বনিত হইয়া উঠিল—দৈত্যকবলমুক্তির আসন্ন আশায় ব্রহ্মাণ্ডের পূর্বাশা নবরাগ ধারণ করিল। চরাচরের উল্লাসসঙ্গীতের সমে আসিয়া কবির কুমারসম্ভবম্ মহাকাব্যের সমাপ্তি ঘটিল। কবি থামিলেও প্রতিধ্বনি থামিল না, সভার আনাচে কানাচে, স্তম্ভশ্রেণীতে, অলিন্দে, বলভিতে প্রতিধ্বনি থমথম করিতে লাগিল এবং অবশেষে প্রতিধ্বনি থামিলেও শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরে, আকাশে ঝড় থামিয়া গেলেও পর্বতগুহায় যেমন তাহার

প্রতিশব্দের লীলা চলিতে থাকে, তেমনি কাব্যের স্মৃতি বার বার আবর্তিত হইতে লাগিল। মহৎ কাব্যের ধর্মই এই যে, কাব্যপাঠ শেষ না হইয়া গেলে তাহার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। কবি বীজ বপন করে, রসিক চিত্ত তাহাকে রসবোধের দ্বারা লালন করিয়া বনস্পতিতে পরিণত করে। যে কাব্য শেষ হইলে মনেই হয় না যে, এখনো শেষ হয় নাই—তাহা কাব্যই নয়।

কবি শেষ করিল, কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দ তখনো স্থাণুবৎ। প্রথমে মহারাজার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন, এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল! সেই বাক্যে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া সমস্ত সভা এককণ্ঠে সাধুবাদ ধ্বনিত করিল।

তখন মহারাজা নিজ কণ্ঠের মণিমালা কবিকে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলে দিঙ্‌নাগাচার্য বলিল—মহারাজ, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। কাব্য সমাপ্ত হইল বটে, কিন্তু এখনো তাহার বিচার বাকি। বিচারান্তে পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হইলে তখন কবিকে পুরস্কৃত করিবেন—কেহ আপত্তি করিবে না।

যুবরাজ বলিলেন, সভাস্থ রসিকবর্গের সম্মতি মৌনেই কি বিচার সম্পন্ন হয় নাই?

দিঙ্‌নাগাচার্য—কর্ণ থাকিলে শোনা যায়, কিন্তু কাব্য বিচারের পক্ষে আরো কিছু আবশ্যক।

যুবরাজ—সত্য বটে, কিন্তু আপত্তিকারী কেহ আছে কি?

দিঙ্‌নাগাচার্য—আমি আছি।

পার্শ্বে উপবিষ্ট দেবভট্ট দিঙ্‌নাগের ছায়ায় ছায়া মিশাইয়া একটু উস্‌খুস্‌ করিল। তাহার গলায় গলা মিশাইয়া প্রতিধ্বনি করিল, বলিল—আমি আছি।

তখন মহারাজা বলিলেন—বেশ, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। আগামীকল্য বিচারান্তে কবিকে পুরস্কৃত করা হইবে।

তখন সভাভঙ্গ হইল।

৮

পরদিন রাজসভায় বিচার আরম্ভ হইল সত্য, কিন্তু রাত্রিবেলাতেই নূতন কাব্য সম্বন্ধে নানা স্থানে নানারূপ মতামত ব্যক্ত হইতে লাগিল—সেটাও একরকম বিচার, এবং বোধ করি, পণ্ডিতের বিচারের চেয়ে তার মূল্য কম নয়।

অনেক রাত্রে যুবরাজ কুমারগুপ্ত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলে পত্নী তাঁহার কণ্ঠে একটি মাল্য পরাইয়া দিয়া বলিলেন—দেবসেনাপতি কুমারের জয় হোক।

কুমারগুপ্ত বলিলেন—আমি আবার দেবসেনাপতি হলাম কখন ?

—কেন, এই যে কিছুক্ষণ আগেই রাজকবি কাব্যে বর্ণনা করলেন।

—ওঃ, সেই কাব্যের কথা বলছ ?

—তুমি তবে কি ভাবলে ? কবি বন্ধু থাকবার কত সুবিধা।

—তুমি তো কেবল্ সুবিধাটুকুই দেখছ।

—অসুবিধা আর কোথায় ?

—কুমার যে—চিরকুমার ! তার এমন লক্ষ্মী পত্নী ছিল না।

—ওঃ, আমি তবে অবান্তর ?

—না, কাব্যের অভাব বাস্তবে পূ্রিয়ে দিয়েছে। ঐখানে কবির উপরে সংসারের জয়।

—যাই বলো, এমন মধুর কাব্য জীবনে শুনিনি।

কুমারগুপ্ত বলিলেন—কবি কাব্য লিখলে মধুর না হয়ে যায় না। তোমার দেবভট্ট লিখলে দেখতে কি কাণ্ড ঘটতো।

... ...

গৌড়াধিপতির শিবিরে গৌড়াধিপ ও তাঁহার বয়স্যের মধ্যে আলাপ হইতেছিল—

গৌড়াধিপ। লোকটা লিখেছে বটে।

বয়স্য। লিখবে না ? খায়-দায় ভালো, কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

—আরে ঝঞ্ঝাট কি আমার সভাকবি রাসেন্দ্ররাজেরই আছে ? লোকটার কাব্য শুনে সরস্বতীর হাঁসগুলো আর্তনাদ করে ওঠে।

—তা' যা বলেছেন মহারাজ !

—এক কাজ করতে পারো। লোকটাকে গৌড়ে নিয়ে যেতে পারো।

—যাবে কি ? মহারাজার অনুগৃহীত !

—অবশ্যই যাবে ! কাল গিয়ে সহস্র স্বর্ণমুদ্রার লোভ দেখাও ! আর সেই সঙ্গে গৌড়ের জলবায়ু্ ও খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যের বর্ণনাটাও করতে ভুলো না।

—যে আজ্ঞে, কাল একবার যাবো লোকটার কাছে—

—বিক্রমাদিত্যের সভাকবি আমার সভায় গেলে আমার মর্যাদা বাড়বে।

—সে আর বল্‌তে।

... ...

কালিদাসের কুটীরে কালিদাস ও তাহার বন্ধু নিচুলের মধ্যে কথোপকথন হইতেছিল—

নিচুল। কবি, তোমার ঋতুসংহার, মালবিকা ও বিক্রম সুকাব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু কুমার নিঃসন্দেহে মহাকাব্য, তোমার নাম ব্যাস ও বাল্মীকির সঙ্গে গ্রথিত হ'য়ে গেল।

কালিদাস। বন্ধুপ্রীতিই তোমার প্রশংসার হেতু। ব্যাস-বাল্মীকি ছিলেন ঋষি, লৌকিক কবির নাম তাঁদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য নয়।

নিচুল। তাঁরাও লৌকিক কবি, অলৌকিক তাঁদের প্রতিভা!

কালিদাস। তোমার কথা সত্য হ'লে আনন্দের বিষয়।

নিচুল। সব চেয়ে বিস্ময়কর তোমার সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞান! উমা-পরিণয়ে কাব্যের সমাপ্তি—কুমারের জন্মই হ'ল না। এই যে না-বলার দ্বারা সবটুকু বললে, ব্যঞ্জনার হাতে বাস্তবের ভার ছেড়ে দিলে, এখানেই তোমার প্রতিভার পরাকাষ্ঠা। স্বল্পশক্তিমান্ ব্যক্তি কাহিনীর জের শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতো। আর তাতেই মরতো।

কালিদাস। এই জন্যই তো তোমাকে 'সরস নিচুল' বলে থাকি! কিন্তু দেখো, কাল সভায় দিঙ্‌নাগ কি রকম স্থূল হস্তাবলেপ করে!

নিচুল। চমৎকার বলেছ! দিঙ্‌নাগের স্থূল হস্তাবলেপ! দিগ্‌গজের শুঁড়ের স্পর্শ! কথাটা কোন কাব্যে ঢুকিয়ে দাও! অমর হ'য়ে থাকুক।

কালিদাস। সে তো পরের কথা। আগে দিগ্‌গজের শুঁড়ের আক্রমণ থেকে কবি প্রাণে বাঁচুক তো।

নিচুল। নিচুল সরস হ'তে পারে, কিন্তু তাঁরও কাঁটা আছে, হাতীর শুঁড়ে বিঁধবে।

... ...

রাজপুরোহিত ও দেবভট্টের মধ্যে—

দেবভট্ট। কেমন আচার্য, আমি বলেছিলাম কি না! কাব্য তো ছাই, কেবল চাটুবাদ! দেখলেন তো কৌশল!

রাজপুরোহিত। সুন্দর! চমৎকার!

দেবভট্ট। আপনিও মুগ্ধ হ'য়েছেন দেখছি!

পুরোহিত। কেন আপনি কি হন নাই? তা ছাড়া চাটুবাদ কোথায়?

দেবভট্ট। কোথায় নয়? যুবরাজ কুমারগুপ্তকে বানিয়ে দিল—কুমার দেবসেনাপতি! আর ইঙ্গিতে মহারাজা ও মহারাণীমাকে হরপার্বতী বলা হ'ল।

পুরোহিত। তাও বটে।

দেবভট্ট। লিখতে বসেছে হূণবিজয়সংগ্রাম। তার মধ্যে এই পৌরাণিক কাহিনী আসে কোথা থেকে? আর এত কাহিনী থাকতে কি না বেছে বেছে সেই কাহিনী অবলম্বন করলো, যার মধ্যে কুমার নামটি আছে। ধূর্ত! শঠ! প্রবঞ্চক! চাটুকার!

পুরোহিত। আপনি একবার দিঙ্‌নাগ ঠাকুরকে বুঝিয়ে বলুন না কেন, কাল তো তিনি বিচারে অবতীর্ণ হবেন।

দেবভট্ট। আপনি কি ভাবছেন, তা আমি করিনি! সমস্ত বুঝিয়ে বলেছি। আমার গৃহিণী যে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করেছিলেন, অমনি তাও কিছু দিয়ে এসেছি।

পুরোহিত। ঠাকুর কি বলছেন?

দেবভট্ট। দেখলাম, পণ্ডিতপ্রবর রসগ্রাহী। তিনি বললেন, যার গৃহিণী মিষ্টান্ন প্রস্তুতে এমন দক্ষ, তিনি যে মধুর কাব্য রচনা করবেন, তা আর বিস্ময়ের কি?

পুরোহিত। তবে তো কাজ পাকা করেই এসেছেন।

দেবভট্ট। তা এসেছি—এখন মহারাজা বুঝ্‌লে হয়! রাজারা আবার চাটুবাদে সহজেই মুগ্ধ হয়!

... ...

বিনিদ্র দিঙ্‌নাগাচার্য একাকী পদচারণা করিতেছেন, মুখমণ্ডলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার সঙ্গে প্রতিহিংসার ভাব মিশ্রিত। পদাচারণা করিতে করিতে একবার থামিতেছেন—আর আবৃত্তি করিতেছেন—

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষান্যতরদ্ভজন্তে,
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ ॥"

অহো কি দম্ভ! 'ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।' ভালো, আগামীকল্য সেই বিচারই হবে! 'বৃদ্ধ হইলেই পণ্ডিত হয় না আর নূতন হইলেই কাব্য হয় না!' সেই কথাই কাল প্রমাণ ক'রে দেবো যে, বৃদ্ধ হলেও পণ্ডিত হতে পারে —আর নূতন হ'লেও কাব্য হয় না! এ তো আমাকে লক্ষ্য করেই লিখিত!

এই বলিয়া একবার তিনি নীরব হইলেন, থামিলেন, আবার বলিতে লাগিলেন—মহারাজার আশ্রিত হ'লেই মহাকবি হয় না!

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি একবার আকাশের দিকে চাহিলেন, বলিলেন—আঃ, রজনী যে প্রভাত হ'তেই চায় না অথবা দুর্জনের অধিকার স্বভাবতই বিস্তৃত মনে হয়!

দিঙ্‌নাগাচার্য ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে পদচারণা করিতেই লাগিলেন।

... ...

পরদিন রাজসভায় সকলে সমবেত হইলে মহারাজা পণ্ডিত দিঙ্‌নাগকে বিচারে অবতীর্ণ হইতে অনুরোধ করিলেন। দিঙ্‌নাগ শুধাইলেন, উত্তরপক্ষ কে হইবে?

নিচুল বলিল—আমি প্রস্তুত।

কিশোরোপম মানুষটির দিকে চাহিয়া দিঙ্‌নাগ অনুকম্পায় হাসিল, বলিল—উত্তম! তাই হোক।

তখন দিঙ্‌নাগ আরম্ভ করিল—রচনাটিকে লেখক মহাকাব্য বলিয়াছে, কিন্তু মহাকাব্য তো দূরের কথা, কাব্যই হয় নাই।

নিচুল বলিল—দূরের কথাকে নিকটে আনিতে আজ্ঞা হোক, কেন মহাকাব্য হয় নাই?

দিঙ্‌নাগ। নবম সর্গের কমে কাব্য মহাকাব্যে পরিণত হয় না, কাব্যখানি মাত্র সপ্তসর্গ!

নিচুল। তবে তো এই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মহৎ শব্দ প্রযোজ্য নয়, কেন না—ইহাও মাত্র সপ্ত সর্গে সম্পূর্ণ!

দিঙ্‌নাগ। বাচালতা পরিহার করো, যুক্তির পন্থায় অবতীর্ণ হও।

দিঙ্‌নাগ যখন এই সব কথা বলিতেছিল, তখন পার্শ্বে উপবিষ্ট দেবভট্ট মস্তক নাড়িয়া তাঁহাকে সমর্থন করিতেছিল—ভাবটা, এমন যুক্তিগ্রাহী বাক্য আর হয় না, সুযোগ পাইলে সেও বলিতে পারিত।

নিচুল বলিল—উপমাও এক প্রকার যুক্তি! কিন্তু তাহা যদি গ্রাহ্য না হয়—তবে অন্য যুক্তি দিতেছি। মহত্ব কি বস্তুর গুরুত্বের উপরে নির্ভর করে? কারো কারো পক্ষে তাহাই একমাত্র নির্ভর।

এই বলিয়া সে দিঙ্‌নাগের গুরুভার দেহের প্রতি একবার কটাক্ষ করিল। অনেকে বুঝিল, বুঝিয়া হাসিল।

দিঙ্‌নাগ বলিল—এদেশে দেখিতেছি, বাচালতাই যুক্তির স্থান অধিকার ক'রেছে।

নিচুল। মূঢ় যুক্তির চেয়ে বাচালতা অনেক সরস! কিন্তু ভালো, জিজ্ঞাসা করি, মহাকাব্যের মহত্ত্ব তাহার প্রকৃতিতে, না আকৃতিতে—যদি আকৃতিতে হয়, তবে অবশ্যই আমার কিছু বলিবার নাই। আর যদি প্রকৃতিতে হয়, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, কুমারসম্ভবম্ কাব্যের চেয়ে মহত্তর আর কি হইতে পারিত? দৈত্যকবল হইতে স্বর্গ উদ্ধারের নিমিত্ত বীরের জন্ম, মানুষের প্রতিভা আর কি মহত্তর কল্পনা করিতে সমর্থ?

দিঙ্‌নাগ। কিন্তু জন্মটা কোথায়? আসল ব্যাপারই যে উহ্য থাকিয়া গেল!

নিচুল! সূতিকাগৃহের ভূমিষ্ঠ শিশুর ক্রন্দন না শুনিলে যাহারা জন্ম ব্যাপারটাকে কল্পনা করিতে অসমর্থ, তাহারা উত্তম সামাজিক জীব হইতে পারে, কিন্তু কাব্য সমালোচনার অধিকারী নয়।

দিঙ্‌নাগ। শুধু জন্মটাই তো উহ্য নয়, কাব্যের আসল বিষয়টাই যে অনুক্ত রহিয়া গিয়াছে! কোথায় জন্ম, কোথায় কুমার, কোথায় দেবদৈত্যে সংগ্রাম, আর কোথায়ই বা স্বর্গের উদ্ধার?

নিচুল। কাব্যের প্রাণ ব্যঞ্জনায়। সবটুকুই যদি করিতে হইবে, তবে তো ইতিহাস হইয়া গেল!

দিঙ্‌নাগ। তাই বলিয়া কি আসল কথা অনুক্ত রাখিতে হইবে!

নিচুল। আসল কথা অবশ্যই কথিত হইয়াছে—সেইটুকুই কাব্যের বীজ! এবারে রসিক পাঠক তাহার রসবোধের দ্বারা বীজকে অঙ্কুরিত করিয়া লইবেন—যথার্থ কবিরা ইহাই আশা করিয়া থাকেন। সে শক্তি যাহাদের নাই, তাহারা ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের কচ্চায়ন লইয়া থাকুক, কাব্যের ক্ষেত্রে অনাগমনই বাঞ্ছনীয়।

দিঙ্‌নাগ। এ কি বিচার?

দেবভট্ট মাথা নাড়িল।

নিচুল। আপনি যাহা করিতেছেন, তাহার নাম অবিচার।

ক্রুদ্ধ দিঙ্‌নাগ বৃংহণ করিয়া উঠিল, তুমি অর্বাচীন।

নিচুল। কিন্তু আপনিও প্রাচীনের ন্যায় কথা বলিতেছেন না।

ঈষৎ লজ্জিত হইয়া দিঙ্‌নাগ বলিলেন—আমার বক্তব্য এই যে, রচনাটি মহাকাব্য নয়, তার উপরে আবার অসমাপ্ত। আর এমন রচনাকে সম্মানিত করিয়া মহারাজা রসগ্রাহীর কাজ করেন নাই।

নিচুল। মহারাজা রসগ্রাহীর কাজই করিয়াছেন—এমন হইতে পারে যে, তিনি আলঙ্কারিকের কাজ করেন নাই।

যখন দুই পক্ষে এইরূপ যুক্তির ও শ্লেষের বর্ষণ চলিতেছিল, তখন সভাস্থ সকলে নিজ নিজ রুচি অনুসারে কেহ বা এক পক্ষ, কেহ বা অপর পক্ষ অবলম্বন করিতেছিল। কাল তাহাদের অনেকেরই কাব্যখানি ভালো লাগিয়াছিল, আজ অনেকেই বুঝিতে পারিল যে, ভালো লাগা উচিত হয় নাই। প্রেমের অভাব অলঙ্কার দ্বারা ঘুচাইয়া লইতে হয়—যাহাদের হৃদয় প্রেমপূর্ণ, তাহারা স্বর্ণ অলঙ্কারের অভাব অনুভব করে না।

সভাস্থ বৃদ্ধ জনেরা মনে মনে দিঙ্‌নাগের যুক্তি সমর্থন করিতেছিল—আর নিচুলের শ্লেষাত্মক যুক্তি তরুণগণের বড় ভাল লাগিতেছিল।

এমন সময় বৃদ্ধ রাজপুরোহিত বলিলেন—মহারাজ, আমি কবিও নই, আলঙ্কারিকও নই, আমি মহারাজার মঙ্গলকামী বৃদ্ধ। আমার বক্তব্য এই যে—এমন শুভ উৎসব উপলক্ষ্যে লিখিত অসম্পূর্ণ কাব্য শুভসূচক নয়, বস্তুতঃ অমঙ্গল-জনক বলিয়াই মনে হয়।

দেবভট্ট তিন চার বার মাথা নাড়িল।

রাজপুরোহিত বলিলেন—তর্ক থাক্, আমার বোধ হয়, কাব্যখানি সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা কবির উচিত।

নিচুল। সম্পূর্ণকে সম্পূর্ণতর করিবার উপায় কি? রোহিত মৎস্যকে টানিলে কি তিমি মৎস্যে পরিণত হইবে?

দিঙ্‌নাগ। কিম্বা পুটিকা মৎস্যকে রোহিত বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলেই কি সার্থক হইবে? আমার মনে হয়, রাজপুরোহিতের বাক্য যথার্থ।

এবারে যুক্তির স্থানে ভক্তি আসিয়া দেখা দিল। মঙ্গলামঙ্গলের তর্কে অনেকেরই মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল! কাব্য অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে মঙ্গলের উপরে স্থান দেওয়া যায় না বলিয়া সকলের ধারণা হইল!

অনেকেই অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল—তাই তো কাব্যখানা যে অসম্পূর্ণ!

কেহ কেহ বলিল—অসম্পূর্ণ কাব্যে শুভ উৎসব খণ্ডিত হইল!

এমন সময় সকলে দেখিতে পাইল, অলিন্দের শ্বেতপাথরের সোপান বাহিয়া প্রভাতের শুকতারার ন্যায় একজন রমণী নামিতেছে, সকলেই চিনিল—আর্যা শিলাবতী।

শিলাবতী ধীরপদে সভাস্থলে উপস্থিত হইরা মহারাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল—মহারাজার অনুমতি অন্তে আমি কিছু বলিতে চাই।

এই বলিয়া সে আরম্ভ করিল—মহারাজ! কাব্যের বাহ্য অসম্পূর্ণতায় উদ্বিগ্ন হইবেন না—স্বয়ং মহাদেবী প্রসন্ন হইয়াছেন। এই বলিয়া শিলাবতী স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।

এবারে ভক্তির প্রতিষেধক ভক্তি পড়িল। অমঙ্গলের আশঙ্কায় যাহারা উদ্বিগ্ন হইয়াছিল, স্বপ্নবৃত্তান্তে তাহারা নিশ্চিন্ত হইল। এমন কি, কালিদাসের উষ্ণীষচূড়ায় বর্হটি লক্ষ্য করিয়া তাহারা এক প্রকার ঈর্ষামিশ্রিত পুলক অনুভব করিল।

শিলাবতী বাক্য শেষ করিবামাত্র দিঙ্‌নাগ গর্জন করিয়া উঠিল—এবারে উত্তম হইয়াছে। আর্যাবর্তের একচ্ছত্র অধিপতির সভায় কাব্যবিচারক শেষে কি না নারী! যেমন কাব্য, তেমনি বিচারক আর তেমনি রসগ্রাহী—বলিয়া শিলাবতী ও নিচুলের দিকে কটাক্ষ করিলেন।

তখন মহারাজা বিক্রমাদিত্য বলিলেন—তর্ক বিতর্ক ক্ষান্ত হোক, কবি, তুমি কাহিনীর প্রত্যাশিত চূড়ান্ত অবধি কাব্যকে টানিয়া লইয়া যাও।

মহারাজার বাক্যে সভাজন ধন্য ধন্য করিয়া উঠিল। রাজবাক্যে সমর্থন জ্ঞাপনের জন্যই সভাসদের প্রয়োজন।

কালিদাস উত্তর করিল না।

মহারাজা পুনরায় বলিলেন—রাজপরিবারের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন যেখানে জড়িত, সেখানে আপত্তি করা উচিত নয়।

এবারে কালিদাস কথা বলিল—মহারাজ, আপনি আমার অন্নদাতা,

আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য। কিন্তু আরও একটা আদেশ আছে—স্বয়ং সরস্বতীর আদেশ—তাহাকে লঙ্ঘন করি কি বলিয়া?

—সে আদেশ কি?

—কাব্যের একটা দাবী আছে, সেই দাবী যথাসাধ্য রক্ষা করিয়াছি—যাহা সমাপ্ত, তাহার উপরে আর লেখনী চালনা করা উচিত নয়।

প্রিয়ম্বদ কবির এবম্বিধ বাক্যে মহারাজা নিতান্ত বিস্মিত হইলেন,—রুষ্টও কম হইলেন না।

তখন তিনি বলিলেন,—ভালো, তুমি শেষ না করিতে পারো, অন্যের উপরে সে ভার দিতে বাধ্য হইব।

তারপরে দেবভট্টের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—পণ্ডিত, তুমি কাব্যের শেষাংশ পূরণ করিয়া দাও।

দেবভট্ট এক লম্ফে মহারাজার পায়ের কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—মহারাজার আদেশ ও পদধূলি অবশ্যই শিরোধার্য—আমি অচিরে উহা সম্পূর্ণ করিয়া দিতেছি। রাজবংশের মঙ্গলামঙ্গলের চেয়ে কাব্যের দাবী আমার কাছে অধিক গুরুতর নয়।

রাজা বলিলেন—তথাস্তু। আমি খুশী হইলাম।

রাজাদের অবশ্যই কাব্যে প্রীতি থাকে—কিন্তু আত্ম-প্রীতির চেয়ে বেশী নয়।

তিনি কালিদাসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—তুমি কল্য প্রাতেই রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নির্বাসনে যাইবে।

দিঙ্‌নাগ বলিলেন—ইহাই রাজার উপযুক্ত বিচার!

রাজকবি রাজসভার ভূষণ। তাহার অভাবে আর যে হানিই হোক, অঙ্গহানি কখনোই হয় না।

রুষ্ট বিক্রমাদিত্য সভা পরিত্যাগ করিলেন। সভা ভাঙিয়া গেল।

৯

নিশান্তের অন্ধকারে মহাকালমন্দিরের প্রচ্ছন্নতর অন্ধকারে তিন ব্যক্তি মিলিত হইল। কালিদাস, নিচুল ও শিলাবতী।

কালিদাস বলিল—শিলাবতি, আমাকে বিদায় দাও, আমার যাত্রাকাল আসন্ন।

তার পরে বলিল—নিচুল, কিয়ৎদূর আমার সঙ্গে যাবে।

শিলাবতী। তুমি কোথায় যাবে?

—রামগিরিতে। সেইখানেই যাইবার আদেশ হইয়াছে।

শিলাবতী। তোমাকে মহারাজা পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু দেবী সরস্বতী তোমার সঙ্গেই চলিলেন!

—এখন তবে বিদায় হই?

শিলাবতী। তোমার এই অপমানের অন্ধকার ভেদ করিয়া মহত্তর কাব্যের সূর্যোদয় হইবে। আজিকার নির্বাসনের অভিজ্ঞতা কাব্যে গাঁথিয়া দিও। তোমার ও তোমার কাব্যের প্রতীক্ষায় আমি রহিলাম। মহাকাল তোমাকে রক্ষা করিবেন।

তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে ছায়ার মতো কালিদাস ও নিচুল ধীরে ধীরে অদূরে মিলাইয়া গেল। শিলাবতী কুটীরে ফিরিয়া চলিল।

যক্ষের প্রত্যাবর্তন

সকাল বেলাতেই তূরী ভেরীর নিনাদে, অশ্বের হ্রেষায়, হস্তীর বৃংহিতে বনভূমি উচ্চকিত হইয়া উঠিল। উদ্দালক ও অখণ্ডপুণ্য ছুটিয়া গৌতমের কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইল, বলিল—তাত, তপোবনের প্রান্তে সৈন্য-সামন্ত এবং হস্তী অশ্ব প্রভৃতি দেখা যাইতেছে। আমরা বিপদের আশঙ্কা করিতেছি।

গৌতম বলিলেন—বিপদের কারণ দেখি না। তোমরা বরঞ্চ যক্ষের কাছে গিয়া সমস্ত নিবেদন করো, সে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সবিশেষ কারণ জানিয়া লইবে। আমি এখন যজ্ঞে বসিতেছি।

তখন ঋষিবালকদ্বয় যক্ষের কুটীরের দিকে চলিল।

ঋষির আশ্রমের অপর প্রান্তে শৈলমূলে যক্ষের কুটীর। সে গৌতমের আশ্রিত, কিন্তু ঠিক গুরু ও শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত নহে।

তাহারা যক্ষের কুটীরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল যে, পুস্তকাকারে কর্তিত তালপত্রে সে লিখিতে ব্যস্ত। তাহারা জানিত, যক্ষের কাব্য রচনার বাতিক আছে।

উদ্দালক ডাকিল—যক্ষ!

যক্ষ মুখ তুলিয়া তাহাদের দেখিয়া বলিল—কি বৎস?

উদ্দালক বলিল, আর্য গৌতম আমাদের তোমার কাছে পাঠাইলেন।

—কেন বলো তো?

অখণ্ডপুণ্য উদ্দালকের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট। সে বলিল—তুমি কবিতা লিখিতেছ, জানিবে কি প্রকারে? বাহিরে গোলমাল শুনিতে পাও নাই?

যক্ষ বলিল—না শুনিয়া উপায় কি! শোনাইবার উদ্দেশ্যেই লোকে গোলমাল করিয়া থাকে।

উদ্দালক বলিল—আমরা বিপদের আশঙ্কা করিতেছি।

যক্ষ বলিল—বিপদের কারণ নাই।

—তবে উহারা কে?

—কোন রাজপুরুষ হইবেন।

—এখানে কেন?

—রাজপুরুষগণ কেন যে কোথায় যান, তাহা মানুষে জানিবে কি করিয়া?

অখণ্ডপুণ্য। তুমিও জানিতে পারিবে না?

যক্ষ। আমাতে বৈশিষ্ট্য কি?

অখণ্ডপুণ্য। তুমি তো যক্ষ?

যক্ষ দেখিল, এবারে সে ঠকিয়া গিয়াছে। যক্ষ বলিয়াই নিজের পরিচয় দিয়াছিল। আর সে যখন যক্ষ অর্থাৎ মানুষ নয়, তাহার না জানিবার কোন হেতু নাই।

যক্ষ হাসিয়া বলিল—যাহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূরে আসিয়াছে, আগমনের কারণ তাহারা না জানাইয়া যাইবে না। ও পরিশ্রমটুকু আমরা নাই করিলাম।

উদ্দালক। অখণ্ডপুণ্য যে ভয় পাইয়াছে।

অখণ্ডপুণ্য প্রতিবাদ জানাইয়া বলিল—আমি ভয় পাইব কেন? লোকের ভয় করিতেছে।

উদ্দালক গম্ভীরভাবে বলিল—ঐ একই কথা।

যক্ষ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, তোমরা কেউই ভয় পাও নাই। কিন্তু এখন বলো, আমাকে কি করিতে হইবে?

উভয়ে একত্রে বলিল—বিষয়টা কি, সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

তখন তিনজনেই দেখিল, বনের দিগন্ত ঘেরিয়া একটা শব্দের ইন্দ্রচাপ যেন উদিত হইয়াছে, তার মধ্যে কত বিচিত্র ধ্বনির মিশ্রণ; তূরী ভেরী, হ্রেষাবৃংহিত, রথচক্র ঘর্ঘর, কর্কশ কণ্ঠস্বর; সব মিলিয়া মিশিয়া সে এক অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাপার।

যক্ষ বলিল—লোকজন বনে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু এখনো তপোবনে প্রবেশ করে নাই।

তারপরে বলিল,—আচ্ছা তোমরা যাও, আমি সমস্ত সন্ধান করিয়া আচার্য গৌতমের কুটীরে যাইতেছি, ততক্ষণে তাঁহার যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে।

যক্ষের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ঋষিবালকদ্বয় প্রস্থান করিল।

যক্ষ তালপত্র ও লেখনী যথাস্থানে রক্ষা করিয়া কুটীরের বাহিরে আসিল। দেখিল, বালক দুটি উদুম্বর বৃক্ষের ডাল ভাঙিতেছে। অপরে হইলে ভাবিত

যে, ঋষিবালক যজ্ঞসমিধ সংগ্রহে নিযুক্ত। কিন্তু যক্ষ সেরূপ ভুল করিল না। মানবচরিত্রে অভিজ্ঞ সে বুঝিল, ক্রীড়ার উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে। ঋষি-বালকও যে বালক, এ কথা যে না বোঝে, সে মানবচরিত্র সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

২

বিষয়টির সন্ধান লইবার উদ্দেশ্যে যক্ষ কুটীর হইতে বাহির হইল, বাহির হইয়া দিগন্তের দিকে চাহিবামাত্র 'চিত্রার্পিতবৎ' দাঁড়াইয়া পড়িল, সে যেন চলাও নয়, থামাও নয়। সে দেখিল, দিগন্তের গিরিমালা ও মেঘমালায় জড়াইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। যেখানে গিরিশৃঙ্গ উচ্চ, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ দলবদ্ধ হস্তিশাবকের ন্যায়—সেখানে পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতেছে—এমনি উচ্চতর শিখরে গিয়া পৌঁছিবে। কোন কোন স্থানে সমুদ্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দ্বীপমালার ন্যায় ইতস্ততঃ গিরিচূড়াগুলি জাগিয়া আছে। আরও দূরের উচ্চতর গিরিশিখরগুলি একটার মাথার উপর দিয়া আর একটা উঁকি মারিতেছে, তাহাদের কৌতূহলের অন্ত নাই। আকাশের মেঘ আর পৃথিবীর পাহাড় আজ যেন রূপ বিনিময় করিয়াছে, অভ্যস্ত চোখ ছাড়া ধরিতে পারে না। পূর্বাকাশে প্রকাণ্ড এক খণ্ড মেঘ জটায়ুর পাখার মতো ক্রমশ বিস্তারিত হইয়া পড়িতেছে, তাহার পালকের খাঁজে খাঁজে বিদ্যুতের বনফুল সংলগ্ন। পৃথিবীতে মেঘের ছায়া মেঘের সীমানাকে ছাড়াইয়া আগে আগে চলিতেছে, যেখানে ছায়া, সেখানে নীল, অন্যত্র ঘন সবুজ, ওরই মধ্যে যেখানে রোদের আভাস, সেখানে সোনালী সবুজ; ছায়ার বন্যায় ধরাতল ক্রমে ডুবিয়া যাইতেছে। বনস্পতির শীর্ষগুলি যুদ্ধাশ্বের মতো উৎকর্ণ।

পাহাড়ের গায়ে ছায়াবদলের পালা চলিতেছে, নীল, ঘন নীল, ফিকা নীল; শ্যাম, শষ্পশ্যাম, শুকশ্যাম; ওখানে কে যেন সোনার তবকে মুড়িয়া দিতেছে; হঠাৎ আগাগোড়া কে যেন অমাবস্যার কাজলে লেপিয়া দিল; কালো কেশ-পাশের মাঝখানে হঠাৎ সিঁদুর ফুটিয়া উঠিল; কোন চঞ্চল দায়িত্বহীন দেবশিশু যেন রঙের ভাণ্ডার লইয়া তচনচ করিতেছে, নিষেধ করিবার কেহ নাই। আকাশ ও পৃথিবী মেঘমায়ায় বাসরগৃহের তমিস্রার মতো রহস্যময়। মন অকারণ আকুল করিয়া দেয়। যক্ষের মনে হইল, যে ব্যক্তি স্ত্রীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া

আছে, তাহারও চিত্ত যখন ব্যাকুল হয়—দূরস্থ বিরহীর অবস্থা তো সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

একটি ফুটন্ত কুটজ বৃক্ষের পাশে আর একটি বৃক্ষের মতো যক্ষ নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল।

মেঘ অপসারিত হইয়া গেলে যক্ষ দেখিতে পাইল, উপত্যকার সমতল ভূমি হইতে বনস্পতিসমূহ থাকে থাকে সারে সারে পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিয়া গিয়াছে। কতবার এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার রাজসভার চিত্র মনে পড়িয়া গিয়াছে—এইমাত্র সম্রাট্ প্রবেশ করিলেন, সভাসদ্গণ দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই বনস্পতিগুলির মতোই প্রাচীন। আজ এই দৃশ্য দেখিয়া স্মৃতির সূত্রে যক্ষের মনে রাজসভার চিত্র জাগিল। সেই সভা, সেই গৌরবময় আনন্দের দিন, সেই কোলাহলময় বিচিত্র রাজধানী, সেই বন্ধুবান্ধব, সেই নিভৃত-চারিণী, রহস্যময়ী দেবী শিলাবতী—সেই জননান্তরসৌহৃদানি!

রাজসভা হইতে নির্বাসিত হইয়া কত জায়গাতেই না যক্ষ আশ্রয়ের জন্য ঘুরিয়াছে। রাজরোষের কথা শুনিয়া কেহ আশ্রয় দিতে চাহে নাই। তারপরে ঘুরিতে ঘুরিতে রামগিরি শৈলমূলে গৌতম ঋষির এই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৌতম আশ্রয় দিলেন, বলিলেন—এখানে নির্ভয়ে বাস করুন, যতদিন খুশী থাকুন, কেহ কোনরূপ প্রশ্ন করিবে না।

গৌতম শুধাইলেন—আর্যের নাম?

আগন্তুক বলিলেন—যক্ষ।

আশ্রমের সবাই তাহাকে যক্ষ বলিয়াই জানে, যক্ষ বলিয়াই ডাকে।

সেই হইতে যক্ষ রামগিরি শৈলমূলে 'খরস্রোতা' তটিনীতীরে গৌতম ঋষির এই আশ্রমে বাস করিতেছে।

কতবার আষাঢ়ের প্রথম দিবসে এমনি মেঘ জমিয়া আসিয়াছে, মেঘের উপরে মেঘ, স্তরে স্তরে মেঘমালার দিকে চাহিয়া তাহার রাজধানীর সৌধমালার কথা মনে পড়িত, আর সেই মেঘের মধ্যে মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎসঞ্চার দেখিয়া রাজধানীর সৌধ-বাতায়নে পুরসুন্দরীগণের যাতায়াত মনে পড়িয়া যাইত—মূঢ়ের ন্যায়, মুগ্ধের ন্যায় যক্ষ সেই দিকে তাকাইয়া থাকিত; কামী জন স্বভাবতই চেতন অচেতন সম্বন্ধে হতবুদ্ধি। আর তাহার মনে পড়িত, সেই সব স্মৃতির সৌধমালার একটির একান্তে দিগন্তশায়িনী ম্লানজ্যোতি চন্দ্রকলার ন্যায় বিরহবিশুষ্কা একটি

তন্বীর চিত্র। যখন রাজধানীর দিক্‌ হইতে বাতাস বহিত, আকুল আগ্রহে যক্ষ তাহাকে আলিঙ্গন করিত, যদি তাহার মধ্যে কলাবশেষা সেই তন্বী চন্দ্রলেখার স্পর্শ থাকিয়া থাকে। হায় রে বিরহীর মুগ্ধ দুরাশা!

আজও যক্ষ সেই ভাবে তাকাইয়া রহিল। অভীষ্ট কার্য ভুলিয়া গেল। কতক্ষণ এই ভাবে থাকিত বলা যায় না। এমন সময়ে তাহাকে চকিত করিয়া তাহার সম্মুখ দিয়া কি একটা পশু ছুটিয়া গেল। যক্ষ সচেতন হইয়া দেখিল—ধাবমান পশু একটি কৃষ্ণসার মৃগ।

কৃষ্ণসার এমন প্রাণভয়ে ছুটিতেছে কেন? তপোবনের পশুকুল স্বভাবতই নিঃশঙ্ক। তবে কি কেহ মৃগয়ায় আসিয়াছে? অদূরে বিলীয়মান মৃগটির দিকে তাকাইয়া যক্ষ দেখিল, বাণপতনাশঙ্কায় তাহার পশ্চার্ধ যেন দেহের সম্মুখভাগে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। হরিণটা নিশ্চয়ই মৃগয়ার্থীর ভয়ে ধাবমান।

তাহার আশঙ্কাকে সত্য করিয়া ধনুর্বাণ হস্তে এক ব্যক্তি সহসা আবির্ভূত হইল।

যক্ষ চীৎকার করিয়া বলিল—মহাশয়, বাণ সম্বরণ করুন, আশ্রমমৃগ বধের অযোগ্য।

এই বাক্য শ্রবণে ধনুর্বাণধারী থামিল, ধনুর্বাণ সম্বরণ করিল এবং যক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল।

তারপরে যক্ষকে চিনিতে পারিয়া সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল—বন্ধু, সখা, সুহৃদ্‌, তুমি এখানে? এবারে যক্ষও তাহাকে চিনিতে পারিল, বলিল—নিচুল, বন্ধু তুমি? এ যে স্বপ্নের অতীত!

নিচুল। সখা, তোমার সন্ধানেই আমরা বনে বনে ঘুরিয়া মরিতেছি।

কালিদাস। কেন?

নিচুল। তোমাকে রাজধানীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার আদেশ।

কালিদাস। কাহার আদেশ?

নিচুল। এরূপ আদেশ আর কে দিতে পারে? মহারাজ।

কালিদাস। তোমার সঙ্গে আর কে আসিয়াছে?

নিচুল। আমি কাহার সঙ্গে আসিয়াছি বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করো।

কালিদাস। ভালো, তাহাই বলো।

নিচুল। আমরা যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের সহযাত্রী।

কালিদাস। যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত? তবে কি···?

নিচুল। হাঁ, মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সে আজ বর্ষকাল হইল। এখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মহারাজ কুমারগুপ্ত।

কালিদাস। আহা, স্বর্গীয় মহারাজ অশেষ গুণধাম ছিলেন।

নিচুল। মহারাজ কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তোমার সন্ধানের আদেশ দিয়াছেন। চারিদিকে রাজানুচরগণ গিয়াছেন। এদিকে আসিয়াছেন স্বয়ং স্কন্দগুপ্ত। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমিই প্রথম তোমার সন্ধান পাইলাম।

কালিদাস। মহারাজের আমার বিষয় কি আদেশ?

নিচুল। তোমাকে সসম্মানে রাজধানীতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।

কালিদাস। যুবরাজ কোথায় গেলেন?

নিচুল। তিনি বিদূষক বামণকের সঙ্গে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ···এই কি তোমার কুটীর? চলো একটু বসি, বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

কালিদাস। চলো, একেবারে গৌতমের কুটীরে গিয়া বসি। তোমাদের আগমনকোলাহলে তাঁহারা বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

কালিদাস ও নিচুল গৌতমের কুটীরের দিকে যাত্রা করিল। তাহারা কিছুদূর আসিয়াই দেখিতে পাইল, একটি সরোবরতীরে বিদূষক বামণক অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

তাহাদের দেখিবামাত্র বামণক বলিয়া উঠিল—এই যে সীতার সন্ধান মিলিয়াছে। যাক্ বাঁচা গেল।

নিচুল। তোমার এমন দশা কেন?

বামণক। আমি ছিন্নপক্ষ জটায়ু।

নিচুল। যুবরাজ কোথায়?

বামণক। যুবরাজ কোথায়? বলো রামচন্দ্র।

কালিদাস। তিনি কি মৃগের পিছনে ছুটিলেন?

বামণক। মৃগই বটে, তবে স্বর্ণমৃগ।

নিচুল। কেমন?

বামণক। কেমন আর কি, যেমনটি হওয়া উচিত।

নিচুল। রহস্য রাখো, স্বরূপ বলো।

বামণক। মৃগের পিছনেই ছুটিতেছিলেন, সহসা সম্মুখে এক গাছের ছালপরা ঋষিকন্যাকে দেখিয়া তাহার পিছু লইলেন।

নিচুল। যাক্, মৃগটা বাঁচিল।

বামণক। কিন্তু সেই বেটীর অবস্থা এতক্ষণে কি হইল, তাহাই ভাবিতেছি।

নিচুল। তোমার অবস্থা তো ভালই দেখিতেছি।

বামণক। ভাল বই কি। একে বনে বনে ঘুরিয়া গায়ের, পায়ের ব্যথা, তার উপরে যুবরাজ এখন পড়িলেন ডাইনির কবলে। গোদের উপর বিষফোড়া আর কি!

কালিদাস। ঋষিকন্যার জন্য চিন্তা করিও না।

বামণক। না, সে চিন্তা করিবার জন্য তুমিই আছ। তাই বলি, রাজধানী ছাড়িয়া কি সুখেই না মজিয়া আছো। যুবরাজও যে আর শীঘ্র ফিরিবেন মনে হয় না। বড়লোকের কথাই আলাদা, পিণ্ডখর্জুর খাইয়া মুখ মরিয়া গিয়াছে—এখন কিঞ্চিৎ তিন্তিড়ির আবশ্যক।

কালিদাস। এখানে বসিয়া হা-হুতাশ করিয়া লাভ নাই। চলো, ঋষির কুটীরে চলো—পুরোডাস ও যবাগূ মিলিতে পারে।

বামণক। পারে নাকি! আহা, এ যে নন্দনকানন। কে বলিল ইহাকে অরণ্য! যতদিন ঐ সব বস্তু প্রচুর পরিমাণে মিলিবে—আমি এখান হইতে নড়িব না, যুবরাজের মৃগয়াও ধীরে-সুস্থে চলিতে থাকুক।

তখন তিন জনে ঋষির কুটীরের দিকে চলিল।

নিচুল। কবি, সবশুদ্ধ ব্যাপারটা মিলিয়া তোমার কোন অলিখিত নাটকের যেন প্রথম অঙ্কটা!

বামণক। এখন ঐ ঋষিকন্যা যুবরাজের অঙ্কগত হইলে নাটকের আর একটা অঙ্কপাত হইতে পারে। ঠাকুর, তোমার সেই অলিখিত নাটকখানার নাম দিও 'শকুন্তলা'—এ যেন তাহারই দৃশ্যের পর দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া চলিয়াছে।...ঠাকুর, ঋষিপত্নী রন্ধনে নিপুণ তো!

৩

গৌতম অতিথিগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। যক্ষের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া পরম গৌরব অনুভব করিলেন, বলিলেন,—কবি, আমরা অরণ্যবাসী

হইলেও কুমারসম্ভবকাব্যের কবির নাম আমাদের নিকটে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু প্রকৃত নাম গোপন করিবার উদ্দেশ্য কি ?

কালিদাস বলিল—অগৌরবের স্মৃতি কে কীর্তন করিতে চায় ? আমার নাম যখন আপনার জ্ঞাত, আমার নির্বাসনের কাহিনীও নিশ্চয় আপনার অজ্ঞাত নয়।

গৌতম। যথার্থ বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ যক্ষ নামটি নির্বাচনের রহস্য কি ?

কালিদাস। নিজেকে যক্ষ নামের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আমার নির্বাসিত জীবনের কাহিনী অবলম্বন করিয়া একখানি কাব্য রচনা করিয়াছি।

নিচুল। বেশ হইবে, রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই রাজসভাতে উহা পাঠ করিতে হইবে।

—না, যেখানে প্রথম রচনা, সেখানেই প্রথম পাঠ করা কর্তব্য।

সকলে পিছন ফিরে দেখিল স্বয়ং যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত।

গৌতম উঠিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। যুবরাজ তাঁহার পাদবন্দনা করিয়া উপবেশন করিল।

বামণক বলিল—কাব্যখানা পাঠ করিবার আগে কিছু আহার করিয়া লইলে হইত না ! তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ দিবার সুযোগ পাওয়া যাইত।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

গৌতম। আর্য, তোমার কথাই যথার্থ। সকল রসের মূলাধার জঠর। তাহাকে শান্ত করিয়াই অগ্রসর হওয়া উচিত।

কৃতজ্ঞ বামণক নিচুলের দিকে তাকাইয়া বলিল—এমন অন্তর্যামী না হইলে আর ঋষি।

স্থির হইল যে, আহার ও বিশ্রামের পরে গৌতমের কুটীর-প্রাঙ্গণে অপরাহ্নে মহাকবি কালিদাসের নূতন কাব্য পঠিত হইবে।

গৌতম বলিলেন—আমি অবিলম্বে চারিদিকের ঋষিপত্তনগুলিতে সংবাদ পাঠাইয়া দিতেছি, সকলেই আসিবেন।

তখনি তিনি উদ্দালক, অখণ্ডপুণ্য ও অন্যান্য ঋষিবালকগণকে সংবাদ দিবার আদেশ দিলেন। আর ঋষিকন্যাগণকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, তোমরা পঞ্চবটীর অঙ্গন বেশ পরিষ্কার করিয়া রাখো—আজ তৃতীয় প্রহরে সেখানে আর্যগণ সমবেত হইবেন।

ঋষিকন্যাগণ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে বামণক একজনকে বলিল—মাতঃ, তোমাদের মহানসের পথটা আমাকে দেখাইয়া দাও তো।

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল।

বামণক বলিল—ঋষিবাক্য ইতিমধ্যেই ভুলিয়া গেলেন? সকল রসের মূলাধার জঠর। সেই মূলাধারকে শান্ত করিতে যাইতেছি।

গৌতম বলিলেন—আর্য, সেই ভালো, যাহার যেখানে স্থান।

যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত শুধাইলেন—মহাকবি, তোমার কাব্যের কি নাম?

কালিদাস বলিল—মেঘদূতম্।

মহেন্-জো-দড়োর পতন

সিন্ধু নদের তীর বরাবর সুদীর্ঘ, সুদৃঢ়, সু-উচ্চ বাঁধ। বালির নয়, পাথরের নয়, প্রাকৃতিক নয়, ছোট মাপের ইঁটের তৈরী ; এক সময় মানুষে তৈরী করিয়াছে। কিন্তু কতকাল আগে, কালের দিগন্তে সে স্মৃতি আজ অস্পষ্ট ; বাঁধের গায়ে কত দিনের শ্যাওলা। নদীর ঘাত-প্রতিঘাতের কত চিহ্ন, কোন কোন অংশে ভাঙনের ক্ষত, আবার সেখানে মেরামত হইয়াছে।

বহু পুরুষ ধরিয়া মানুষে বাঁধটি দেখিতেছে ; লোকে নদীর ঐতিহ্যের যেমন সন্ধান করে না, বাঁধটি সম্বন্ধেও তাই—দুই-ই এখন সকল প্রশ্নের অতীত, দুইটিকেই মানুষে বিনা প্রশ্নে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

বাঁধের একদিকে নদী, অপর দিকে নগর। নগরের দিক্ হইতে মাঝে মাঝে বাঁধে উঠিবার সোপান-শ্রেণী। বাঁধের মাথাটা বেশ প্রশস্ত, ৫।৭ জন মানুষ স্বচ্ছন্দে পায়চারী করিতে পারে, করেও তাই। ওখানে বেড়াইবার একটা স্থান, কত লোকে সকাল বিকাল ওখানে হাওয়া খাইতে বেড়াইয়া থাকে।

আমাদের গল্পের সূত্রপাত ঐ বাঁধটার উপরে। সেখানে দুইজন লোক পাশাপাশি বেড়াইতেছিল, হাওয়া খাইতেছিল—এমন নয় ; কারণ এখনো সান্ধ্য-বিচরণকারী দলের আসিবার সময় হয় নাই।

দু'জন লোকই দীর্ঘকায়, একজনের দাড়ি গোঁফ দীর্ঘ, আর একজনের গোঁফ ছোট করিয়া ছাঁটা, কিন্তু দাড়ি দীর্ঘ ; দু'জনেরই চুল লম্বা—সে চুল পিছন দিকে খোঁপার আকারে সজ্জিত, তাহাতে সোনার কঙ্কতিকা (কাঁকই) গোঁজা। বাম কাঁধের উপর, দক্ষিণ বাহুর নীচে দিয়া গায়ের কাপড় জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত, অধোবাস অদৃশ্য। দু'জনাকেই সম্ভ্রান্ত পুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

তাহারা নদীর দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিতেছিল—তাহাদের নিকটে দাঁড়াইলে, পূর্বদিকে মুখ ফিরাইলে দেখা যাইবে নদীর বিস্তৃত প্রবাহ, অনেক নিচে বলিয়া স্রোতোহীন প্রতীয়মান, কিন্তু মাঝে মাঝে দ্রুতগামী নৌকা দেখিলে স্রোতের প্রচণ্ডতা অনুমান হয়—আবার পশ্চিম দিকে চাহিলে দেখা যাইবে নগরের উচ্চাবচ সৌধতরঙ্গ—দূরে বলিয়া, নিচে বলিয়া দাবার ছকের মতো

দৃশ্যমান—তিনতলা বাড়ীগুলোও খেলাঘরের মতো। বাঁধটা কত উঁচু—আর সম্মুখে পশ্চাতে বাঁধের বিস্তৃত শিরদাঁড়া—দুই দিকের দিগন্তে সূক্ষ্ম সূচালো হইয়া যেন মিশিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তি দুইজন এবারে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল—এই আমাদের শত্রু, নদীই আমাদের শত্রু, আবার নদীই আমাদের মিত্র।

অপর জন বলিল—শত্রুতা, মিত্রতা—সবই অবস্থার উপরে নির্ভর করে।

পূর্বোক্ত জন বলিল—সেনাধ্যক্ষ, তোমার কথা অর্ধসত্য, সবই নিজেদের উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় জন বলিল—পূর্ত-সচিব, তোমার কাজ নদীকে সংযত করা, আমার কথাকেও তুমি সংযত করিয়া যথার্থ রূপ দিয়াছ।

তাহাদের কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—একজন নগরের সেনাধ্যক্ষ—অপর জন পূর্ত-সচিব, দু'জনেই নগরপ্রধানগণের শ্রেণীভুক্ত।

পূর্ত-সচিব বলিল—এবারে বন্যায় খুব জোর ধরবে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল—কি ভাবে বুঝিলে ?

দেখ না কেন, এখন বর্ষার প্রারম্ভ, ইতোমধ্যেই জল বাঁধের কতটা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তা' ছাড়া, আমি দেখিয়া আসিতেছি যে, পাঁচ বৎসর অন্তর প্রবলতর বন্যা হইয়া থাকে।

—হোক প্রবল বন্যা। তোমার বাঁধ আমাদের প্রহরী।

—প্রহরী প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে—আজ তাহার জীর্ণদশা। এবার বর্ষা অন্তে বাঁধ মেরামত না করিলেই নয়।

—আমিও তাহাই বুঝি, কিন্তু নগরপ্রধানগণ কি অর্থ ব্যয় করিতে রাজী হইবেন ?

—আমারও সেই আশঙ্কা। তাঁহাদের অধিকাংশই বয়সে নবীন, তাঁহারা নগরের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তাকে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলিয়া মনে করেন। বাঁধ মেরামতের প্রশ্ন তুলিলেই তাঁহারা বলিবেন—ওটা পূর্তসচিবের একটা খেয়াল, নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার জন্য কেবল বাজে খরচের বাবদ অর্থ চান! কিন্তু—

—কিন্তু আমরা দু'জনেই বৃদ্ধ, আমরা জানি—হ্রাস বৃদ্ধি, উত্থান পতন, জীবন ও মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম!

—সেই তো বিপদ্! নবীনেরা এসব কথা বুঝিতে চায় না। তাহারা বাঁধ-মেরামতের অনিবার্য অর্থ দিয়া নগরের স্থানে স্থানে দেবলিঙ্গ স্থাপন করিতেছে, অনর্থক ধুমধাম করিয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছে। আমাদের সতর্কবাণী তাহারা শুনিতে চায় না।

—ঐ আর এক বিপদ্। আমাদের প্রাচীন মৎস্য-পূজায় এখন আর কাহারো মন নাই। নবপ্রবর্তিত লিঙ্গ-পূজায় এখন সকলেই উন্মত্ত। কিন্তু পূর্ত-সচিব, ভাবিয়া দেখো, সে পূজা কত সরল ছিল, আড়ম্বর ছিল না, আবার আন্তরিকতারও অভাব ছিল না। আর এই মৎস্যদেব তো সিন্ধু নদেরই প্রতীক।

—সেই কথাই তো বলিতে চেষ্টা করিতেছি, নদীর দিক্ হইতে আমাদের মন নগরের দিকে, সরলতার দিক্ হইতে আড়ম্বরের দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। বাঁধের উত্তর দিক্‌টা দেখিয়াছ কি? এবার বর্ষায় যদি টেঁকে—সৌভাগ্য, বর্ষার অন্তে মেরামত না করিলেই দুর্ভাগ্যের চরম হইবে।

—পূর্ত-সচিব, তোমার ঐ উত্তর দিকের প্রসঙ্গে একটি জরুরী বিষয় মনে পড়িল। আমার গুপ্তচরেরা নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের আমি উত্তর দিকের খবর সংগ্রহ করিতেই বিশেষভাবে আদেশ করিয়াছি। একজন দূত দুই শত ক্রোশ অবধি গিয়াছিল। সেখানে একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, সে আগেও সেখানে একবার গিয়াছে। কিন্তু এবারে গিয়া দেখিল, নগরের সে পূর্বসমৃদ্ধি নাই।

—এমন বিপদ কেন ঘটিল? বন্যা?

—না।

—অগ্নি?

—না।

—ভূমিকম্প?

—তবে কি শত্রু?

—এবারে ঠিক অনুমান করিয়াছ।

—কিন্তু তাহাদের কি সৈন্য ও অস্ত্র ছিল না?

—ছিল বই কি।

—তবে?

—আততায়ী মহাশক্তিসম্পন্ন।

—হইলেও মানুষ ছাড়া কিছু নয়।

—সে কথা ঠিক। কিন্তু তাহাদের বাহন এক প্রকার দ্রুতগামী জীব। সেই বায়ুগতি বাহনে চড়িয়া তাহারা অতর্কিতে আসে, অতর্কিতে যায়, পদাতিকে তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কেন?

—এত সংবাদ দূত রাখিল কি প্রকারে?

—একবারের আক্রমণের সময়ে সে উপস্থিত ছিল।

—কি সেই জন্তু?

—দূত তাহার একটা ছবি আঁকিয়া আনিয়াছিল।

—ছবিখানা দেখিয়াছ? দেখিয়া কি বুঝিলে?

—বুঝিলাম, সে জন্তু তেজস্বী, দ্রুতগামী; আর বুঝিলাম, এদেশে কেহ তাহা দেখে নাই, এদেশে সে জন্তু নাই!

—কিন্তু দুই শত ক্রোশ দূরের ভয়ে ভীত হইবার তো কারণ দেখি না।

—পূর্ত-সচিব, যে বন্যায় আমরা সর্বদা শঙ্কিত, তাহা তো আরও দূর হইতে আসিয়া থাকে।

—তা বটে।

—আর এমন দ্রুতগামী বাহন যাহাদের, তাহারা কি একটা নগর ধ্বংস করিয়াই ক্ষান্ত হইবে? সিন্ধুলালিত শ্রেষ্ঠ নগরের সংবাদ কি তাহাদের কানে পৌঁছিবে না?

—এ আশঙ্কা মিথ্যা নয়। চলো, আজ তোমার আবাসে গিয়া সেই অদ্ভুত জীবের ছবিটা দেখিব, সেখানা আছে তো?

—আমি যত্নে রাখিয়া দিয়াছি।

দুইজনে যখন বাঁধ হইতে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তখন একজন নাগরিক ব্যস্তভাবে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, নত হইয়া অভিবাদন করিল; বলিল—নগরপ্রধানগণ শীঘ্র আপনাদের স্মরণ করিয়াছেন।

—কেন হে বাপু?

—তাহা আমি জানি না, তবে কোন বিপদ্ ঘটিয়া থাকাই সম্ভব।

—তাঁহারা কোথায়?

—মুখ্য স্নানাগারের নিকটবর্তী চত্বরে, সেখানে একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

—ভিড়ের মধ্যে কি আছে ?

—তাহা আমি দেখি নাই, আমি দূরে ছিলাম।

—আচ্ছা, চলো যাওয়া যাক্।

তখন তাহারা দুইজনে দূতের অনুসরণ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া বাঁধ হইতে নামিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্বোক্ত স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা দেখিল, সত্যই এক বৃহৎ জনতা, চত্বর পূর্ণপ্রায়। তাহাদের দেখিবামাত্র পথাধ্যক্ষ, শকটাধ্যক্ষ এবং আরও ২।৪ জন রাজপুরুষ অগ্রসর হইয়া আসিল ; বলিল—আসুন, এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে।

হঠাৎ এমন কি বৈচিত্র্য ঘটিল, বুঝিতে না পারিয়া তাহারা ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল—দেখিল, মাঝখানটা ফাঁক, আর সেখানে দাঁড়াইয়া আছে এক অদৃষ্টপূর্ব জন্তু।

পূর্ত-সচিব বলিল—সেনাধ্যক্ষ, দেখ এক অদৃষ্টপূর্ব জানোয়ার।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আমার একেবারে অদৃষ্ট নয় ; এ সেই জানোয়ার।

পূর্ত-সচিব সেনাধ্যক্ষের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সে মুখে পরিহাসের ছায়ামাত্র নাই ; দেখিল—অমিতবিক্রম সেই পুরুষের মুখ পাংশু! পূর্ত-সচিবও ভীত হইয়া উঠিল।

ইতোমধ্যে জনতা সেই জন্তুটিকে লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, কেহ লেজ ধরিয়া টানিতেছে, কেহ খোঁচা মারিতেছে, কেহ বা মুখের কাছে শষ্পমুষ্টি ধরিতেছে ; কিন্তু তেজস্বী জন্তুটার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। সে গ্রীবা বাঁকাইয়া দণ্ডায়মান, মাঝে মাঝে নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইতেছে, চক্ষুর শ্বেতাংশ ঘূর্ণিত করিতেছে, দূর পথ-অতিক্রমণে ক্লান্ত বলিয়া বক্ষ কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হইতেছে—আর নিতান্ত বিরক্তি বোধ করিলে লেজটি আন্দোলিত হইতেছে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল—এ জন্তু আসিল কোথা হইতে ?

একজন নাগরিক অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—আমার ক্ষেতখামার এখান হইতে দূরে, প্রায় দুই দিনের পথ, সেখানে মাঝে মাঝে গিয়া তদারক করি। এবারেও গিয়াছিলাম, আজ সকালে উঠিয়া দেখি, জানোয়ারটা ক্ষেতের শস্য খাইতেছে, তখন—

—দাঁড়াও। দু'দিনের পথ তুমি একদিনের মধ্যে আসিলে কি প্রকারে ?

—উহার পিঠে চড়িয়া।

—তোমার খামার কোন্ দিকে ?

—উত্তর দিকে।

—সর্বনাশ !

সেনাধ্যক্ষের ভয়ের কারণ আর কেহ বুঝিতে না পারুক, পূর্ত-সচিব কতকটা বুঝিল।

সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণকে বলিল—নগরপ্রধানগণের এখনি একবার সম্মিলিত হওয়া আবশ্যক। আপনাদের আপত্তি না থাকে তো, আমার ভবনে আসিলে সুখী হইব।

সকলে বলিল—আপত্তি কি ?

সেনাধ্যক্ষ পূর্ত-সচিবের উদ্দেশ্যে বলিল—সেই ছবিটার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারিবে।

তখন রাজপুরুষগণ সেনাধ্যক্ষের ভবনের দিকে চলিল, যাইবার আগে সেনাধ্যক্ষ জানোয়ারটাকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য আদেশ দিয়া গেল।

পাঠক, এই নগরীর নাম মহেন্-জো-দড়ো। আজকার ধ্বংসাবশেষ নয়, পাঁচহাজার বছর আগেকার ধনে জনে সমৃদ্ধিতে পূর্ণ জীবনচঞ্চল নগর, তৎকালীন নাম 'নন্দুর'। আর ঐ অদৃষ্টপূর্ব জন্তুটি একটি ঘোড়া।

২

সেনাধ্যক্ষের আবাসে রাজপুরুষগণের সভা বসিয়াছে। সেনাধ্যক্ষ বিপদের আশঙ্কা সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। বাঁধের উপর পূর্ত-সচিবকে যে সব কথা সে বলিয়াছিল, তাহাই আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছে, গুপ্তচর কাষ্ঠফলকে জন্তুর যে চিত্র আঁকিয়া আনিয়াছিল, তাহা সকলকে দেখাইয়াছে, সেই চিত্রের সঙ্গে জানোয়ারটির সাদৃশ্য দেখাইয়া দিয়াছে—আর বলিয়াছে, নূতন যে দুর্ধর্ষ জাতি সুদূর উত্তরে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে—এইরূপ দ্রুতগতি বাহনের জন্যই তাহারা অজেয়। তাহাদের হাতে দুইশত ক্রোশ দূরবর্তী সমৃদ্ধ নগরের যেভাবে পতন হইয়াছে, তাহারও বর্ণনা করিতে ভোলে নাই। এবং সর্বশেষে সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া প্রস্তাব করিয়াছে যে, নগর রক্ষা করিতে হইলে অন্য খাতে ব্যয় বন্ধ করিয়া উত্তর দিকে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর তুলিতে হইবে।

পূর্ত-সচিব সেনাধ্যক্ষের যুক্তি ও প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইয়া বলিয়াছে যে,

নগরের দুটি শক্র। একটি নদী—এতদিন তাহাকেই মাত্র শক্র বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সম্প্রতি আরও একটি শক্রর আভাস শুনিতে পাওয়া গেল। পূর্ত-সচিব প্রস্তাব করিয়াছে যে, নগর রক্ষার জন্য উত্তর দিকে প্রাচীর গাঁথা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি অত্যাবশ্যক বাঁধের সংস্কার। সে জানাইয়া দিয়াছে যে, বাঁধটি অনেক কাল সংস্কৃত হয় নাই—উত্তর দিক্‌টায় এমনি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, এই বর্ষাতেই কি হয় বলা যায় না। আর কোনমতে এবার বর্ষাকালে টিকিয়া গেলেও আগামী বর্ষায় ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী, তখন নগরের কি অবস্থা হইবে, সকলকে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছে।

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করিয়া থামিল, কিন্তু তাহাদের কথায় আর কেহ যে বিচলিত হইল, এমন বোধ হয় না। তাহার একটি কারণ, সমবেত রাজপুরুষগণের মধ্যে এই দুই জনেই বয়সে বৃদ্ধ, অবশ্য পদগৌরবেও শ্রেষ্ঠ। অন্য সকলের বয়স তারুণ্যের কোঠায়, দু'একজনকে প্রৌঢ়ও বলা যাইতে পারে।

পথাধ্যক্ষ বয়সে তরুণ। সে এবারে উঠিল এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—মাননীয় রাজপুরুষদ্বয়ের কথা শুনিলাম, কিন্তু আমি তো উদ্বেগের কারণ দেখি না, যেহেতু কোথায় কোন্ সম্ভাবিত শত্রু রহিয়াছে, তাহার আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিলে জীবনযাত্রা দুরূহ হইয়া পড়ে। একটি অদ্ভুত জানোয়ার নগরে আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা স্বেচ্ছায় আসে নাই, আনীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঐ নিরীহ জানোয়ারটি কিরূপে যে এমন ভয়াবহ, তাহা বুঝি না। বাঘের মতো তাহার নখ নাই, গণ্ডারের মতো তাহার খড়্গ নাই, হস্তীর মতো তাহার দন্ত নাই—কোথায় তাহার ভীষণতা!

তাহার বর্ণনা শুনিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিল।

পথাধ্যক্ষ পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার বিবেচনায় সেনাধ্যক্ষের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। আর আপনারা যদি অনুমতি করেন তো বলি যে, নিজের মর্যাদা ও নিজ বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন।

এই বলিয়া পথাধ্যক্ষ বসিল। কেহ তাহার উক্তির প্রতিবাদ তো করিলই না, বরঞ্চ ভাবগতিকে বুঝিতে পারা গেল যে, তাহাতে তাহাদের অনেকেরই সমর্থন আছে।

এবারে শকটাধ্যক্ষ উঠিল ; বয়সে সেও তরুণ। সে বলিল—সেনাধ্যক্ষের উক্তির অর্বাচীনতা সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াছে, আর প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ত-সচিবের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাই।

এই বলিয়া আরম্ভ করিল—পূর্ত-সচিব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সর্বত্র তিনি ভয়ের ছায়া দেখিতে পান। এ বাঁধ কতকাল নির্মিত হইয়াছে, কেহই জানে না, পূর্ত-সচিবের বয়স যতই হোক, আমার বোধ হয় তিনিও জানেন না। এতদিনের মধ্যে বাঁধ ভাঙ্গে নাই, কাজেই এবারে ভাঙ্গিবে, এমন আশঙ্কা অমূলক। আর যদিই ভাঙ্গে, পূর্ত-সচিব আছেন কেন ? এমন অবস্থায় বাঁধের পিছনে অর্থব্যয় আর নদীর জলে তঙ্কা ফেলিয়া দেওয়া সমান। আমার বিবেচনায় এই উদ্দেশ্যে কপর্দক ব্যয় করাও সমীচীন নয়।

শকটাধ্যক্ষ বসিলে তরুণবয়স্ক অরণ্যাধিপতি উঠিল। সে বলিল—পূর্বোক্ত বিষয়দ্বয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট মনে করি। পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষের দাবী যে কত দূর ভিত্তিহীন, তাহা আপনারা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমার প্রসঙ্গ ভিন্ন। নগরের বৃহৎ স্নানাগারটি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—এখন সব সময়ে তপ্ত জল পাওয়া যায় না, মেঝে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, অনেক সময়েই স্নানার্থীরা পিছলে পড়িয়া যায়, এমন অবস্থায় একটি বৃহত্তর স্নানাগার-নির্মাণ আশু প্রয়োজন। নগরকোষের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রাচীর গাঁথিয়া অপব্যয় না করিয়া নাগরিকগণের সুখ-সুবিধা যাহাতে বাড়ে, সেই উদ্দেশ্যে একটি মনোরম স্নানাগার-নির্মাণ প্রয়োজন। অনেক বিলম্ব হইয়াছে—আর কালব্যাজ অমার্জনীয়।

এবারে পুনরায় সেনাধ্যক্ষ উঠিলেন ; তিনি বলিলেন—বিপদের আশঙ্কাকে আপনারা দূরবর্তী বলিয়াছেন, আমি তো দেখি, বিপদ একেবারে ঘরের মধ্যেই। বাহিরের আক্রমণ ভয়াবহ সত্য, কিন্তু তাহাতে জয়-পরাজয় দুই-ই সম্ভবপর। কিন্তু যে আক্রমণ আভ্যন্তরীণ, তাহার হাত হইতে বাঁচিবার উপায় কি ? আসল বিপদ আততায়ীর ভয় নয়, আসল ভীতি সেই ভয়কে অবহেলা। পুরাতন স্নানাগারে কেহ কেহ পা পিছলিয়া পড়িয়া গিয়াছে, ইহাতেই আপনারা বিচলিত, কিন্তু আপনাদের যে মনোভাব দেখিতেছি, তাহাতে সমস্ত নগরটাই অচিরে পা পিছলিয়া পড়িয়া যাইবে আশঙ্কা হইতেছে। আপনারা এখনো সতর্ক হোন।

সেনাধ্যক্ষ বসিলে পথাধ্যক্ষ বলিল—বিপদকালে বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করিবার

পরামর্শ আছে—আগে বিপদ আসুক, তার পরে বৃদ্ধেরা যেন মুখ খোলেন। এখনই বাক্যে কি প্রয়োজন! বৃদ্ধের মুখে বাচালতা নিতান্তই অশোভন।

—কিন্তু অর্বাচীন যখন পরামর্শদাতার পদ গ্রহণ করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, দুঃসময় ঘরের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সেনাধ্যক্ষই এই বাচালতার উত্তর দিতে পারিতেন, কিন্তু এ তাঁহার নিজ ভবন। আর সকলে তাঁহার অতিথি, কাজেই যে কথা এক্ষেত্রে তাঁহার বলা উচিত নয়, আমাকেই তাহা প্রকাশ করিতে হইল।

এই বলিয়া পূর্ত-সচিব বসিল।

এবারে অরণ্যাধিপতি উঠিল ; বলিল—এই সব দূরস্থিত বিপদের কচকচানি আর ভালো লাগিতেছে না। সন্ধ্যা সমাগত। আজরাত্রে বৃক্ষপূজার তিথি। সাতটি নরবলি হইবে। বলি প্রস্তুত। সেখানে যাইবার সময় হইয়াছে। চলুন, সেখানে যাওয়া যাক। কিন্তু তার আগে একটা কাজ সারিয়া লওয়া ভালো। এখানে রাজপুরুষগণ সমবেত হইয়াছেন, কাজেই নূতন স্নানাগার-নির্মাণের অর্থব্যয়ের অনুমতি আপনারা দিন।

এ বিষয়ে অধিক বিতর্ক হইল না, কেবল সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব মাত্র আপত্তি করিল, কাজেই অধিকাংশের সম্মতি অনুসারে নূতন স্নানাগার-নির্মাণের ব্যয় মঞ্জুর হইয়া গেল।

তখন আর সকলে প্রস্থান করিল, শুধু সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব মূঢ়ের মতো গালে হাত দিয়া সেই শূন্য সভাকক্ষে বসিয়া রহিল। বহির্গত রাজপুরুষদের পরিহাসের অট্টহাস্যও তাহাদের মৌনভঙ্গ করিতে পারিল না।

৩

এই ঘটনার পরে পূরা তিনটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং সেই সুদীর্ঘ সময়-মধ্যে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার লক্ষণমাত্রও দেখা যায় নাই ; কাজেই এখন বৃদ্ধদ্বয় সমস্ত নগরবাসীর উপহাসের পাত্র। না উত্তর দিক্ হইতে অজ্ঞাত শত্রু আক্রমণ করিয়াছে, না পূর্ব দিক্ হইতে পরিজ্ঞাত নদী বাঁধ ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছে।

যুগান্তকারী বিপদ্ আসিতে এক যুগ সময় নেয়—তাই বলিয়া বিপদ্ কখনোই

আসিবে না—এমন কথা মূর্খ ছাড়া কেহ বলে না। মানুষের জীবনে যুগ দীর্ঘ, সভ্যতার জীবনে তাহা পলকপাত মাত্র।

সেই ঘোড়াটি এখনো নগরে আছে। লোকে বিদ্রূপ করিয়া তাহাকে ডাকে সেনাধ্যক্ষ, আর ঘোড়াটির নখদন্তহীনতা স্মরণ করিয়া 'নখদন্তহীন বুড়ো' বলিয়া সেনাধ্যক্ষের উল্লেখ করে। পূর্ত-সচিবও বাদ যায় নাই। পূর্ত-সচিবের নাম পড়িয়াছে 'ভাঙ্গা বাঁধ', আর বাঁধটাকে সকলে পূর্ত-সচিবের কবরখানা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।

এই ভাবে সুখে দুঃখে তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল। চতুর্থ বৎসরে বর্ষাকালে বন্যায় জোর ধরিল, বাঁধের উত্তর দিক্‌টা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। বাঁধ রক্ষার জন্য পূর্ত-সচিবের অধীনে কতকগুলি 'রাজ' থাকিত, কিন্তু এ সঙ্কট রক্ষা করা তাহাদের সাধ্য নয়।

নিরুপায় পূর্ত-সচিব রাজপুরুষগণের নিকট লোক পাঠাইল। তাহারা দিবাভাগের অধিকাংশ সময় নবনির্মিত মনোরম স্নানাগারে কাটাইয়া থাকে।

"মহেন্-জো-দড়োর অন্যতম আশ্চর্য জিনিস, একটি স্নানাগার। স্নানাগারটি এত সুবৃহৎ ও সুগঠিত যে, এই যুগের পক্ষে ইহার চেয়ে ভালো আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ১৮০ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ১০৮ ফুট প্রস্থ। ইহা চতুর্দিকে ৭।৮ ফুট পুরু প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্নানাগারের মধ্যভাগে একটা প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট একটি সন্তরণ-বাপী আছে।......এই সন্তরণ-বাপীটির নির্মাণকৌশল খুব চমৎকার। বিংশ শতাব্দীর সুদক্ষ পূর্ত-বিশেষজ্ঞ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। এই বাপীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে সিঁড়ি এবং সিঁড়ির নীচে স্নানার্থীদের জলে নামিবার জন্য অনুচ্চ মঞ্চ ছিল। অদূরবর্তী কূপ হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা করিয়া বাপীটি জলপূর্ণ করা হইত এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত জলনিকাশের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাড়ে ছয় ফুট গভীর প্রণালী ছিল। এই জলাশয়ের চতুর্দিকে তিন চার ফুট পুরু করিয়া সুন্দর ও মসৃণ ইটের গাঁথনি দেওয়া হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গেই স্যাঁৎসেঁতে ভাব দূর করার জন্য এক ইঞ্চি পুরু শিলাজতুর প্রলেপ দিয়া যাহাতে ইট গড়াইয়া না পড়িতে পারে, তজ্জন্য এক সারি মসৃণ পাতলা ইট দিয়া চাপিয়া দেওয়া হইয়াছিল।......বৃহৎ স্নানাগারের নিকটে দক্ষিণ-

পশ্চিম কোণে আর একটি গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে পাঁচ ফুট উচ্চ কয়েকটি চতুষ্কোণ ইষ্টকমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়; ঐগুলিতে চুল্লী বসানোর জন্য খাঁজ কাটা রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, এই গৃহে চুল্লীর সাহায্যে স্নানাদির জন্য উত্তাপ-সঞ্চয়ের এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।" *

পূর্ত-সচিবের দূত আসিয়া দেখিল যে, রাজপুরুষগণ বাপীসলিলে জলক্রীড়া করিতেছে। সে সমস্ত নিবেদন করিল। একজন রাজপুরুষ বলিল—বড় সুসংবাদ। বাঁধ ভাঙ্গাই এখন দরকার, বাপীতে আজ জল কম।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আর একজন বলিল—তুমি তোমার প্রভুকে গিয়া বলো, তিনি যেন আর একটু কষ্ট করিয়া বাঁধটা ভাঙ্গিয়া দেন। নদী আমাদের মিত্র।

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

তৃতীয় আর একজন বলিল—পূর্ত-সচিব বাঁধ ভাঙ্গিয়া জল ঢুকিবে—দুশ্চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু জলের সঙ্গে যে প্রচুর মাছ ঢুকিবে—সে সুসংবাদ কি রাখেন?

হাসিতে হাসিতে বারংবার সুবৃহৎ স্নানাগার চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

অপ্রস্তুত দূত প্রস্থান করিল।

রাজপুরুষরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, নাঃ, বুড়ো দু'টোকে আর সহ্য করা যায় না!

কেহ বলিল—এ দু'টো আমাদের সকল সুখের কাঁটা!

কেহ বলিল—মরেও না, মুখও বোজে না!

—কেবল শত্রু আর বন্যা!

—কেবল এলো এলো, গেলো গেলো!

—ভয় দেখিয়ে আমাদের ভালো করিতে চান!

—আমরা খারাপটাই বা এমন কি?

—ওঁদের কালে ওঁরা যে কেমন ছিলেন, তা শুনেছি তো ঠাকুমার কাছে!

—রসনা ছাড়া যাদের আর সব ইন্দ্রিয় শিথিল, তাদের আর গতি কি বলো!

---

* 'প্রাগৈতিহাসিক মহেন্-জো-দড়ো'—শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, পৃ. ২৪-২৭।

—সেদিন 'নখদন্তহীন ঘোড়া' বলছিল যে, আমাদের বিলাসিতা আজকাল বড়ই বেড়ে উঠেছে, তাতেই নাকি আমাদের অধঃপতন হয়েছে।

—হয়েছে! একেবারে হওয়া শেষ! কি সর্বনাশ!

—এবারে বুড়ো দু'টোকে সরানো দরকার।

—না হে, দু'টো একটা বুড়ো থাকা ভালো, তাতে যৌবনের মূল্য বোঝবার সুবিধা হয়।

—তবে ফ্যাচ-ফ্যাচ করতে নিষেধ করে দিয়ো।

—তা না হলে আর বুড়ো কেন?

যাই হোক, পূর্ত-সচিবের প্রাক্তনের পুণ্যেই হোক আর বন্যার তীব্রতার অভাবেই হোক, বাঁধটা সে বার রক্ষা পাইয়া গেল। তাহাতে অন্যান্য রাজপুরুষগণের যুক্তিই প্রমাণিত হইল, বাঁধ ভাঙ্গিবার নয়। আর যা ভাঙ্গিবে না, তাহা রক্ষা করিবারই বা উদ্যম কেন! ঐ সূত্রে আরও একটা প্রসঙ্গ অনেকের মনে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল। যে বস্তু ভাঙ্গা-গড়ার অতীত, তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত আবার বৃত্তিদানের ব্যবস্থা কেন? ভাবে-গতিকে মনে হইতে লাগিল যে, বাঁধটি যাইবার আগেই হয় তো বা পূর্ত-সচিবের বৃত্তিটি যাইবে। হয় তো বা সত্যই যাইত, এমন সময়ে সেই বছরেই শীতকালে উত্তরের প্রত্যাশিত আশঙ্কা অপ্রত্যাশিতরূপে দেখা দিল।

শীতকালের প্রারম্ভে গুপ্তচর আসিয়া সেনাধ্যক্ষকে জানাইল যে, উত্তর দিকে অশ্বারোহী আততায়িগণ দেখা দিয়াছে। সে বলিল—ষোল ক্রোশ উত্তরে যে নগর আছে, অশ্বারোহিগণ তাহা লুটপাট করিতেছে এবং অগ্নিসংযোগে পোড়াইয়া দিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল, তাহারা সংখ্যায় কত?

—পাঁচ শতের অধিক হইবে মনে হয় না, কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

—তাহারা কি এ নগরে আসিবে?

—আমার মনে হয়, এই নগরের উদ্দেশ্যেই আসিতেছিল। ঐ নগরটি পথে পড়ায় এবং তাহারা বাধা দান করায়, আগে সেটিকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আচ্ছা, তুমি যাও, আমি যথোচিত ব্যবস্থা করিতেছি।

সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। সে জানিত, তাহারা

কোথায় থাকিবে। স্নানাগারের দ্বিতলে বিশ্রামকক্ষেই অবশ্য তাহাদের পাওয়া যাইবে। পথিমধ্যে পূর্ত-সচিবকে সংগ্রহ করিয়া লইয়া তাহাকে বিপদের কথা জানাইল এবং দুইজনে স্নানাগারের বিশ্রামকক্ষে দ্বিতলে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিল, রাজপুরুষরা সেখানে অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত।

সেনাধ্যক্ষ সংক্ষেপে তাহাদের সব সংবাদ নিবেদন করিল, কিন্তু কেহ যে বিশ্বাস করিল, এমন বোধ হইল না।

একজন রাজপুরুষ বলিল—আপনি আমাদের বালক বলিয়া মনে করেন, তাই সদা-সর্বদা জুজুর ভয় দেখাইয়া থাকেন।

আর একজন বলিল—আজ চার বৎসর ধরিয়াই তো তাহারা আসিতেছে! এতদিন যদি আসিয়া না থাকে, তবে আজই বা আসিবার নিশ্চয়তা কি?

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আজ না আসুক, কাল আসিবে।

—তবে সে কাল দেখা যাইবে। আজ আমাদের খেলা শেষ করিতে দিতে দিন।······নাও—তোমার রাজাকে সামলাও।

সেনাধ্যক্ষ রুষ্ট হইয়া উঠিল; বলিল—আপনাদের সব খেলাই একেবারে শেষ হইবে।···

—দেখো মন্ত্রী গেলো!

একজন রাজপুরুষ বলিল—শত্রু আসে—যুদ্ধ করুন।

—শত্রু আসিলে যে যুদ্ধ করিতে হয় জানি। কিন্তু যুদ্ধ করিতে সৈন্যের প্রয়োজন। আজ চার বৎসর বৃত্তি না পাইয়া সৈন্যগণ কর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, কেহ বা নগরান্তরে গিয়াছে। আর যাহারা আছে, শুধু হাতে তাহারা লড়িতে পারে না, সংস্কার অভাবে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।

—আমরা তাহার কি করিব?

—কি করিব? আপনারাই কি এজন্য দায়ী নহেন? সৈন্যদলের প্রাপ্য বৃত্তি দিয়া আপনারা স্নানাগার গড়িয়াছেন, নূতন নূতন লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠায় অজস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন—এখন আমরা কি করিব?

—তবে এক কাজ করুন, অর্থ দ্বারা আততায়ীদের বশ করিয়া ফিরাইয়া দিন।

—আমি ব্যবসায়ী নহি, সৈনিক; আমি যুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু দালালী করিতে জানি না।

পূর্ত-সচিব বলিল—অর্থের স্বাদ তাহাদের দিবেন না, তাহা হইলে প্রতি বৎসর তাহারা অর্থের লোভে আসিয়া হাজির হইবে।

—তখন দেখা যাইবে। এবারে তো একটা ব্যবস্থা করুন।

—ও ব্যবস্থার মধ্যে আমি নাই। তার চেয়ে আসুন, সৈন্যদলের উপরে ভরসা না করিয়া আমরাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই না কেন?

পূর্ত-সচিব বলিল—এ যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

—হ্যাঁ, দুইজনে মিলিয়াছে ভালো! যান, আপনারা দুইজনে লড়াই করুন গিয়া, আমরা উহার মধ্যে নাই।

—তা থাকিবেন কেন?

সেনাধ্যক্ষ বলিতেছেন—আপনারা স্নানাগারে আছেন, অক্ষক্রীড়ায় আছেন, লিঙ্গপূজায় আছেন—আপনারা যুদ্ধের মধ্যে থাকিবেন কেন? বৃত্তি না পাইয়া সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—কত বার আপনাদের জানাইয়াছি! 'এই হইবে', 'আগামী বৎসর হইবে'! পাছে আমার গুপ্তচরেরা অশুভ সংবাদ আনিয়া আপনাদের বিলাসব্যসনে বাধা জন্মায়, তাই তাহাদের ধরিয়া ধরিয়া বৃক্ষদেবের নিকটে বলি দিয়াছেন! এখন যখন বিপদ আসন্ন, আপনারা সব দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিতেছেন—আমরা উহার মধ্যে নাই।

একজন রাজপুরুষ রাগিয়া উঠিয়া বলিল—মহাশয়, অধিক ফ্যাচ-ফ্যাচ করিবেন না, যান—ভাগুন।

এই বলিয়া একটি অক্ষগোলক সেনাধ্যক্ষকে ছুঁড়িয়া মারিল। কাষ্ঠগোলক তাহার কপালে লাগিয়া রক্ত বাহির হইল।

পূর্ত-সচিব বলিল—আপনারা বীর বটে, বন্ধুকে আঘাত করিতে হাত কুণ্ঠিত হয় না।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—এ মন্দের ভালো! হাত একবার উঠিয়াছে। এই হাত শত্রুর বিরুদ্ধে উঠুক!

—শত্রু আপনার মাথায়।

—তাই বুঝি সেখানে আঘাত করিলেন! আপনারা কেবল বীর নন, বুদ্ধিমান্‌ও বটে!—বলিলেন পূর্ত-সচিব।

—শত্রু আসুক, তখন দেখা যাইবে।

—শত্রু অবশ্যই আসিবে, তখন আর আপনাদের দেখা পাওয়া যাইবে না।

এই বলিয়া সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব স্থানত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। রাজপুরুষগণ পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিল।

—নাও, তোমার রাজা গেলো!

—মন্ত্রীর দোষেই।

তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে নগরবাসীরা এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে পাইল। তাহারা দেখিল, উত্তর দিগন্তে অকালে ধূলার ঝড় উঠিয়াছে। যাহারা জাগিয়া ছিল, ভালো করিয়া দেখিবার আশায় ছাদের উপরে উঠিল; যাহারা তখনো নিদ্রিত ছিল, নগরের কোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া 'কি হইয়াছে' শুধাইতে শুধাইতে বাহিরে আসিল!

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিবের কাছে এ দৃশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। তাহারা অপমানের আশঙ্কা সত্ত্বেও রাজপুরুষগণের ভবনের দিকে রওনা হইল।

পথাধ্যক্ষ জাগরিত হইয়া বলিল,—সত্যই আসিয়াছে, না সমস্তটাই আপনাদের কল্পনা!

অরণ্যাধিপতি বলিল—দূরে আছে, এদিকে না আসিতেও পারে।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আসিয়া পড়িলে আপনারা ব্যবস্থা করিবেন। সৈন্য নাই, অস্ত্র নাই, যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই, নামে মাত্র সেনাধ্যক্ষ হইয়া আমি কি করিব?

—সেজন্য আপনাকে দুশ্চিন্তা করিতে হইবে না, যান।

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব সমস্ত দৃশ্যটা পর্য্যবেক্ষণ করিবার আশায় বাঁধের উপরে গিয়া উঠিল।

বাঁধের উপর হইতে তাহারা দেখিল যে, ধূলার দিগন্ত ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, কাছে, আরো কাছে। ক্রমে ধূলিপটল ভেদ করিয়া অশ্ব ও অশ্বারোহী দৃষ্ট হইল। গুপ্তচরের অনুমান ভুল নহে, সংখ্যায় পাঁচ শতের কাছাকাছি। তাহারা দেখিল যে, পাঁচ শত অশ্বারোহী নগর-সীমান্তে উপস্থিত। তেজস্বী জন্তুর উপরে সমান তেজস্বী সব পুরুষ। তাহাদের অঙ্গে পশুচর্মের আচ্ছাদন, পৃষ্ঠে তূণ, স্কন্ধলগ্ন ধনুক, দক্ষিণ হাতে দীর্ঘ বর্শা, বাম হাতে বল্‌গা; আর সকলকে ম্লান করিয়া দিতে পারে, দেহের এমন জ্যোতির্ময় কান্তি। তাহারা দেখিল—আততায়ীদের বর্ণ গৌর, প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ণ নাসিকা, দীর্ঘ-প্রলম্বিত কেশ, মুখমণ্ডল গুম্ফশ্মশ্রুহীন। শত্রু হইলেও তাহাদের মনে

বিস্ময়ের ভাব উদিত হইল—হাঁ, ইহারাই দেশের অধিপতি হইবার যোগ্য বটে!

কিন্তু অলীক চিন্তার সময় তাহাদের ছিল না। তাহারা দেখিল যে, কয়েকজন রাজপুরুষ অশ্বারোহীদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। অশ্বারোহীদের কয়েকজন অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়পক্ষে কি সব কথাবার্তা হইতে থাকিল। অবশেষে তাহারা দেখিতে পাইল যে, শকট বোঝাই করিয়া থলিপূর্ণ যব গম ও নানাপ্রকার খাদ্য অশ্বারোহীদের নিকটে নীত হইতেছে। দেখিতে পাইল যে, মূল্যবান্ রঙিন চর্ম-থলিকায় বোঝাই স্বর্ণ-মুদ্রা তাহাদের নিকটে নীত হইতেছে। তাহাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, আত্মরক্ষার সহজতম পন্থাটাই গৃহীত হইল। তাহারা জানিত, সহজতম পন্থায় আত্মরক্ষা করিতে উদ্যত হইলে শেষ পর্যন্ত আত্মবিনাশ ঘটিয়া থাকে। তারপরে তাহারা দেখিল যে, থলিগুলি অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া আততায়িগণ ঘোড়ার মুখ উত্তরদিকে ফিরাইয়া দিল।

তখন শীতের সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

বাঁধ হইতে নামিবার মুখেই রাজপুরুষগণের সঙ্গে সেনাধ্যক্ষ ও তাহার সঙ্গীর সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের দেখিতে পাইয়া পথাধ্যক্ষ বলিল—এবারে বিশ্বাস হ'লো তো, যে আমরা শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ।

পূর্ত-সচিব। ইহার নাম আত্মবিক্রয়, আত্মরক্ষা নয়।

পথাধ্যক্ষ। আপনারা তো লড়াই করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের পরিণাম সব সময়েই অনিশ্চিত ; নিশ্চয়ের মধ্যে—লোকক্ষয়।

সেনাধ্যক্ষ। আরও একটা বিষয়ে নিশ্চিত। পরাজিত হইলে তাহারা আর এদিকে আসিত না।

পথাধ্যক্ষ। আর আসিবে না বলিয়া গিয়াছে।

সেনাধ্যক্ষ। আর পাঁচ শত মাত্র আসিবে না, এবারে পঞ্চাশ সহস্র আসিবে।

পথাধ্যক্ষ। আবার ভীতি প্রদর্শন?

অরণ্যাধিপতি। কেন পঞ্চাশ সহস্র আসিবে, কারণ শুনিতে পারি?

সেনাধ্যক্ষ। প্রথম কারণ, তাহারা ভাবিয়াছিল, অন্যান্য লুণ্ঠিত নগরের মতো ইহাও একটি ক্ষুদ্র পত্তন, তাই সামান্য সংখ্যায় আসিয়াছিল। দ্বিতীয়

কারণ, তাহারা দেখিল যে, সিন্ধুপত্তনের ইহা সব চেয়ে সমৃদ্ধ ও বৃহত্তম নগর। তৃতীয় কারণ, বুঝিয়া গেল যে, এই নগরে কেবল স্ত্রীলোক, বালক ও কাপুরুষের বাস; বুঝিয়া গেল যে, ইহারা শুধু কাপুরুষ নয়, নির্বোধও, নতুবা ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা করিত না। কাজেই আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, শীঘ্রই তাহারা এমন অমিত সংখ্যায় আসিবে, যাহাদের পরাস্ত করিবার বা উৎকোচ দ্বারা লোভ প্রশমিত করিবার ক্ষমতা আপনাদের নাই। চতুর্থ কারণ, ইহারা বীর পুরুষ।

পথাধ্যক্ষ। উহাদের বলিতেছেন বীর! ঐ তো চেহারা! পাথর-চাপা-পড়া ঘাসের মতো, বিবর্ণ রঙ্! বসন বুনিবার বুদ্ধি নাই বলিয়া যাহারা পশুচর্ম পরিধান করে! যেমন বীর, তেমনি বিদ্বান্, তেমনি বুদ্ধিমান্!

সেনাধ্যক্ষ। তৎসত্ত্বেও ইহাদের সম্মুখে এই সুবৃহৎ দেশের গৌরবময় ভবিষ্যতে বিস্তারিত। এখনো সতর্কবাণী অবধান করুন, অবিলম্বে প্রস্তুত হোন, নতুবা অচিরকাল মধ্যে আপনাদের সমৃদ্ধি ও জীবন ঐ অস্তমান সূর্যের মতো বিলয়ের দিগন্ত স্পর্শ করিবে।

সেনাধ্যক্ষের কথায় সকলের হুঁশ হইল। তাই তো, সন্ধ্যা সমাগত!

পথাধ্যক্ষ বলিয়া উঠিল—বৃথা বিতর্কে লাভ নাই, আজ লিঙ্গপ্রতিষ্ঠার ভোজের নিমন্ত্রণটা বিস্মৃত হইবেন না। সন্ধ্যার পরেই সময়, স্থান—এই দীনের ভবন।

অত্যাবশ্যক কার্যসূচী মনে পড়িয়া যাওয়ায় সকলে দ্রুত প্রস্থান করিল। সেনাধ্যক্ষ ও পূর্তসচিবকে কেহ আহ্বান করিল না। তাহারা সেই নির্জন অন্ধকারের মধ্যে মূঢ়ের মতো নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতেও সাহস হইল না।

৪

সেনাধ্যক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে বড় বিলম্ব হইল না। পর বৎসর বর্ষাকালেই খবর আসিয়া পৌঁছিল যে, অশ্বারোহী আততায়ী আসিতেছে, এবারে আর পাঁচ শত মাত্র নয়, অগণ্য। শীতকালেই যুদ্ধের প্রশস্ত সময়; কিন্তু শত্রু বুঝিয়াছে, দুর্বল ও কাপুরুষকে আক্রমণে কালাকাল বিচারের প্রয়োজন নাই।

এই কয়েক মাসের মধ্যে নগরের নৈতিক মেরুদণ্ড আরও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। রাজপুরুষগণ দেখিয়াছে যে, সৈন্যের চেয়ে স্বর্ণ অধিক শক্তিক্ষম। তাহারা সৈন্যদল একেবারেই ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, কেবল সেনাধ্যক্ষের মুষ্টিমেয় অনুচরকে দূর করিতে পারে নাই। সৈন্যে আর প্রয়োজন কি? শত্রুরা কি বলিয়া যায় নাই যে, তাহারা আর আসিবে না? আর যদিই বা আসে, যুদ্ধে বৃথা রক্তক্ষয় না করিয়া উৎকোচ দান করিলেই কার্য সিদ্ধ হইবে।

আবার রাজপুরুষগণের জীবনযাত্রা অনুসরণ করিয়া নগরের সাধারণ লোকেরাও বিলাসের সুলভ সংস্করণ প্রচারণায় লাগিয়া গিয়াছে। আগে যে অর্থ ও সামর্থ্য তাহারা চাষবাসে নিয়োগ করিত, তাহা দিয়া স্থানে স্থানে স্নানাগার তৈয়ারী করিয়াছে, রাজপুরুষগণের স্নানাগারের মতো তেমন মনোরম নয়, তবে মন্দও নয়; স্থানে স্থানে লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহার পূজায় সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকে; আর আগে যাহাদের গমের ও যবের রুটি হইলে চলিত, এখন অন্ততঃ তাহার সঙ্গে মাছমাংসের ৫।৭টি পদ আহার করিয়া থাকে। রাজপুরুষগণের আহার্য কমপক্ষে দশপদী। রাজপুরুষগণ আগে তামার পাত্র ব্যবহার করিত, এখন রৌপ্যপাত্র ব্যবহার করে; লোকসাধারণ আগে মৃন্ময় পাত্র ব্যবহার করিত, এখন তাম্রপাত্র ছাড়া ব্যবহার করে না। ফলকথা, সমস্ত নগর বিলাসের স্রোতে গা ছাড়িয়া দিয়াছে। নদীর স্রোত সমুদ্রগামী, জাতীয় বিলাসের স্রোত সর্বনাশের সমুদ্র পর্যন্ত না লইয়া গিয়া থামে না। বিশেষ সকলেই দেখিয়াছে যে, আর যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া মরিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে আর নিয়মচর্যায় ও সামরিক শৃঙ্খলায় আবশ্যক কি? শত্রুকে বশ করিবার মতো নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন সমাজ আত্মার চেয়ে অর্থের উপরে যখন বেশী ভরসা করে, বুঝিতে হইবে, তখন সর্বনাশের আর বিলম্ব নাই।

এই সর্বনাশের প্লাবনের মধ্যে যুগল গিরিশৃঙ্গের মতো সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব অটল, অচল। সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণের ভরসা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে, আশঙ্কার কারণ সে আর বুঝাইতেও চেষ্টা করে না। প্রয়োজন কি! ঐ তো এক কথা শুনিতে হইবে,—মহাশয়, আমাদের সৈন্য নাই থাকিল, স্বর্ণ আছে। এখন সে মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে, জয় করিবার আশায় নয়, বাধা দিবার জন্য এবং মরিবার জন্য। সময়বিশেষে জয়ের চেয়ে পরাজয় অধিকতর গৌরবদ্যোতক। সেনাধ্যক্ষ জানিত, স্বর্ণস্বাদলুব্ধ শত্রু আবার

আসিবে এবং তাহা অগৌণে। কিন্তু পরবর্তী শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যে বর্ষাকালেই আসিয়া দেখা দিবে, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই।

পূর্ত-সচিবের অবস্থাও সমান অসহায়। সে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে, এবারে বন্যার পঞ্চবার্ষিক জোর বাঁধিবার সময়, বাঁধ মেরামত না করিলে নগর রক্ষা পাইবে না। কিন্তু কে কার কথা শোনে! শঙ্কার সতর্কবাণী বিলাসের কানে কবে প্রবেশ করিয়া থাকে? রাজপুরুষগণের সহযোগিতা ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। অর্থ কোথায়? লোকজন কোথায়? সেনাধ্যক্ষের মতো তাহারও অবশ্য মুষ্টিমেয় অনুচর আছে, কিন্তু বাঁধের এখন যে অবস্থা, তাহা মুষ্টিমেয়ের সাধ্যের অতীত। সে অবশ্যম্ভাবীকে মানিয়া লইয়া সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়াছে যে, বর্ষাকালে উভয়ের অনুচর একত্র করিয়া বাঁধ রক্ষা করিবে এবং শীতকালে আবার উভয়ের অনুচর একত্র করিয়া আততায়িগণকে বাধা দিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তখন তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, দুই বিপদ্ একত্র আসিয়া পড়িয়া তাহাদের সমস্ত পরিকল্পনা পর্যুদস্ত করিয়া দিবে। ধর্ম যখন মারে, তখন একেবারে সমূলে আঘাত করিয়া মারে।

একদিন বর্ষার প্রারম্ভে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব বাঁধের উপর ঘুরিতেছিল, পূর্ত-সচিব এখন দিনরাত্রির অনেকটা অংশই বাঁধের উপরে কাটাইয়া থাকে। মুমূর্ষু সন্তানের শিয়রে জননীর মতো, বন্যাপ্রহৃত নগরের ঊর্ধ্বে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ—দু'জনেই নির্নিমেষদৃষ্টি। জল প্রতিদিন বাড়িতেছে, স্রোত প্রতিদিন প্রবলতর হইতেছে; বাঁধের উত্তরদিকের কতকটা ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, এখনো নগরে জল প্রবেশ করে নাই বটে, তবে আর খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িলেই করিবে। পূর্ত-সচিবের অনুচরেরা ভগ্নস্থান গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দিনে যেটুকু গাঁথিয়া তোলে, রাত্রে জল বাড়িয়া সেটুকু ধ্বসিয়া যায়। মানুষের হাতে ও নদীর স্রোতে সে এক প্রতিযোগিতা পড়িয়া গিয়াছে।

বাঁধের নীচে কারিগরেরা দেওয়াল গাঁথিতেছে, উপরে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ কথোপকথনের অবকাশে তাহাদের কাজ দেখিতেছে।

পূর্ত-সচিব। নদী ইতিমধ্যেই কত প্রসারিত হইয়া গিয়াছে, ওপার আর দেখা যায় না।

সেনাধ্যক্ষ। বর্ষার সূচনাতেই এমন তো কখনো দেখি নাই।

পূর্ত-সচিব। কাল রাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়াছি। নদী যেন দ্বিধা হইয়া নগরকে গ্রাস করিতে উদ্যত। সে যেন সাপের দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা; একটা আসিতেছে পূব হইতে, আর একটা উত্তর হইতে—দু'টাতে মিলিয়া নগরকে জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত।

সেনাধ্যক্ষ। পূবেরটা বুঝিতে পারি, নদী। উত্তরেরটা কি?

পূর্ত-সচিব। স্বপ্নের আবার বোঝাবুঝি!

সেনাধ্যক্ষ। বোধ করি, তাহারও প্রয়োজন আছে। উত্তর দিকের বিপদ্‌ও আমাদের আসন্ন।

পূর্ত-সচিব। শত্রু? সে তো শীতকালে।

সেনাধ্যক্ষ। তাহা হইলেই মন্দের ভালো। তবে রক্ষা কিছুতেই নাই। ঐ যে নগরের অগণ্য গৃহ হইতে সূপকার্যের ধূম উঠিতেছে, উঠিতেছে ক্ষীয়মাণ কর্মকোলাহল, ঐ যে পথে লোক-জীবনের চঞ্চলতার চিহ্ন, আর, ঐ যে আরও দূরে ছক-কাটা ক্ষেত্রসমূহে গোধূমের নবাঙ্কুর, ঐ যে গৃহপালিত গো-মহিষ, ছাগ প্রভৃতি—পালনকর্তার সঙ্গে ইহারাও লোপ পাইবে!

পূর্ত-সচিব। কেমন করিয়া জানিলে?

সেনাধ্যক্ষ। তোমার সেই স্বপ্নে দৃষ্ট দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা—

পূর্ত-সচিব। পূবেরটাকে হয় তো এবারেও সংযত রাখিতে পারিব।

সেনাধ্যক্ষ। কিন্তু উত্তরেরটা? প্রকৃতির লোভ সীমাবদ্ধ, মানুষের লোভকে সংযত করিবে কার সাধ্য?

পূর্ত-সচিব। আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?

সেনাধ্যক্ষ। কি জানি। ও কিসের গর্জন?

পূর্ত-সচিব। নদীর। পরিচিত গর্জন।

সেনাধ্যক্ষ। তাও বটে! কিন্তু আজ সমস্তর উপরেই কেমন একটা অপরিচয়ের সূক্ষ্ম পর্দা যেন পড়িয়া গিয়াছে!

পরদিন প্রাতঃকালে গুপ্তচর আসিয়া জানাইল যে, উত্তরদিকে অশ্বারোহী আততায়ী দেখা দিয়াছে। এই সংবাদে সেনাধ্যক্ষ বিস্মিত বা বিচলিত কিছুই হইল না, কেবল শুধাইল সংখ্যায় কত?

—অগণ্য, অসংখ্য, তরঙ্গের পরে তরঙ্গ।

ঠিক হইয়াছে। যাও, রাজপুরুষদের নিবেদন করো গিয়া। আমার আর

কিছু করিবার নাই। কেবল আমার অনুচরদের বলিয়া দিয়া যাও, এখন হইতে তাহারা আমার আবাসের নিকটই যেন থাকে, ডাকিবামাত্র যেন পাই।

গুপ্তচর প্রস্থান করিল।

তাহার কথা রাজপুরুষগণের কেহই বিশ্বাস করিল না। কেহ রাগ করিল, কেহ বিরক্ত হইল; কেহ বলিল, সেনাধ্যক্ষ একবার নিজে না আসিয়া লোক পাঠাইয়া পরীক্ষা করিতেছে; কেহ বলিল, আগে আসুক, কেহ বলিল, কোষাধ্যক্ষ যেন কিছু স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত রাখে। দূত চলিয়া গেলে তাহারা পুনরায় বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন হইল।

৫

নগরের চিহ্নিত জীবনের আরও একটা দিন গত হইয়াছে। প্রাতঃকাল। বাঁধের উপরে দণ্ডায়মান পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ। তাহারা নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছে এবং পরস্পরের মনও জানে। রাত্রের মধ্যে জল অনেকটা বাড়িয়াছে, কারিগরেরা ভাঙ্গা জায়গা বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ। পূর্ত-সচিব, শেষে তোমার সেই স্বপ্নের কথাই সত্য হইয়া উঠিল দেখিতেছি।

পূর্ত-সচিব। কোন্ কথা?

সেনাধ্যক্ষ। সেই উত্তর দিকের জিহ্বা।

এবারে পূর্ত-সচিব কালকার মতো আর প্রতিবাদ করিল না, উত্তর দিকের বিপদ্ সম্বন্ধে এখন তাহারা নিঃসংশয়, বস্তুতঃ উত্তর দিগন্ত কখন চঞ্চল হইয়া উঠিবে, তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যেই বাঁধের উত্তর প্রান্তে উত্তর দিকে মুখ করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া ছিল। যে কোন মুহূর্তে উত্তর সীমান্তে ধূলা উড়িয়া উঠিতে পারে।

মধ্যাহ্ন কাটিল, অপরাহ্ণও কাটিয়া গেল, রাত্রি আসিয়া পড়িল। নগরের কোলাহল কমিল, নদীর কলগর্জন বাড়িল; গৃহে গৃহে দীপ জ্বলিল, আকাশে তারা ফুটিল; পূবে একখানা ঘনমেঘ উঠিল, তাহার ছায়ায় নদী চামুণ্ডামূর্তি ধরিল।

পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ বাঁধ হইতে নামিয়া যাইবে, এমন সময়ে পূর্ত-সচিব চমকিয়া বলিল—ও কি!

—তাই তো ও কি !

উত্তর দিগন্তে অস্পষ্ট আলোর বিন্দু।

—ওখানে তো আলো দেখা দিবার কথা নয় !

—যাহা নয়, তাহাই হইতে চলিয়াছে।

—তবে কি···

কোন সন্দেহমাত্র নাই।

প্রতি মুহূর্তে আলোর সারি দীর্ঘতর, আলোর দীপ্তি উজ্জ্বলতর এবং ক্রমে আলোর সীমানা নিকটতর হইতে লাগিল। পূর্ব হইতে পশ্চিমে যতদূর দেখা যায়—আর, অসংখ্য আলোর আভায় কতদূর যে দেখা যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, সমস্ত আলোর ফুটকিতে ভরিয়া গিয়াছে। আকাশে তারা যেমন অগণ্য, সৈকতে বালু যেমন অসংখ্য, বনস্পতিতে পাতা যেমন অজস্র, তেমনি অগণ্য, অসংখ্য, অজস্র আলোকবিন্দু ! আততায়ী সর্পের মাথার মণির প্রভায় সন্ত্রস্ত হরিণ যেমন মুগ্ধ বিস্ময় অনুভব করে, নগরবাসীও তেমনি একপ্রকার ভাব অনুভব করিল। মৃত্যু যদি মোহন মূর্তিতে আসে, তবে তাহার ভয়াবহতা অনেকটা হ্রাস পায়। রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যে বসন্তকালে সমস্ত প্রান্তর যেমন ছোট ছোট ফুলে ভরিয়া যায়, তেমনি মহেন্-জো-দড়োর উত্তরদিক্ আলোয় আলোয় ভরিয়া গেল। আর বসন্তের অরণ্যে বাতাস বহিলে যেমন একপ্রকার মিশ্রিত গুঞ্জন শ্রুত হয়, তেমনি একপ্রকার চাপা শব্দ উঠিতে লাগিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নগরবাসী সেই ভীষণ শোভার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া সে রাত্রিটা ছাদে ছাদে কাটাইয়া দিল ; আর স্থিরকর্তব্য সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব বাঁধ হইতে অবতরণ করিল না, তাহাদের মন আজ লঘু, তাহাদের লক্ষ্য আজ স্থির ; কেবল চরাচরব্যাপী নিস্তব্ধতার কালো ঘোড়াটাকে নদীর কলধ্বনির চাবুকের আঘাত বারংবার চঞ্চল করিয়া তুলিতে বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল ! উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম—সকলেই প্রভাতের অপেক্ষায় রহিল।

প্রভাত হইলে উদ্বিগ্ন নগরবাসী দেখিতে পাইল যে, দগ্ধমশালপরিকীর্ণ সেই বিশাল প্রান্তর অশ্ব ও অশ্বারোহীতে পূর্ণ। অশ্বারোহিগণের অনেকে নিদ্রিত, অনেকে সবেমাত্র জাগিয়া উঠিতেছে ; অশ্বসকল স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া, ঘাড় নীচু করিয়া ঘাস খুঁটিয়া খাইতে নিযুক্ত। আবার আততায়িগণ এতক্ষণ স্পষ্টভাবে

অট্টালিকারণ্যসদৃশ সেই সমৃদ্ধ নগর দেখিতে পাইল, তাহাদের উৎসাহের অবধি রহিল না।

বাঁধের উপর হইতে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব দেখিতে পাইল যে, নগরবাসীর একটি ক্ষুদ্র দল আততায়িশিবিরের দিকে চলিয়াছে, সঙ্গে কয়েকখানি দ্রব্যসম্ভার-পূর্ণ শকট। তাহারা বুঝিতে পারিল, রাজপুরুষগণ ভেট সহকারে নবোদ্ভাবিত কৌশল-প্রয়োগে নগর রক্ষা করিতে চলিয়াছে।

রাজপুরুষগণ আততায়ীদের দলপতিসমীপে উপস্থিত হইয়া খাদ্যসম্ভার ও সুবর্ণমুদ্রা-পূর্ণ পেটিকা অর্পণ করিল, এবং সবিনয়ে নিবেদন করিল যে, এবারে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের ফিরিয়া যাওয়া উচিত। দলপতি দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিয়া জানাইল যে, তাহারা 'আরিয়' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; তাহারা উপঢৌকন গ্রহণ করে, কিন্তু উৎকোচ লয় না।

পথাধ্যক্ষ বলিল—গতবারে তো লইয়াছিলে?

ক্রুদ্ধ দলপতি তাহার মুখে চাবুকের আঘাত করিয়া বলিল—চুপ কর বর্বর!

দলপতির আদেশে কয়েকজন লোক আসিয়া রাজপুরুষগণের বেশবাস কাড়িয়া লইয়া তাহাদের খুঁটির সহিত বাঁধিয়া ফেলিল। তারপরে দলপতির আদেশে সমস্ত প্রান্তর চঞ্চল হইয়া উঠিল, আততায়িগণ যে যাহার অশ্বে চড়িয়া প্রস্তুত হইল।

বাঁধের উপর হইতে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব দেখিল যে, অশ্বারোহিগণ নগরের দিকে ধাবিত হইয়াছে, সারির পরে সারি, তরঙ্গের পরে তরঙ্গ; প্রথম দলের পদাঘাতেই রাজপুরুষগণ পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, তারপরে ঝটিকা-চালিত সমুদ্র-তরঙ্গ যেমন তটে আঘাতের পরে আঘাত করিতে থাকে, তটভূমি রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া উঠিতে থাকে, তেমনি সমস্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। নগরবাসী যুদ্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, তাই স্ত্রীপুরুষ বালক বৃদ্ধ শতে শতে পলায়ন করিতে লাগিল; একদিকে অসহায় আর্তনাদ, অপরদিকে অশ্ব ও মানুষের বিজয়োল্লাস! নগর ও নগরবাসী প্রহত, আহত, নিহত, দলিত, মথিত, মর্দিত হইতে লাগিল।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—ভাই, আর সহ্য হয় না, চলিলাম।

পূর্ত-সচিব বুঝিল, মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া সেনাধ্যক্ষ মরিতে চলিল।

পূর্ত-সচিব বলিল—যাও, আমিও আসিতেছি। কিন্তু নগর অধিকৃত হইতে দিব না—ইহা নিশ্চয় জানিও।

সেনাধ্যক্ষ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সব বুঝিল, তাহারা পরস্পরের মন ভালো করিয়াই জানিত।

নিঃসঙ্গ পূর্ত-সচিব দেখিল, মুষ্টিমেয় অনুচর-পরিবৃত সেনাধ্যক্ষ শত্রুসৈন্যমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল, আর প্রবল আবর্তে তৃণখণ্ড ভাঙিয়া যেমন শত খণ্ড হইয়া কোথায় বিলীন হয়, সেনাধ্যক্ষ ও তাহার সৈন্য কয়জন মুহূর্তমধ্যে তেমনি কোথায় তলাইয়া গেল!

সেনাধ্যক্ষ তাহার ঋণ শোধ করিল, রাজপুরুষগণ আগেই করিয়াছিল, এবারে পূর্ত-সচিবের পালা। সে দেখিল যে, এখন বহু সহস্র অশ্বারোহী বাঁধের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। সে বুঝিল, সুযোগ আসিয়াছে। সে একবার নদীর দিকে তাকাইল—কাল রাত্রিতে বন্যার জল ও স্রোত দুই-ই বাড়িয়াছে!

তখন সেই বৃদ্ধ বাঁধের উপর নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল, বসিয়া পড়িয়া করজোড় করিয়া ঊর্ধ্বে চাহিয়া বলিল—হে মৎস্যদেব, এ নগর তোমার, তুমি ইহাকে রক্ষা করো! হে মৎস্যদেব, এ নগর তোমার আশ্রিত, শত্রুকবলগ্রাসের গ্লানি হইতে তুমি ইহাকে রক্ষা করো! হে মৎস্যদেব, আমি দুর্বল, আমার মনে বল দাও!

তারপরে সিন্ধুনদের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল—হে নদ, এতদিন তোমাকে বিষম শত্রু মনে করিতাম, আজ তুমি পরম মিত্র! হে নদ, এতদিন তোমার গ্রাস হইতে নগর-রক্ষায় প্রাণপণ করিয়াছি, আজ বুঝিতেছি, তোমার গ্রাসই নগর-রক্ষার একমাত্র উপায়। হে নদ, তুমি নগর গ্রাস করো, গ্রাস করিয়া শত্রুকবল হইতে রক্ষা করো! হে নদ, তুমি মৎস্যদেবের বাহন, এ নগর মৎস্যদেবের আশ্রিত, তুমি তাহাকে আপন আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রক্ষা করো!

তারপরে আর্তকণ্ঠ আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—বল দাও, দেবতা, বল দাও!

এই বলিয়া নীচে যেখানে কারিগরগণ বাঁধ মেরামত করিতেছিল, সেখানে সে নামিয়া গেল—চীৎকার করিয়া বলিল—লাগা, লাগা, সকলে হাত লাগা!

প্রভুর উৎসাহবাক্যে সকলে দ্বিগুণ বেগে প্রাচীর গাঁথিতে সুরু করিল, কিন্তু পূর্ত-সচিব বলিল—না, না, আজ উল্টো হাত লাগা!

—সে কি, প্রভু!

—ঐ তো রে। যখনকার যা নিয়ম! ভাঙ! ভাঙ! বাঁধ ভাঙিয়া ফেল!

সকলে ভাবিল, পূর্ত-সচিব উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্যথা করিতে পারিল না, যেহেতু তাহারা প্রভুর আদেশ পালনে অভ্যস্ত; বিশেষ দেখিতে পাইল যে, স্বয়ং প্রভু বাঁধ ভাঙিবার কাজে অগ্রণী হইয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

সকলে বাঁধ ভাঙিতে লাগিয়া গেল। গড়া কঠিন, ভাঙা সহজ। ভাঙন অপ্রত্যাশিত দ্রুত বাড়িয়া চলিল, বিশেষ সঙ্গে ছিল বন্যার প্রচণ্ড সহযোগিতা! দেখিতে দেখিতে দণ্ড দুই সময়ের মধ্যে বাঁধের একটা বিরাট অংশ ধ্বসিয়া পড়িয়া সেখানে জল ঢুকিল; জলের পথ মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়িতে লাগিল, এবং এক সময়ে একটা সুবৃহৎ তরঙ্গের প্রচণ্ড ধাক্কায় বাঁধের সমগ্র উত্তর অংশটা খসিয়া পড়িয়া মৎস্যদেবের তরঙ্গশীর্ষ জয়রথ নগরমধ্যে বিজয় কল্লোলে ঢুকিয়া পড়িল।

জলের প্রথম আঘাতেই সানুচর পূর্ত-সচিব কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল! এতক্ষণ পরে পূর্ত-সচিবও তাহার ঋণশোধ করিল।

সমস্ত নদীটা যেন নগরমধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

অশ্বারোহিগণ পার্শ্বে তাকাইয়া দেখিল—এ এক অপ্রত্যাশিত সঙ্কট! নদী তাড়া করিয়া পিছনে পিছনে আসিতেছে! জল অতলস্পর্শ। তখন পিছু হটিবার তাড়া পড়িয়া গেল। একদল অশ্বারোহী অপর দলকে মথিত করিতে লাগিল; সকল দলই ডুবিয়া মরিল। অশ্বারোহিগণ প্রান্তরবাসী, নদীকে তাহাদের বড় ভয় ছিল, অবশেষে সেই নদীই তাহাদের আক্রমণ করিল! সকলে ডুবিল! নগরবাসী ও অশ্বারোহী কেহই প্রাণে বাঁচিল না। কেবল যে-সব অশ্বারোহী জলের সীমানার বাহিরে ছিল, তখনো নগর-সমীপে আসিয়া পৌঁছায় নাই, তাহারাই বাঁচিল; তাহারা অশ্বের মুখ ফিরাইয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে দ্রুততর বেগে ছুটিয়া পলাইল।

প্রাতঃকালে যেখানে ধনজনসমৃদ্ধ মহানগর ছিল, সন্ধ্যাকালে সেখানে দেখা গেল—দুস্তর জলমরুর অমেয় বিস্তার!

পূর্ত-সচিব সত্যই তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছে, নগর শত্রুগণ কর্তৃক অধিকৃত হইতে সে দেয় নাই।

চরাচরব্যাপী সেই তরল অন্ধকারের ভূমিকার উপরে নিত্যকার মতো সেদিনও নিঃশব্দে সন্ধ্যাতারা উঠিল! *

* এই গল্প-রচনায় ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ তথ্যের কাছাকাছি থাকিতে চেষ্টা করিয়াছি মহেন্-জো-দড়োর ধ্বংসের দুটি কারণ অনুমান করা হয়, সিন্ধুর বন্যা ও আর্যজাতির আক্রমণ ইতিহাসের সহিত যেটুকু কল্পনা মিশাইলে গল্প হয়, তাহার বেশী কল্পনা না মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

ছিন্ন দলিল

জেনারেল হ্যাভেলকের সৈন্যদল কানপুর পুনরধিকার করিয়াছে। কানপুরের ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ শেরার আবার কানপুরের ভার লইয়াছে। সে কয়েকজন গোরা সৈন্য সঙ্গে লইয়া কানপুর শহর পরিদর্শন করিতেছে। সে যখন চকে পৌঁছিল, দেখিল যে, কোথা হইতে এক ঢুলী আবির্ভূত হইয়া সশব্দে ঢোল বাজাইয়া দিয়া হাঁকিল—

খাল্‌ক-ই-খুদা
মুল্‌ক-ই-কম্পানী বহাদুর
হুকম্‌-ই-সাহেবান আলিশান

অর্থাৎ কিনা কোম্পানীর রাজত্ব আবার প্রতিষ্ঠিত হইল, এখন হইতে বড় সাহেবের হুকুম মানিতে হইবে।

ঢুলীর অযাচিত সহযোগিতা দেখিয়া মিঃ শেরার ভাবিল যে, লোকটা হয়তো ঠিক এমনিভাবেই নানার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিয়াছিল। তাহার মনে হইল, জল্লাদের মতো নকিবও নিরপেক্ষ, যে-পক্ষের জয় নির্বিকারচিত্তে তাহার আদেশ পালন করিয়া থাকে।

মিঃ শেরার কোটওয়ালীর কাছে গিয়া ঘোড়া হইতে নামিল। কোট-ওয়ালীর উত্তরদিকে একটি বড় বাড়ী, লোক আছে মনে হয় না, বাড়ীটি সরকারী কাজের জন্য অধিকার করা যায় কিনা দেখিবার জন্য সে যেমন উহার সম্মুখে গিয়াছে অমনি এক কাণ্ড ঘটিল। মুহূর্ত মধ্যে বাড়ীর ভিতর হইতে পাঁচ সাত, দশজন লোক ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল—

ইওর অনার সেভ আস্‌
হামলোগ লয়াল হ্যায়
শালা লোগ হাম্‌লোগকো একদম মার ডালা
ওয়ান মান্থ ইন দিস হাউস নো ফুড, নো স্লিপ,

প্রেয়িং ফর ইওর রিটার্ণ
এণ্ড দেয়ার ডিফিট
সেভ আস্
ভেরি লয়াল

লোকগুলির ভাব, ভাষা, চেহারা ও অবস্থা দর্শনে শেরার হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না, অবশেষে মনে মনে হাসিয়া মুখে গম্ভীর ভাব আনিয়া শুধাইল তোমরা কে ?

উই বেঙ্গলিস্
ভেরি লয়াল
কোম্পানীকা নোকর

আবার একসঙ্গে দুঃখের কোরাস আরম্ভ হয় দেখিয়া দলের একজন প্রবীণকে বাছিয়া লইয়া সে শুধায়—তুম কোন্ হ্যায় ?

লোকটি বলে, ইওর অনার হাম বক্তিনাথ মুখার্জি কোম্পানীকা নোকর ফর থ্রী জেনারেশনস্, মাই গ্র্যাণ্ডফাদার কোম্পানীকা নোকর,

শেরার বিরক্ত হইয়া ওঠে, বলে, হ্যাং ইওর গ্র্যাণ্ডফাদার।

মুখুজ্জে বলে, হি ইজ লং ডেড স্যার।

দেন হ্যাং ইওর ফাদার।

হি অল্সো ডেড স্যার।

দেন গো হ্যাং ইওরসেলফ্।

কোম্পানীর বিচার বিভ্রাটে সন্ত্রস্ত মুখুজ্জে সাহেবের পায়ের বুট জুতার উপরে পড়িয়া বলে, হাম্ তো ইওর বুটশিপকা লয়াল সার্ভেণ্ট হ্যায়।

দেন টেল মি হোয়াট ইউ আর এণ্ড হোয়াট ইউ ওয়াণ্ট।

কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া মুখুজ্জে নিজেদের অবস্থা ও প্রার্থনা বিবৃত করে, তাহার সঙ্গীরা নীরব সমর্থনে মুখুজ্জের বাগ্মিতা ও সাহেবের মুখভাব লক্ষ্য করিতে থাকে।

বক্তিনাথ মুখুজ্জে যাহা বলিল, তাহা হইতে স্বেদকম্পপুলক অশ্রু ও মূর্চ্ছা বাদ দিলে এবং হিন্দী, উর্দু, বাংলা ও ইংরাজীর বিচিত্র মিশ্রণ ছাঁকিয়া লইলে এইরূপ দাঁড়ায়।

এই কয়জন রাজভক্ত বঙ্গসন্তান বহুদিনের প্রবাসী। সকলেই কোম্পানীর

চাকুরে। সিপাহী বিদ্রোহ ঘটিবার আগে তাহারা আগ্রা, মীরাট, সীতাপুর প্রভৃতি স্থানে চাকুরী করিত। খোদ বিষ্ণনাথ কানপুরের কাছে সরকারের তহশীলদারী করিত। এমন সময়ে শ্যালক সিপাহীলোকেরা ক্ষেপিয়া ওঠে। এইসব বাঙালী রাজভক্ত, কাজেই অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে বাধ্য হয় এবং দুঃখকষ্ট অতিক্রম করিয়া কানপুর শহরে আসিয়া আশ্রয় লয়। সিপাহিগণ তাহাদের মারিয়াই ফেলিত, কিন্তু নিতান্তই হোলি থে্ড ও হোলি টাফট্ অব্ হেয়ারের বলে প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছে। তাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছে সত্য, কিন্তু সিপাহী পক্ষে সক্রিয়ভাবে যোগদান না করিবার অপরাধে তাহারা খাদ্য পায় নাই। সিপাহী শাসনে অনুমতি ছাড়া খাদ্যসংগ্রহের উপায় না থাকায় এই ক'টি রাজভক্ত বঙ্গসন্তানকে লংড্রন ফাষ্টিং বা একটানা একাদশী করিতে হইয়াছে। তাহাও না হয় সহ্য হয়, কারণ প্রয়োজন হইলে ব্রাহ্মণেরা যেমন খাইতেও পারে, তেমনি উপবাস করিতেও অভ্যস্ত। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা, ইহাদের যা কিছু সঞ্চিত ছিল, যুদ্ধের ঋণ বলিয়া সিপাহীরা ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা কোনমতে এখানে আত্মগোপন করিয়া কোম্পানী বাহাদুরের পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোম্পানী বাহাদুরের শুভাগমন হইয়াছে, এখন তাহাদের উপরে যাহাতে জুলুম না হয় 'ইওর অনারকে' দয়া করিয়া তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিষ্ণনাথ থামিলে অন্যান্য রাজভক্ত বঙ্গসন্তানগণ সমস্বরে বলিল—হি ইজ ট্রুথফুল স্যার—অর্থাৎ তাহার সবকথা বর্ণে বর্ণে সত্য।

শেরার বুঝিল খুব সম্ভব ইহাদের বিবরণ সত্য। প্রথম প্রমাণ ইহাদের ভাবগতিক ও অবস্থা। দ্বিতীয় প্রমাণ, কলিকাতা হইতে আগত ইংরাজ সৈনিকদের কাছে সে শুনিয়াছিল যে, তথাকার শিক্ষিত বাঙালীগণ সিপাহীদের আচরণ সমর্থন করে না, তাহাদের অনেকে নাকি সিপাহীদের কার্যের নিন্দা করিয়া বহুতর গদ্য পদ্য রচনা লিখিয়া ফেলিয়াছে। শেরার ভাবিল মাতৃভূমি হইতে ছিন্ন হইলেও ইহারা সেই বৃক্ষেরই তো শাখা, কাজেই লয়াল হওয়াই স্বাভাবিক। তবু একবার দস্তুরের খাতিরে বলিল, তোমরা যে রাজভক্ত তাহার আর কি প্রমাণ আছে!

আর কি প্রমাণ হইতে পারে? ঘোষাল বলিল, টেন ডেজ ফাষ্টিং নট প্রুফ এনাফ?

বাড়ুজ্জে বলিল—গড অলমাইটি নোজ।

গড অলমাইটি এবং টেন ডেজ ফাষ্টিং-এর উপরে সাহেবের খুব বেশি আস্থা না থাকায় তাহার মুখে করুণার সঞ্চার হইল না, তখন মুখুজ্জে বলিয়া উঠিল—ষ্ট্যাণ্ড স্যার, ষ্ট্যাণ্ড—অর্থাৎ আপনি একটু দাঁড়ান, এই বলিয়া সে বেগে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একখানি কাগজ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া সেখানা সাহেবের হাতে দিল—সী ইওর অনার প্রুফ অব্ আওয়ার লয়ালটি।

কৌতূহলী সাহেব পড়িতে লাগিল। মুখুজ্জের সঙ্গিগণ কেহই মুখুজ্জের আচরণে কৌতূহল প্রকাশ করিল না, কারণ কাগজখানার সহিত তাহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, সিপাহী বিদ্রোহের দুস্তর সাগরে এই উড়ুপখানা অবলম্বন করিয়াই তাহারা সুদিনের ভরসায় ছিল। কৌতূহল অনুভব না করিলেও বঙ্কিনাথের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তাহারা অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহাদের মনে পড়িল বঙ্কিনাথের আশ্বাস, বঙ্কিনাথ থাকিতে কোম্পানীর হাতে তোমাদের ভয় নাই। এবারে তাহার পরীক্ষার ক্ষণ সমুপস্থিত।

দরখাস্তখানার প্রথম দুটি ছত্র পড়িয়াই শেরার স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, ইহাদের রাজভক্তি সম্বন্ধে তিলমাত্র সংশয় আর তাহার মনে ছিল না। শেরার মনে মনে পড়িল—It is well known, your excellency's lordship that we, the Bengalees, are a cowardly people *

তবু সে একাধিকবার দলিলখানা পড়িল এবং দরখাস্তকারীদের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় পাইবার মানসে প্রশ্ন আরম্ভ করিল—তোমরা শিখযুদ্ধে গিয়েছিলে?

মুখুজ্জে উত্তর দিতে থাকিল—এরা সবাই নয়, আমি আর বাঁড়ুজ্জে মশাই গিয়েছিলাম।

যুদ্ধেই যদি গিয়েছিলে তবে হঠাৎ ভয় পেলে কেন?

---

* দোহাই পাঠক এ উক্তি আমার কল্পনা নয়, লেখকের কল্পনার পিতারও সাধ্য নাই এমন উক্তির সৃষ্টি করে। এই উক্তিটি History of Indian Mutiny, Volume I (By Charles Ball) নামক গ্রন্থে ৬১২ পৃষ্ঠায় পাইয়াছি। বিশ্বাস না হইলে, বিশ্বাস না হওয়াই স্বাভাবিক কারণ এপর্যন্ত পৃথিবীর কোন জাতি নিজেদের সম্বন্ধে এমন সরল সত্য লিপিবদ্ধ করিতে সাহস পায় নাই। আপনি উক্তিটি যথাস্থানে পাইবেন।

হুজুর, যুদ্ধে যাচ্ছি বলেই সত্য সত্যই যে লড়াই করতে হবে এমন কথা বাপের কোন্ সুপুত্র ভেবেছিল ?

তোমরা কি ফৌজী ছিলে না ?

রাম ! রাম ! ওসব তো পূরবিয়ারা করবে। আমরা ছিলাম কমিসারিয়েটে। আমরা বাঙালীরা ঐ কাজটা ভালো পারি। * হুজুর আমার গ্র্যাণ্ডফাদার তেসরা মারাঠা যুদ্ধে ঐ কাজ করেছেন, আমার ফাদার বরাবর ঐ কাজে ছিলেন, বংশধারার দাবীতে আমিও ঐ বিভাগে কাজ পেয়েছিলাম।

তোমার এতো পৈত্রিক পেশা, হঠাৎ ভয় পেলে কেন ?

পৈত্রিক পেশা সত্য, হুজুর আমার ছেলেটিও লায়েক হয়ে উঠেছে, কিন্তু কাউকে কখনো হুকুম দেওয়া হয়নি যে, কামানের পাল্লায় এগিয়ে যেতে হবে।

যুদ্ধের সময়ে কখনো কখনো তেমন প্রয়োজন হ'য়ে থাকে।

প্রয়োজন হয় বলেই কি আমাদের স্বভাব বদলাবে ? হুজুর আমরা বাঙালীরা হচ্ছি Children taming people অর্থাৎ ছাঁ-পোষা মানুষ।

কামানের পাল্লায় যাবার হুকুম শুনে কি করলে ?

আর কি করবো ? আমরা বাঙালীরা যা পারি তাই করলাম, জঙ্গীলাট লর্ড হার্ডিঙের বরাবর এই দরখাস্তখানা লিখে তাঁর সেক্রেটারীর হাতে দিলাম।

তিনি কি করলেন ?

তখনি দরখাস্ত মঞ্জুর ক'রে বললেন, বাস্তবিক তোমরা মারা পড়লে কমিসারিয়েটের কাজ চালাবে কে ?

তারপরে ?

তারপরে আর কি শিখ লড়াই ফতে ক'রে কোম্পানীর ফৌজ সাট্‌লেজ পার হ'ল আমরা পিছু পিছু চল্‌লাম।

দরখাস্তখানা তো থাকলো মিলিটারী দপ্তরে, তার নকল নিলে কেন ?

পাছে কখনো কাজে লেগে যায় এই আশায়। সত্যিই তো আজ কাজে

* পাঠক ইহাও আমার অনুমান নয়। বাংলা উপন্যাসের অনেক নায়কই কমিসারিয়েটে কাজ করিয়া প্রভূত ধনোপার্জন করিয়াছে। আপাততঃ ইন্দিরা উপন্যাসের ইন্দিরার স্বামী এবং গোরা উপন্যাসের কৃষ্ণদয়াল বাবুর কথা মনে পড়িতেছে। খুঁজিলে আরো অনেক বাবুর সন্ধান পাওয়া যাইবে।

লেগে গেল হুজুর! এখানা দেখে তবে তো হুজুরের বিশ্বাস হ'ল যে, আমরা রাজভক্ত।

তোমরা অবশ্য তখন রাজভক্ত ছিলে, কিন্তু এখনো যে আছ তার প্রমাণ?

এবারে মুখুজ্জে যে কয়টি কথা বলিল, তাহা স্বর্ণাক্ষরে বাঁধাইয়া রাখিবার মতো। সে বলিল—হুজুর ভীরু লোকে কখনো বিদ্রোহী হয় না, কারণ ভীরুতা হচ্ছে রাজভক্তির বীজ।

শেরার বুঝিল তাহার এখনো অনেক দেখিবার, অনেক শুনিবার এবং অনেক শিখিবার বাকি আছে। সে বলিল—আচ্ছা তোমরা নিশ্চিন্তে থাকো গিয়ে, কেউ তোমাদের উপরে অত্যাচার করবে না।

মুখুজ্জে বলিল—নো মাউথ ওয়ার্ড স্যার অর্থাৎ শুধু মুখের কথায় হবে না, অমনি এক ছত্র লিখে দিতে হবে।

এখন কাগজ-কলম পাই কোথায়?

এই আনছি বলিয়া মুখুজ্জে মুহূর্ত মধ্যে কাগজ কালি কলম সংগ্রহ করিয়া বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া ফেলিল—

—"This house belongs to one Mokarjea, very loyal subject, please not to molest."*

তারপরে শেরারের হাতের কাছে কাগজ ও কলম ধরিয়া বিনীত হাস্যে বলিল—স্যার একটা সই।

সাহেব স্বাক্ষর করিয়া দিতেই মুখুজ্জে সেখানা ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া বাড়ীর দরজার কাছে সযত্নে সাঁটিয়া দিল—আর সব কটি বঙ্গসন্তান সাহেবকে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া ধন্যবাদ জানাইল।

শেরার অন্যত্র রওনা হইল আর মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আশ্চর্য এই বাঙালী জাতটা! জাদুকরের মতো কোথা হইতে কাগজ-কলম বাহির করিল। আর সাহেবের স্বাক্ষরের উপরে ইহাদের কি অসীম বিশ্বাস! হইবেই বা না কেন, ঐ দেশেই তো কোম্পানীর রাজ্যের প্রথম বনিয়াদ! দীর্ঘকালের শাসনে ইহাদের মজ্জা অবধি বেশ নরম হইয়া আসিয়াছে, তুলনায় এই পূরবিয়া গোঁয়ারগুলো কি বর্বর। শেরার মনে মনে স্থির করিল বিদ্রোহের হাঙ্গামা চুকিয়া

* এটিও বাস্তব সত্য, কল্পনা নয়। দ্রষ্টব্য: Havelock's March on Cawnpore by J. W. Sherar.

গেলেই উপরে ধরাও করিয়া কলিকাতায় বদলি হইতে হইবে—বাঙালীর কাছে শিখিবার অনেক কিছু আছে।

ওদিকে সাহেব নিরাপদজনক দূরে চলিয়া যাইতেই মুখুজ্জে অপস্রিয়মান সাহেবের প্রতি দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া সমবয়সী বাঁড়ুজ্জেকে বলিল, দেখ্‌লে ভায়া কেমন পলিটিক্স করলাম।

একজন বলিল—অত নীচু না হলেই পারতেন।

মুখুজ্জে বলিল—আরে নীচু না হলে জুতো চুরি করা যায়। তাছাড়া নীচুটাই বা কি হলাম। দরখাস্তখানা তো মিথ্যা নয়। তার উপরে দুটো মিষ্টি কথা বলেছি এই তো! তা রাজার জাতকে অমন বলতে হয়।

দেখা গেল যে, মুখুজ্জের সঙ্গে কাহারো মতের বিশেষ তারতম্য নাই।

অতঃপর বলিল—চলো আজ ভালো করে খাওয়া-দাওয়া যাক। এ ক'দিন নাকে ভাত দিয়েছি না মুখে ভাত দিয়েছি ঠিক ছিল না। আজ নিশ্চিন্তি! বাবা—এ স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটের সই। গোরা কালা সবাই বাড়ীর কাছে থেকে হেটমুণ্ডে ফিরে যাবে! নাও চলো, আর কোন ভয় নেই।

তখন সকলে মুখুজ্জের অনুসরণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

২

বদ্যিনাথ মুখুজ্জের আশঙ্কা মিথ্যা নয়, এ সব বিষয়ে রাজভক্ত প্রজার অনুমান বড় মিথ্যা হয় না। কানপুর শহর পুনরায় দখল করিবার পরে কোম্পানীর ফৌজ অত্যাচার আরম্ভ করিল। বিচার করিয়া করিলে যাহা ন্যায়ধর্মরক্ষা, নির্বিচারে করিলে তাহাই অত্যাচার। বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের অপরাধে ইংরাজ যাহাকে পারিল ফাঁসি দিল, সামান্যতম সন্দেহের ছায়াগ্রস্ত ব্যক্তিও মুক্তি পাইল না। অত্যাচারের আশঙ্কায় লোকের মনে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল, আত্মরক্ষার আশায় অনেকেই নির্দোষ প্রতিবেশীকে ধরাইয়া দিল; প্রতিবেশী মরিল, নিজেও রক্ষা পাইল না। একতরফা দণ্ডের আঘাতে সমগ্র কানপুর শহর মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ফল কথা সিপাহীরা যে কাণ্ড করিয়াছিল কোম্পানীও তাহার পুনরভিনয় করিল, তবে সেবারে ইংরাজ মরিয়াছিল, এবারে ভারতীয় মরিল তফাৎ এইটুকু মাত্র। জেনারেল নীলের শাসনে কানপুরের নাগরিকদেহ ভয়ে নীল হইয়া গেল। অবশ্য মুখুজ্জের

আবাসের উপরে কেহ হানা দিল না, তবে সেটা কোটওয়ালীর কাছে বলিয়াই হোক বা ম্যাজিষ্ট্রেট শেরারের অনুশাসন বলিয়াই হোক বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণেই হোক। তবু মুখুজ্জের সতর্কতার অন্ত ছিল না। সে নিজে কখনো বাড়ী হইতে বাহির হইত না কিংবা অপর কাহাকেও বড় বাহির হইতে দিত না। তবু এক-আধবার বাহির না হইলে চলে না, বাজার করিতে হয়। সন্ত্রস্ত ইঁদুর গৃহস্বামীর অনবধানতা লক্ষ্য করিয়া যেমন চট করিয়া বাহির হইয়াই আবার গর্তে প্রবেশ করে তেমনি কেহ একজন কোন এক ফাঁকে গিয়া বাজার করিয়া আনিত। কিন্তু ঘরের মধ্যে গোপনে থাকিয়াও শহরের বিভীষিকার প্রভাব হইতে মুখুজ্জে ও তাহার সঙ্গিগণের রক্ষা ছিল না। শ্মশানযাত্রীর উৎকট চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গৃহস্থ যেমন জাগিয়া উঠিয়া ভীত বোধ করে, আসামীরা তেমনি অন্তিম আর্তমিনতিতে মুখুজ্জেদের মুহুর্মুহু চকিত করিয়া দিত।

দোহাই কালেক্‌টার সাহেব আমার কোন কসুর নাই।

দোহাই কোম্পানী বাহাদুর আমি নির্দোষ।

গোড়লাগে কাপ্তান সাহেব তুমি আমার বাপ।

আসামীদের কোটওয়ালীতে টানিয়া আনা হইতেছে।

মুখুজ্জে জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া সদর রাস্তায় আসামীর ভূপতিত দেহটি একবার দেখিয়াই স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিত আর কাঁপিতে কাঁপিতে উপবীত অবলম্বন করিয়া গায়ত্রীমন্ত্র জপিতে থাকিত। কিন্তু মন লাগিত না, তাহার দৃষ্টি শিখযুদ্ধের দরখাস্তখানার উপরে পড়িত, মুখুজ্জে কিঞ্চিৎ ভরসা পাইত। দরখাস্তখানা ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখা হইয়াছিল যাহাতে গোরা লোক ঘরে ঢুকিবামাত্র দেখিতে পায়। মুখুজ্জে অনেক ঠেকিয়া বুঝিয়াছিল যে, সময়বিশেষে ভগবানের চেয়ে শেরার সাহেব প্রবলতর।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সপারিষদ মুখুজ্জে বার দিয়া বসিয়াছিল। মাঝখানে মুখুজ্জে আর চারদিকে বাঁড়ুজ্জে, ঘোষাল, ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি রাজভক্ত বঙ্গ-সন্তানগণ। একটা পাটের দড়িকে অতিরিক্ত কয়েকটা পাক দিয়া সূক্ষ্মতর করিয়া একপ্রান্তে একটি গিরো বাঁধিয়া দিলে যেমন দেখিতে হয়, মুখুজ্জের দেহটি ঠিক তেমনি; সমস্ত দেহটা শুকাইয়া পাক খাইয়া রসকষহীন একটি রজ্জুতে পরিণত হইয়াছে, ঐ গিরোটি তাহার মস্তক, ঠাহর করিয়া দেখিলে মুখমণ্ডলে

নাক চোখ মুখের কয়েকটি গর্ত দৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়। মুখুজ্জের জীবনে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট পরীক্ষা প্রবঞ্চনার ইতিহাস সম্যক জানিলে হয়তো তাহার প্রতি ধিক্কারের ভাব মনে উদিত না হইয়া সহানুভূতির ভাবটাই জাগ্রত হইবে, কিন্তু তেমন অবসর কোথায়? মানুষকে দোষ মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কেহ বিচার করিতে বসে না, তাহাকে দণ্ড দেওয়া যখন স্থির হইয়া গিয়াছে তখনি বিচারের প্রহসন আরম্ভ হয়। মুখুজ্জে ঠকিতে ঠকিতে শিখিয়াছে যে, ঠকানোটাই জীবনের উদ্দেশ্য, দুঃখ পাইতে পাইতে শিখিয়াছে যে, দুঃখটাই জীবনের ধর্ম, ভয় পাইতে পাইতে শিখিয়াছে যে, ভীত বোধ না করিলে কার্যোদ্ধার হয় না; আর রাজভক্তি! বাল্যকালে পিতামাতার প্রতি ভক্তি, পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের প্রতি ভক্তি, তারপরে জমিদার, মহাজন ও গুরু-পুরুতের প্রতি ভক্তি—এ সমস্তই তো রাজভক্তির ভূমিকা; রাজভক্তি সমস্ত ভক্তির ঘনীভূত চরম মূর্তি। মুখুজ্জেকে আমি বিচার করিতেছি না, অঙ্কন করিতেছি মাত্র।

যেদিনের কথা বলিতেছি সেদিন সন্ধ্যায় মুখুজ্জে বাড়ীর সদর দরজায় ঘা পড়িল এবং সেই শব্দে বঙ্গসন্তানকয়টির চিত্ত উদ্বেগে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, অসময়ে দরজায় ঘা দেয় কে? বাড়ুজ্জে আফিংয়ের ঘোরে ঝিমাইতেছিল, চটকা ভাঙিয়া বলিয়া উঠিল দরজা এঁটে দাও, বলিয়াই আবার নেশার স্রোতে ডুব দিল।

গুম্ গুম্ গুম্!

গুম্ গুম্ গুম্!

মুখুজ্জে রাজভক্ত হইলেও নির্বোধ নয়। তাহার আশঙ্কা হইল যদি সরকারী লোক হয় তবে তাহাকে উপেক্ষা করা কিছু নয়, আর উপেক্ষা করিলেও তাহাকে এড়ানো যাইবে না, দরজা ভাঙিয়া ঢুকিবে। তাই মুখুজ্জে একজনকে বলিল—দেখে এসো কে।

কিছুক্ষণ পরে এক ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া একজন ফিরিয়া আসিল, বলিল—ইনিই দরজায় ঘা দিচ্ছিলেন।

সকলে দেখিল একজন বাঙালী যুবক, বয়স পঁচিশের বেশি হইবে না, ছিন্ন মলিন বেশ, উদ্বাস্ত চেহারা।

মুখুজ্জে শুধাইল তুমি কে বট?

যুবক বলিল—মহাশয়, আমি একজন বাঙালী যুবক।

সেতো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কোত্থেকে আসছ, কি সমাচার, কি পরিচয় জানা আবশ্যক।

মশায় আমার নিবাস কাশীধামে। আমি কাজের সন্ধানে এলাহাবাদে আসি, সেখানে কোন কাজের সন্ধান না পাওয়ায় কানপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হই। পথে সিপাহীদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত হয়ে কোন মতে এখানে এসে পৌঁছেছি।

এ বাড়ীর সন্ধান পেলে কি ভাবে?

শহরের একজনের কাছে শুনলাম এ বাড়ীতে কয়েকজন বাঙালী আছেন।

তোমার নাম কি বাপু?

আজ্ঞে তারকচন্দ্র রায়।

তোমরা?

আজ্ঞে ব্রাহ্মণ।

এ পরিচয় যথেষ্ট নয়।

আর কি পরিচয় দেবো বলুন।

তুমি যে সিপাহীদের গুপ্তচর নও তার কি প্রমাণ?

তাদের দ্বারাই যে আমি সর্বস্বান্ত।

তোমার কথা ছাড়া তার তো কোন প্রমাণ নেই!

আজ্ঞে আমার কথা বিশ্বাস করুন।

এই সময়ে বাঁড়ুজ্জে হঠাৎ আবার চটকা ভাঙিয়া বলিয়া উঠিল—"অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাসোদেয় ন কস্যচিৎ"—তারপরে সে আবার পূর্ববৎ নীরব হইল।

সকলের মৌনভাবে বোঝা গেল যে বিপদের সময় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে না।

তাহাদের ভাবগতিক দর্শনে উদ্বিগ্ন যুবকটি বলিল, আজ্ঞে বাঙালী হয়ে বাঙালীকে রক্ষা না করলে কে আর রক্ষা করবে?

ঘোষ বলিল, ওসব অনেক শুনেছি, এখন কেটে পড়ো।

যুবকটি ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া মুখুজ্জে বলিল—আচ্ছা, তুমি বসো।

সঙ্গীদের দিকে তাকাইয়া বলিল—এতরাত্রে আর কোথায় যাবে?

যুবকটি থাকিয়া গেল।

সেদিন শেষরাত্রে আর্ত বামাকণ্ঠস্বরে হঠাৎ সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই এরূপ আর্তস্বরে অভ্যস্ত, তবে নারী কণ্ঠস্বরটা নূতন বটে। অনুরূপ অবস্থায় কি কর্তব্য সকলেরই পরিজ্ঞাত, সকলে উঠিয়া দরজা জানালার অর্গল পরীক্ষা করিয়া স্থির হইয়া বসিল।

কেবল সেই বাঙালী যুবকটি বলিল—আপনারা চুপ ক'রে বসলেন যে! একবার সন্ধান নেওয়া আবশ্যক ব্যাপারটা কি?

কিন্তু সকলের মুখের ভাব দর্শনে তাহার মনে হইল, এমন অদ্ভুত কথা যেন তাহারা ইতিপূর্বে শোনে নাই।

একজন বলিল—তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি?

অপরে বলিল—চুপ করে বসে থাকো তো।

তারক বলিল—আমি বরঞ্চ একবার খোঁজ নিয়ে আসি।

বাঁড়ুজ্জের নেশা তখনো সম্পূর্ণ কাটে নাই, শ্লেষ্মাবিজড়িতকণ্ঠে বলিল—অব্যাপারেষুব্যাপারঃ যো নর কর্তুমিচ্ছতি, স ভূমৌ······বাকিটুকু আর শ্রুতিগোচর হইল না।

তাহারা কিছুই করিবে না বুঝিতে পারিয়া আর্তবামাকণ্ঠের রহস্যোদ্ঘাটন উদ্দেশ্যে তারক জানালার দিকে অগ্রসর হইতেই সকলে তাহার উপর গিয়া পড়িয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল।

কে একজন বলিল, সিপাহীর গুপ্তচর না হয়ে যায় না!

মুখুজ্জে বলিল—বাবা, তোমাকে আশ্রয় দিয়ে কি অপরাধ করেছি? তবে? তবে এমন ক'রে ছাঁ-পোষা মানুষগুলোকে মেরে কি লাভ?

আপনাদের দেখছি প্রাণের ভয় বড্ড বেশি।

এত দুঃখের মধ্যেও তাহার কথায় সকলের হাসি পাইল; মুখুজ্জে বলিল—ভয়টা তবে কিসের জন্য হবে?

কে কার উপর অত্যাচার করছে দেখতে হবে না?

চারিদিকে অত্যাচারের বন্যা বইছে। কে কার উপরে নয়। যে যার উপরে পারছে করছে। নিবারণ করতে গেলে তার কোন লাভ হবে না, মাঝে থেকে তুমি প্রাণে মারা পড়বে।

কিন্তু এমন অসহায়ভাবে থাকাও যে কঠিন।

সে কি আমরা জানিনে। দয়ামায়া আমাদেরও আছে। তবে কি জানো

দুর্বলের দয়া করবার অধিকার নেই। অন্যায় সহ্য করতে হয় বলেই তো দুর্বল দুর্বল।

মুখুজ্জের সারগর্ভ উপদেশে তারকের যে চৈতন্যোদয় হইল মনে হয় না, কিন্তু সে এক্ষণে নিতান্তই অশক্ত, কেননা ইতিমধ্যে কয়েকজনে মিলিয়া তাহাকে একখানা বিছানার চাদর দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। সে অসহায়ভাবে পড়িয়া পড়িয়া গজরাইতে লাগিল।

আর্তস্বর থামিয়া গিয়াছে। তখনো রাত্রি ছিল। সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল মুখুজ্জে চোখ বুজিয়া আপন মনে ভাবিতেছিল আজকালকার ছেলেরা ক্রমেই বেয়াড়া হইয়া উঠিতেছে, না মানে গুরুজনের উপদেশ, না জানে আত্মরক্ষার উপায়। তারপরে এই ভাবিয়া মনে সান্ত্বনা পাইল যে একটু বয়স ভারি দিলেই ছোকরার বীরত্বের অভিনয় চুকিয়া যাইবে, তখন সত্যই সে জীবনের রস পাইবে যেমন নিজেরা আজ পাইতেছে। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল সে নিজে একদিন পরমারাধ্য পিতৃদেবের আদেশ অমান্য করিয়া একটা বুনো মহিষকে তাড়া করিয়াছিল আর একটু হইলেই মারা পড়িত আর কি! বহুদিন পূর্বেকার অবিমৃষ্যকারিতায় নিজের প্রতি সে ধিক্কারের ভাব অনুভব করিল—আর সেইসূত্রে মনস্তত্বের কোন্ নিয়মে না জানি যুবকটির প্রতি তাহার মনে এক প্রকার সস্নেহ অনুকম্পার ভাব উদিত হইল। মুখুজ্জে উঠিয়া গিয়া তাহার বাঁধন খুলিয়া দিল।

পরদিন সকালে যুবকটিকে চোখে চোখে রাখিল, তাড়াইতেও সাহস হয় না, আবার আশ্রয় দিতেও কুণ্ঠা।

দেয়ালে বিলম্বিত সেই দরখাস্তখানা দেখিয়া তারক শুধাইল, ওটা কি?

কাল রাত্রে কাগজখানা সে দেখিতে পায় নাই।

মুখুজ্জে বলিল—পড়ে দেখো, ঐ কাগজখানার জোরেই এখনো টিঁকে আছি।

কাগজখানা পড়িয়া যুবক ক্রোধে বলিয়া উঠিল—এমন কথা আপনারা লিখতে পারলেন?

মুখুজ্জে বলিল—কেন বাপু, মিথ্যে কি লিখেছি?

মিথ্যে নয়?

তুমিই ভেবে দেখোনা কেন, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে হলে বাঙালীর গুরু-পুরুত শালগ্রামশিলা দর্শন চাই, মন্ত্রপাঠ চাই, নির্মাল্য ধারণ চাই!

চাই কি না বল? ঐ গুলোকেই গুছিয়ে এক কথায় যদি ভীরুতা বলা হয় তবে দোষ কিসের?

অপরে বলে বলুক, তাই বলে নিজ মুখে স্বীকার?

আমাদের বাপু মনে মুখে আড় নেই। তাছাড়া কামানের মুখ একবার ছাড়া দু'বার কথা বলে না।

তেলেঙ্গি লড়ছে, পূরবিয়া লড়ছে, শিখ লড়ছে, মুসলমান লড়ছে, আর আপনাদেরই যত ভয়।

আরে বাপু আমরা যে বাঙালী! তেলে-জলে আমরা মানুষ। মাছের ঝোল ভাত আমাদের প্রাণ, মা-মাসির কোলে আমাদের স্থান। ওসব চোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের তুলনা করো কেন?

জগতে আর কারো মাসি পিসি নেই—আর মাছ ভাতও কেউ খায় না! আমরাই কি সব চেয়ে অকর্মণ্য!

অকর্মণ্য এমন বলি না। কাজ আমরাও জানি। হিসাব রাখতে দাও, খাতা লিখতে দাও, সাহেবের মুন্সীগিরি করতে দাও! করুক তো দেখি এসব কাজ ওরা! জিভ বেড়িয়ে পড়বে।

বলিয়া কিভাবে কত খানি জিহ্বা বহির্গত হইবে মুখুজ্জে তাহা অভিনয় করিয়া দেখাইল।

বাঁড়ুজ্জের নেশা এখন সম্পূর্ণ কাটিয়া যাওয়াতে মাতৃভাষার উপরে পুনরধিকার স্থাপিত হইয়াছে, সে বলিল—ভালোরে ভালো, ছোকরা যে আবার তর্ক করে।

ব্যাপারটা তখন ঐ খানেই মিটিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কোটওয়ালীতে মুখুজ্জের ডাক পড়িল। সে নবমীর পাঁঠার মতো কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে পৌঁছিয়া দেখে স্বয়ং শেরার সাহেব উপস্থিত।

হ্যালো মুখার্জি, তোমাদের বাড়ীতে কি একজন বাঙালী ছোকরা আশ্রয় নিয়েছে?

না, হুজুর।

আমিও তাই বলি। আমাদের গোয়েন্দা বলছিল তাকে নাকি ঐ দিকে যেতে দেখেছে, লোকটা সিপাহীপক্ষের লোক।

না হুজুর, এমন লোককে আমি কেন আশ্রয় দিতে যাবো!

রাইট! আমি গোয়েন্দাকে তখনই বলেছিলাম এ কখনো সম্ভব নয়। মুখার্জি রাজভক্ত প্রজা, এ রকম কাজ সে কখনো করবে না।

হুজুর ঠিক বুঝেছেন।

আচ্ছা তুমি যাও।

মুখুজ্জে লম্বা সেলাম করিয়া চলিয়া আসিল।

অন্যস্থান হইলে শেরার খানাতল্লাসী করিত, কিন্তু মুখুজ্জের বাড়ী সম্বন্ধে প্রয়োজন অনুভব করে নাই, কারণ মুখুজ্জের মুখ-নিঃসৃত সেই অক্ষয় বাণী অন্ধ বাদুড়ের মতো এখনো তাহার অন্ধকার মনের মধ্যে পাক খাইয়া ঘুরিয়া মরিতেছিল—ভীরুতাই রাজভক্তির বীজ! মুখুজ্জের মতো ভীরু লোক কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করিবে ইহা শেরারের কল্পনাতীত। তাছাড়া রাজনৈতিক প্রয়োজনেও আশ্রিতবাৎসল্য প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল।

মুখুজ্জে ফিরিয়া আসিয়া আসল ঘটনা প্রকাশ করিল না, যা হয় কিছু একটা বলিয়া দিল। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল এখন কর্তব্য কি? উক্ত যুবকই যে শেরার সাহেবের উদ্দিষ্ট লোক সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না। শেষে ভাবিল রাতে আর গোলমাল করিয়া কাজ নাই, কাল ভোরবেলায় ভালোয় ভালোয় উহাকে বিদায় দিলেই চলিবে।

পরদিন ভোর বেলায় উঠিয়া যুবকটিকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মুখুজ্জে মনে মনে বুঝিল যে শেরার সাহেবের তলবের কারণ অনুমান করিয়া যুবক সরিয়া পড়িয়াছে, ভাবিল ভালোই হইয়াছে, অপ্রিয় কাজটা আর করিতে হইল না।

এমন সময়ে একজন ছুটিয়া আসিয়া বলিল, মুখুজ্জে মশায়, ব্যাপার কি!

সকলে শুধাইল কি হয়েছে?

আর কি হবে? দরজায় শেরার সাহেবের পরোয়ানাখানা নেই, তার বদলে এই কাগজখানা ছিল।

সকলে পড়িল, কাগজখানায় লিখিত আছে—"This house belongs to traitors to the country—NANA Sahib."

এ ঐ মুখপোড়ার কাণ্ড।

হঠাৎ কি সন্দেহ হওয়াতে দেয়ালে বিলম্বিত দরখাস্তখানার কাছে গিয়া মুখুজ্জে একেবারে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—চণ্ডাল, চণ্ডাল, চণ্ডাল।

কি হ'ল, কি হ'ল, বলিয়া সকলে অকুস্থলে গিয়া দেখিল কে যেন দরখাস্তখানা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া রাখিয়াছে। আর মুখুজ্জে সশব্দে মেঝেতে মাথা কুটিতেছে—চণ্ডাল, চণ্ডাল, চণ্ডাল!

নানা সাহেব

সিপাহী বিদ্রোহ মিটিয়া গিয়াছে কিন্তু এখনো তাহার জের চলিতেছে। বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে এখনো অনেকে ধরা পড়ে নাই, ভারতময় তাহাদের সন্ধান চলিতেছে, জের বলিতে ইহাই। দিল্লীর বাদশাহ নির্বাসিত, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ সম্মুখ-সমরে নিহত, তাঁতিয়া টোপির ফাঁসি হইয়া গিয়াছে, ফৈজাবাদের মৌলবিও নিহত। নানা সাহেব ও তাহার দক্ষিণহস্ত আজিমুল্লা খাঁ এখনো ধরা পড়ে নাই। আরও একজন ধরা পড়ে নাই, সে বিখ্যাত নয়, কিন্তু বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের প্রধান দায়িত্বই না কি তাহারই, সে নানা সাহেবের হারেমের একজন ক্রীতদাসী, নাম জুবেদি বিবি।

নানা সাহেবকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য দিকে দিকে প্রদেশে প্রদেশে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রেরিত হইয়াছে, প্রচুর অর্থমূল্যও ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু এখনো তাহাকে পাওয়া যায় নাই। তবে পুরাদমে সন্ধান এখনো চলিতেছে, দক্ষিণে মাদ্রাজ, উত্তরে নেপাল, পূর্বে আসাম আর পশ্চিমে সীমান্ত-প্রদেশ চষিয়া ফেলা হইতেছে, নানা সাহেবকে ধরিতেই হইবে।

মাঝে মাঝে রব ওঠে নানা সাহেব ধরা পড়িল। ধৃত ব্যক্তিকে কানপুরে আনা হইলে পরীক্ষা ও প্রশ্ন করিয়া দেখা যায় যে, সে নিরীহ সন্ন্যাসী বা ফকির মাত্র। নানাদেশ হইতে গুপ্তচরেরা আসিয়া বলে যে, নানা সাহেবকে দেখা গিয়াছে, কখনো মন্দিরে, কখনো মসজিদে, কখনো হাটে-বাজারে গঞ্জে গ্রামে বা কোন রেলষ্টেশনে। কিন্তু 'ঐ বাঘ, ঐ বাঘ' রব এতবার উঠিয়াছে যে ঐরূপ সংবাদে এখন আর কেহ বিচলিত হয় না। বস্তুতঃ এখন অনেকেই বিশ্বাসই করিতে সুরু করিয়াছে যে, নানা সাহেব মারা গিয়াছে। নানা সাহেবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনটি মত দাঁড়াইয়াছে। কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির ধারণা যে, নানা সাহেব ১৮৬০ সালে নেপালে বা নেপালের তরাই অঞ্চলে মারা গিয়াছে। তাহারা বলে যে, ঐ সময়ে নানার যে সঙ্গিগণ নেপাল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এই সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মিথ্যা বলিবার কি

হেতু থাকিতে পারে? এই সব সঙ্গীর মধ্যে নানার নাপিত অন্যতম। তাহাকে নানার মৃত্যু বিষয়ে প্রশ্ন করিলে এইরূপ উত্তর পাওয়া যাইত :

—তুমি নানাকে কামাতে?

—কাকে কামাতাম?

—নানাকে?

—ওঃ সেই বাটপাড়কে! হাঁ বাটপাড়টাকে কামাতাম বটে!

—সপ্তাহে ক'বার?

—সপ্তাহে দু'বার। বাটপাড়!

এখন আর নিশ্চয় তার কামাবার দরকার নেই। সে নিশ্চয় মরেছে, কি বলো?

—মরেছে বলে মরেছে, একশবার মরেছে। খুব ভালো হ'য়েছে। বাটপাড়টা!

নানা মারা পড়িয়াছে কিনা তবু সংশয়ের রাজ্যে থাকিয়া যায়, কিন্তু কৃতজ্ঞতা যে মারা পড়িয়াছে সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। মানুষ এমনি বটে!

আর এক দলের লোক বলে নানা মরুক আর বাঁচিয়াই থাকুক তাহাতে এখন আর আশঙ্কার কিছুই নাই, সে পলাতক আসামী, দেশে তাহার আর প্রভাব নাই। অতএব তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য এত প্রচুর খরচ করিবার আর প্রয়োজন কি?

তৃতীয় দলটিই সংখ্যায় ও প্রভাবে প্রবল। তাহাদের অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী। এই উপলক্ষ্যে তাহারা প্রচুর বেহিসাবী টাকা ও রাহা খরচ পায়, তাহাদের বিশ্বাসের অনুকূলে এ মস্ত একটা যুক্তি। তার উপরে আবার বিলাত হইতে একদল মোটা বেতনের বিশেষজ্ঞ আসিয়াছে। তাহাদের কেহ হাতের অক্ষরে বিশেষজ্ঞ, কেহ নাকের আকৃতিতে, কেহ চোখের দৃষ্টিতে, কেহ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে, কেহ বা পদচিহ্নে বিশেষজ্ঞ। এখন সরকার ভাবে নানা মরিয়াছে স্বীকার করিলে ইহাদের বিদায় করিয়া দিতে হয়, যে প্রচুর পুলিশ ও গুপ্তচর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে তাহাদের দল ভাঙিয়া দিতে হয়, সে এক হাঙ্গামা, হয় তো বা পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তরে ভারত-সরকারের অকর্মণ্যতা ঘোষিত হইবে; তাই সরকার নীরব, ভাবে 'অশুভস্য কাল হরণং', নানা মরুক আর বাঁচিয়া থাকুক তাহারা না মরিলেই যথেষ্ট।

ভারতের নানাস্থানে নানাকে ধরিবার জন্য বিশেষ ঘাঁটি বসিয়াছে, কোন লোক ধরা পড়িবামাত্র কানপুরে আনীত হয়; দেশময় যে শত শত নানা সাহেব ধৃত হইতেছে তাহাদের আসল নকল বিচার করিয়া মুক্তি দানের বা হাজতবাসের আজ্ঞা দানের একটি ক্লিয়ারিং হাউসে পরিণত হইয়াছে কানপুর শহর। এত শহর থাকিতে কানপুর শহর নির্বাচিত হইবার বিশেষ কারণ আছে। কানপুরের কাছে বিঠুরে নানা দীর্ঘকাল ছিল, এ অঞ্চলের বহু লোকের কাছে নানা পরিচিত, তাছাড়া কানপুর শহরটা বিদ্রোহ-পীড়িত অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত, সেটাও একটা কারণ বটে।

কানপুর শহরের প্রকাণ্ড জেলখানা যেমন নানা শ্রেণীর নানা সাহেবে ভরিয়া গিয়াছে তেমনি মামুদের হোটেল নামে সৌখীন হোটেলটিও বিশেষজ্ঞ, উচ্চ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী, কৌতূহলী ইংরাজ অতিথি অভ্যাগতে পূর্ণ। হোটেলের মালিক মামুদ আলি হাসিখুশি মুখ, গোলগাল সুপুরুষ, নানাকে বেশ চিনিত, কেননা বিদ্রোহের সময়ে নানা কয়েক মাস এই হোটেলেই আশ্রয় লইয়াছিল।

কোন বিদেশী অতিথি যদি শুধাইত—

নানা কি হোটেলের খানা খেত?

'বিসমিল্লা' বলিয়া মামুদ আলি কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিত,—

হোটেলের .খানা? সর্বনাশ ও-কথা মুখেও আনবেন না, কে কোথায় শুনতে পাবে!

তবে খেতো কি?

এই ঘরটায় আসুন। এখানে নানার জন্য চুল্লি প্রস্তুত হয়েছিল, তাতে হাঁড়ি চাপিয়ে—হাঁড়ি মানে earthen pot······

ওঃ। তার প্রিয় খাদ্য কি ছিল?

ঘি—মানে clarified butter; আর এই ঘরটায় একটা চারপায়া পেতে নানা শুতো।

ঘরে আর কোন আসবাব ছিল?

আসবাব? না। হাঁ, তবে একটা বাছুর ঘরময় অবাধে ঘুরে বেড়াতো. আর একটা চাকর সোনার বাটীতে ক'রে তার চোনা, মানে—

মানে শুনিয়া সাহেবরা বলিয়া উঠিত how horrible! তারপরে শুধাইত সেটা কি করতো?

খেতো।

সাহেবগণ চমকিয়া উঠিত, ইংরাজি ভাষায় মনোভাব প্রকাশের যোগ্য শব্দ না পাইয়া তাহারা অবিলম্বে গৃহত্যাগ করিত। কেহ কেহ আবার মনে মনে যুক্তিজাল বুনিয়া স্থির করিত উক্ত বস্তু যখন খায় তখন উক্ত বস্তুর আধারটিকেও অবশ্য খাইত। কোন কোন দুঃসাহসী ভাবিত একবার গোপনে উক্ত বস্তুটা চাখিয়া দেখিতে হইবে, নানা কি খামোকা খাইত, তাহার তো অভাব ছিল না; সে ভাবিত দেশে ফিরিয়া এ বিষয়ে একখানা বই লিখিয়া ফেলিবে, প্রকাশকের অভাব হইবে না, এখন নানা সাহেবের বাজার-দর চড়া।

নানার সম্বন্ধে সাহেবগণের মনোভাব যেমনি হোক, হোটেলের মালিক মামুদ সম্বন্ধে তাহাদের অনুকম্পার অন্ত ছিল না। সে প্রত্যেকের রুচি অনুযায়ী খানা জোগাইত, মদ জোগাইত, 'অমুক জিনিসটা পাওয়া গেল না' এ কথা কেহ তাহার মুখে শোনে নাই, বিল আদায় করিতে, ফাইফরমাস খাটিতে সে সর্বদাই প্রস্তুত, আর তার সবচেয়ে বড় গুণ সে সময়মতো হাসিতে পারে। এ গুণটি যার আয়ত্ত সংসারে সে সর্বজয়ী। সর্বজয়ী এই গুণটির বলেই বেতসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সে কোম্পানীর আমলে হোটেল চালাইয়াছে, নানার আমলে চালাইয়াছে এবং এখন খাস মহারাণীর আমলে চালাইতেছে, কেহ কখনো তাহার সততায় সন্দেহ মাত্রও প্রকাশ করে নাই। মামুদ হাসিয়া বলে হোটেল-ওয়ালা, জল্লাদ ও টেবিল-খানসামা বা waiter-এর সম্বন্ধে বাছবিচার করলে চলে না।

হোটেলের হেড-ওয়েটারটি সম্বন্ধে মামুদ সার্থক গর্ব অনুভব করিয়া বলিত ঐ যে বিঠুরের ইঁদারার মধ্যে নানা সাহেবের একরাশ সোনার তৈজসপত্র পাওয়া গিয়াছে, সেগুলোর বদলেও সে ইসাককে ছাড়িতে নারাজ। ইসাক তাহার প্রখ্যাত হেড-ওয়েটার। সে যে কোথা হইতে আসিল, কি তাহার পূর্বেতিহাস কেহ জানিত না, কেহ জিজ্ঞাসাও করিত না, যাহারা জিজ্ঞাসা করিবার মালিক তাহারা সকলেই ইসাকের গুণে মুগ্ধ। মুখ খুলিবার আগেই সে মনের কথা বুঝিতে পারে, আবার এমন অনেক মনের কথা আছে কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছিবার আগেই ইসাক তাহা তালিম করিয়া বসে। দিন এবং রাত্রির যাবতীয় পরিচর্যায় ইসাক এমনি পারঙ্গত যে, সাহেব-বিবি অতিথি-অভ্যাগত দেশী-বিদেশী সকলেরই মুখে এক কথা, ইসাক, ইসাক। খানসামা-সুলভ চাপকানে ইসাক সজ্জিত,

মাথায় টুপি, পা খালি এবং মুখে হোটেলের মালিকের মতোই সর্বজয়ী হাসি। তবে মামুদের ও ইসাকের হাসিতে কিছু প্রভেদ ছিল। মামুদ সকলকে দেখিয়া সমান হাসি হাসিত, কিন্তু ইসাকের হাসিতে তারতম্য ছিল, লোকের পদমর্যাদা বিচার করিয়া সে হাসিত; কাহারো জন্য তাহার ওষ্ঠাধরে হাসির মোহর, কাহারো জন্য হাসির টাকা, কাহারো জন্য বা হাসির আধুলি বা সিকি দুয়ানি, নিতান্ত হীনমর্যাদার জন্য পয়সা বা পাই, কেহই একেবারে বঞ্চিত হইত না।

মামুদের হাসি বলিত তোমরা সকলেই আমার অতিথি, আমার চোখে তোমরা সবাই সমান; আর ইসাকের হাসি বলিত সকলকে সমান করিলে আমার চলে না, কে বেশি দামের খদ্দের, কে কম দামের, কে জেনারেল, কে কর্ণেল, কে মেজর আমার জানা চাই; বস্তুতঃ মামুদের হাসি ও ইসাকের হাসি পরস্পর পরিপূরক।

আরও একটি কারণে সরকারী মহলে ইসাকের খুব প্রতিপত্তি ছিল। সে নানা সাহেবকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনিত, সে ছিল সরকারী সনাক্তকারী। এই যে নানাদেশ হইতে শত শত নানা আসিয়া জেলখানা ভরিয়া তুলিতেছে কে তাহাদের সনাক্ত করিবে? নানাকে যাহারা ঘনিষ্ঠভাবে জানিত তাহারা হয় মরিয়াছে, নয় পলাইয়াছে, নয় অন্য কারণে সনাক্তকার্যে অসম্মত। এই সঙ্কটে ইসাক একমাত্র রক্ষাকর্তা। সে দীর্ঘকাল বিঠুরে ছিল, কানপুর শহরেও সে সে কতবার নানাকে দেখিয়াছে, কাজেই সে-ই যোগ্যতম ব্যক্তি। খানা ও মদ রুচিমতো যে ব্যক্তি জোগান দিতে সক্ষম, সে বিশ্বাস-ভাজন না হইয়া যায় না, আর বিশ্বাস-ভাজনের সব কথাই সমান বিশ্বাসযোগ্য। সপ্তাহে একদিন করিয়া ইসাকের ডাক পড়িত জেলখানায় সনাক্তকরণের প্যারেডে। সে গিয়া দেখিত এমন হাজার দুই নানা সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান; বয়স বাইশ হইতে বিরাশি, মাথায় চার ফুট হইতে সাত ফুট, জাতিতে বাঙালী হইতে পাঠান—আর সবচেয়ে বেশি সাধুসন্ন্যাসী পীরফকিরের সংখ্যা। যে গেরুয়া এবং যে আলখাল্লায় জীবনের অনেক দুষ্কৃতি ঢাকা পড়ে, চিত্রগুপ্তের চোখে ধূলি দেওয়া যায়, সেই পোশাকই তো আত্মগোপনের শ্রেষ্ঠ উপায়, তাই স্বভাবতঃই সাধু-সন্ন্যাসী আর পীর-ফকিরের সংখ্যাই কিছু অধিক। ইসাক সারিবদ্ধ নানার সম্মুখ দিয়া সবেগে চলিয়া যাইত, তারপরে অদূরে দণ্ডায়মান জেনারেল সাহেবের নিকটে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিত হুজুর, তামাম ঝুটা।

সাহেব জেলারের প্রতি ইঙ্গিত করিত, বলিত, খালাস দো।

নানার দল ছুটি পাইত। কিন্তু জেলখানা কখনো খালি হইত না, কারণ বাল্যকালে যাহারা চৌবাচ্চার অঙ্ক কষিয়াছে তাহারা জানে এক নলে জল বাহির হইতেছে, আর এক নলে ঢুকিতেছে, ফলে চৌবাচ্চা যেমন পূর্ণ তেমনি পূর্ণ ই থাকিত। আর একদল নূতন নানা আসিয়া জেলখানা ভরিয়া তুলিত।

আর এক কারণে সাহেব মহলে ইসাকের ডাক পড়িত। বিদেশী অতিথি আসিয়া নানার কাহিনী শুনিতে চাহিলে ইসাক ছাড়া আর কে শুনাইবে? একদিনের কথা বলি। সেদিন দুইজন বিদেশী অতিথি আসিল, একজনের নাম মশিয়ে লুবলিন, সে ফরাসী; আর একজনের নাম মিষ্টার জর্জ, সে ইংরাজ। দু'জনেই দেশে থাকিতে পুস্তকে ও পত্রিকায় নানার কাহিনী পড়িয়াছে।

ড্রয়িংরুমে বসিয়া লুবলিন ও জর্জে নানার বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, অদূরে বিনীতভাবে ইসাক দণ্ডায়মান। সে একবার মশিয়ের দিকে তাকাইয়া হাসে, আর একবার মিষ্টারের দিকে তাকাইয়া হাসে, মিষ্টারের প্রতি প্রযুক্ত হাসিটি প্রশস্ততর, কারণ যদিও হোটেলের অতিথি হিসাবে দুজনেই সমান আদরণীয়, তবু মিষ্টার যে রাজবংশীয়, তাহার রাজপ্রাপ্য তো মশিয়ের সমান হইতে পারে না।

মশিয়ে বলিতেছে, মিষ্টার নানা সম্বন্ধে আমার ধারণা কি জানেন? কাশ্মীরী ঢিলা পোশাক গায়ে, পার্শিয়ান চটি পায়ে গদির উপরে গড়াচ্ছে, পাশে দাঁড়িয়ে দু'জন খাপসুরৎ মেয়ে ময়ূরপুচ্ছের পাখা দুলিয়ে বাতাস করছে আর বালজাকের Droll Stories পড়বার ফাঁকে ফাঁকে পায়ের কাছে অর্ধশায়িত অর্ধনগ্ন ইরাণী মেয়ে দুটোকে মাঝে মাঝে সে চিমটি কাটছে। এমন সময়ে একজন সিপাহী সঙীনের ডগায় বিঁধিয়ে নিয়ে এলো একটা ইংরাজ শিশুকে, সেটাকে দেখবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই তাঁর কোলের মধ্যে থেকে একটা মিশরীয় বেড়াল লাফিয়ে পড়ল, ছেলেটাকে ভালো ক'রে দেখবার জন্যে সে নাক-টেপা চশমাটা পরে নিল, তাড়াতাড়ি উঠ্‌বার সময়ে সেটা খুলে পড়ে গিয়েছিল।

মশিয়ে ইসাকের দিকে তাকালো, ইসাক মাথা ঈষৎ নত ক'রে একবার হাসলো।

কিন্তু জর্জের সে রকম মনোভাব নয়। সে বল্‌ল, মশিয়ে নরকের সেই কীট-টা সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরকম। কি রকম বলবো!—Guy Fawkes

Dayতে Guy Fawkes-এর যে মূর্তিটা আমরা দাহ ক'রে থাকি অনেকটা তারই মতো Nana-র (মিষ্টার কৃত উচ্চারণ ন্যান্যা) চেহারা, তবে আরও ভীষণ, কেন না প্রাচ্যদেশের চেহারা স্বভাবতঃই কুৎসিত। তার মাথাটা প্রকাণ্ড একটা হাঁড়ির মতন, লেখাপড়া কিছুই জানে না, কোন অনুচরের উপরে রেগে গেলে তখনই পদাঘাতে তাকে নিকেশ ক'রে ফেলে, আর তার প্রিয় খাদ্য শিশুদের লিভার। আর রোজ রাত্রিবেলা সে কুমারী মেয়ের হৃৎপিণ্ডের চাটনি খায় স্বাভাবিক শক্তি অর্জনের আশায়! Oh, a veritable monster!

মিষ্টার ইসাকের দিকে তাকাইবামাত্র ইসাক মাথা আরও একটু নত করিয়া প্রশস্ততর একটি হাসি হাসিল।

কিন্তু মিষ্টার মশিয়ে নয়, হাসির প্রকৃত মূল্য না দিয়াই সে বলিয়া উঠিল a peg!

মিষ্টার নিজের বর্ণনার চাপে নিজেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

দুটি পেগ মিষ্টার ও মশিয়ের যথাস্থানে গমন করিলে মশিয়ে বলিল—ইসাক, তুমি তো জানতে নানাকে, বল তো সে কেমন ছিল!

ইসাক দু'জনের দিকে তাকাইয়া দু'বার হাসিয়া লইয়া আরম্ভ করিল, সাহেব, আপনাদের কল্পনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাস্তব পারবে কেন? যে সব গুণের আপনারা উল্লেখ করলেন হতভাগ্য নানার সে-সব কিছুই ছিল না। সে নিতান্ত সাদামাঠা লোক, বেঁচে থাকলে বয়স এতদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মাঝে হ'ত, রঙ কালো, কারণ যে-সব লোক ইউরোপের বাইরে জন্মেছে আপনাদের চোখে তারা সবাই কালো, মোটাসোটা দোহারা চেহারা; খেতো চাপাটি আর ডাল, তা-ও আবার অনেক সময় স্বহস্তে তৈরি ক'রে। তার হারেমে অবশ্য অনেক স্ত্রীলোক ছিল, কিন্তু সেটা তাদের অন্যত্র যাবার ইচ্ছার অভাবে। ফরাসী ভাষা দূরে থাক, ইংরাজি ভাষাও জানতো না বললেই হয়। আর নাকটেপা চশমা! তার এজেন্ট আজিমুল্লা খাঁর একজোড়া কানে পরানো চশমা ছিল বটে!

এই বলিয়া সে মিষ্টার ও মশিয়ের দিকে তাকাইয়া হাসিল, ভাবটা এমন যে আপনাদের বর্ণনাই ঠিক।

মশিয়ে বলিল, 'হাউ ট্রুথফুল', অর্থাৎ তোমার বর্ণনা শুনে মনে হয় সে ছিল তোমার মতোই দেখতে।

মিষ্টার বলিল, 'All orientals are liars', অর্থাৎ তুমি নিশ্চয় সত্য গোপন করবার চেষ্টা করছ।

ইসাক দু'জনের কথাতেই এমনভাবে হাসিল, যেন বলিল, আপনারা দুজনেই সমান সত্য কথা বলিয়াছেন।

এমন অপরিসীম ধৈর্য, কৌশল, মানব-চরিত্রজ্ঞান ও বুদ্ধি ইসাকের। মামুদের কথাই ঠিক, তুচ্ছ সোনার দামে ইসাকের দাম! সত্যই ইসাকের তুলনা হয় না।

১৮৬৪ সালে উত্তর ভারতে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তাহার একটি বাস্তব ফল হইল যে, নানা সাহেবের সংখ্যা অনেক গুণ বাড়িয়া গেল। আগে শতে শতে ধরা পড়িত, এখন হাজারে হাজারে ধরা দিতে লাগিল। আগে আসামী খুঁজিয়া বেড়াইতে হইত, এখন আসামী সরকারী লোক খুঁজিয়া বাহির করিয়া ধরা দেয়। আগে সাধু-ফকিরের সংখ্যাই বেশি ছিল, এখন গৃহীর সংখ্যাও বাড়িয়া উঠিল। গৃহীর খাদ্যাভাব, সাধু ফকিরের ভিক্ষার অভাব। সকলেই জানে যে হাজতে রাখিলে খাইতে দেয়, আরও শুনিয়াছে যে একবার আসামী বলিয়া সনাক্ত হইতে পারিলে পুলিপোলাও চালান হইবে তখন আর খাওয়া-পরার চিন্তা করিতে হইবে না। সকলেই ভাবে, আহা এমন সৌভাগ্য কি হইবে, যে পোড়া কপাল!

একদিন সকালে সীতাপুর থানায় জনকয়েক নানা আসিয়া উপস্থিত হইল, হাঁকিল, কই গো দারোগা সাহেব, আমাকে গ্রেপ্তার করো, আমি নানা সাহেব। দারোগা আসিয়া দেখিল অনেকগুলি উমেদার। সে বলিল, একসঙ্গে এতজন তো নানা হ'তে পারে না।

নইলে নানা বলেছে কেন? একজন হ'লে তো 'একখানা' বলিত।

দারোগা খোঁজ করিয়া জানিল যে, লোকটি পাঠশালার পণ্ডিত। বলিল, নইলে আর এমন বুদ্ধি হয়!

তোমার অত বিচারে কাজ কি! তুমি সকলকে চালান দাও, যার ভাগ্যে আছে নানা সাহেব হবে।

দারোগা বিরক্ত হইয়া বলিল, গ্রেপ্তার করতে নিষেধ আছে।

পাঠশালার পণ্ডিত বলিল, ওঃ বুঝেছি, কেউ বুঝি দু' পয়সা খাইয়েছে।

দেখো ও-সব কথা বল্‌লে আইনে পড়বে।

আরে সেই ভরসাতেই তো বলছি। যে-কোন একটা ধারায় গ্রেপ্তার করো।

দারোগা কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময়ে এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বিশুদ্ধ দেবভাষায় বলিল, 'অয়ম্ অহম্ ভো'—অর্থাৎ আমি নানা সাহেব, গ্রেপ্তার করো।

দারোগা বলিল, তুমি তো সন্ন্যাসী।

বটে ? সন্ন্যাসীর কি এমন হাতের গুলি হয় ?

এই বলিয়া বাহুর গুলি পাকাইয়া দারোগার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, বলিল, টিপিয়া দেখো, হাতের গুলি, না লোহার গুলি।

দারোগা বলিল—আমি কি করবো ঠাকুর, এরাও যে উমেদার, এই বলিয়া গৃহীদের দেখাইয়া দিল।

তখন 'তবে রে শালে বুরবক' বলিয়া সেই বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী লাঠি তুলিয়া গৃহীদের তাড়া করিল, তাহারা সামান্য গৃহীমাত্র, প্রাণের দায়ে নানা সাহেব পদের উমেদার হইলেও প্রাণের মায়া এখনো সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহারা পলাইল।

তখন সন্ন্যাসীর অনুকূলে নানা সাহেব পদ সাব্যস্ত হইয়া গেল। থানার বারান্দায় সে দিব্য জমাইয়া বসিয়া গম্ভীরভাবে দারোগাকে আদেশ করিল, এ বেটা আভি নানা সাহেবকো খিলাও।

উত্তর ভারতের প্রায় প্রত্যেক পুলিশ থানাতেই প্রত্যহ এমন দৃশ্যের অভিনয় হইত। আর এই সব নানার ধারা যে মহাসমুদ্রে গিয়া মিলিত হইত সেই কানপুর শহরের দৃশ্য উপভোগ করা সহজ হইলেও বর্ণনা করা সহজ নয়। জেলখানার নিকটবর্ত্তী পাঁচসাতটি বড় বড় বাড়ী ভর্তি হইয়া গিয়া এখন খোলামাঠে তারের বেড়া খাটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা দেখিয়া নানার দল জেনারেল সাহেবকে বলিয়া পাঠাইয়াছে ও খরচাটা নাই করিলেন, আমরা পালাইবার জন্য আসি নাই। তাহারা আরও বলিয়া পাঠাইয়াছে যে তাহারা মহারাষ্ট্র রাজ্যের পেশবা, কাজেই আহারাদির সেই অনুপাতে ব্যবস্থা করা বৃটিশ-রাজের পক্ষে উচিত হইবে, পেশবা এখন গদিচ্যুত হইলেও এক সময়ে রাজা তো ছিল বটে!

জেনারেল সাহেব জেলারকে ডাকিয়া শুধাইল হঠাৎ নানার সংখ্যা বেড়ে উঠবার হেতু কি ?

জেলার বলিল, এতদিনে সরকারী মেশিন বেশ চালু হ'য়েছে কি না !

জেনারেল সাহেব বলিল—হুম্! জেলারের খাশ মুন্সী মুখুজ্জে বলিল, সাহেব, খানা বন্ধ করে দিন, নানার দল পালাবে।

জেলার বলিল, তা কেমন ক'রে হয়? সনাক্তকরণ না হ'লে কাউকে ছাড়তে পারিনে।

পরিবর্তিত অবস্থায় এখন সপ্তাহে তিনদিন সনাক্তকরণ হয়, ইসাকের কাজ খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

সেদিন ভোরবেলা সনাক্তকরণ আরম্ভ হইয়াছে। জেনারেল সাহেব, সিভিল সার্জেন্ট, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার ও বিশেষজ্ঞগণ হাজির আছে। জেলার ও ইসাক সনাক্তকরণে অগ্রসর হইয়াছে।

ইসাক একটা লোকের কাছে একটু থামিতেই তাহার মুখ আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, আমিই মিঞা সাহেব, আমি।

তুমি কি বিবিদের হত্যা করেছিলে ?

নিশ্চয়ই। এখন চালান না দিলে অতঃপর বাবাদেরও সাবাড় করবো।

না! তুমি নও।

তাহার দাবী অগ্রাহ্য হইল জানিবামাত্র লোকটি বুক চাপড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—মহারাণীর দোহাই লাগে জেলার সাহেব, আমি সেই বাংলা মুল্লুক থেকে আসছি। মামলায় আর বন্যায় সর্বস্বান্ত হয়েছি। রেলগাড়ীতে টিকিট কিনবার পয়সা অবধি ছিল না, নানা বলতেই চেকারবাবু ছেড়ে দিলে। বড় ভরসা করে এসেছি সাহেব, এখন তোমরা ঠেললে দাঁড়াই কোথায় ?

পাশেই জনকতক বরখাস্ত বাঙালী উমেদার ছিল। তাহারা বলিল, কান্নাকাটির যুগ নয় ভাই, চলো সঙ্গে সঙ্গে গণবিক্ষোভ করি, অমনি সঙ্গে ঢোলের সঙ্গে কাঁসীর মতো দু' চারজনের 'প্রায়োপবেশন' করাও সঙ্গত হবে।

একজন বলিল, আহা, আর কাঁসীর সঙ্গে শানাইয়ের মতো সঙ্গে একখানা সংবাদপত্র থাকলে আজ কি দুশো মজাই না হতো।

অপর একজন বলিল, দেখতাম কেমন ওরা বাংলাদেশের দাবী অগ্রাহ্য করে। তখন তাহারা সকলে মিলিয়া 'বাংলার দাবী মানতে হবে, অবাঙালী

নানা চলবে না' প্রভৃতি আওয়াজ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। ইতিমধ্যে সনাক্তকরণ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে, যাহাদের দাবী অগ্রাহ্য হইতেছে তাহার নীরবে বিষণ্ণভাবে চলিয়া যাইতেছে, বাঙালী নয় বলিয়া গণবিক্ষোভ বাধাইতেছে না।

এমন সময়ে এক জায়গায় গোলমাল বাধিয়া উঠিয়াছে দেখিয়া ইসাক অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, একজন মুসলমান ফকির ও একজন হিন্দু সন্ন্যাসীতে দাঙ্গা বাধিয়া গিয়াছে। ফকির বলিতেছে যে সে নানা সাহেব আর হিন্দু বলিতেছে যে সে নানা সাহেব। আর উভয়পক্ষে কিল, ঘুষি চলিতেছে। ভাগ্যে তখন সমাজচৈতন্য এখনকার মতো প্রবল হইয়া ওঠে নাই, নতুবা একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়া যাইত।

ইসাক বলিল, বাপু তোমরা কেহই তো নানা সাহেব নও।

বলি চোখের মাথা কি খেয়েছ? দেখতে পাও না?

আমি নানা সাহেব নই বলে কি তোমার বাপ নানা সাহেব? ইসাক বিরক্ত হইয়া বলিল, স্বীকার করছি বাপু আমিই নানাসাহেব। এবারে হ'ল তো?

চাঁদ আর কি! নানা সাহেব তো হয়ে এসেছ সনাক্ত করতে।

সে বিষয়ে নানাসাহেবই তো সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

জেলার সাহেব কাছেই ছিল। সে "ডেশী বাষা উটমরূপে শিক্সা" করিয়াছে; ইসাকের wit দেখিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, বহুৎ আচ্ছা।

তবে রে বেটা অলপ্পেয়ে। দাবীদার দুইজনেও ইসাকের পিঠ চাপড়াইতে অগ্রসর হইল, তবে তাহার রকমটা ভিন্ন।

তাহারা দুইজনে একসঙ্গে ইসাককে আক্রমণ করিল।

বল্ আমি নানা সাহেব। দেশে ভাত ভিক্ষে মেলে না, আবার বলে কি না নানা সাহেব নই। অপরে বলিল, আমার চৌদ্দপুরুষ নানা সাহেব।

ইসাক প্রহৃত হইয়া পলায়ন করিল। সেদিনের মতো সনাক্তকরণ প্যারেড শেষ হইয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলায় ইসাক জেলারেল সাহেবকে বলিল, হুজুর, আমাকে এবার ছুটি দিন। এমন করে মার খেতে আর পারিনে।

বলো কি ইসাক! তুমি না থাকলে নানাকে ধরবো কি করে? দেখছ তো

সরকার কত খরচ করছে। না, না, তোমাকে কিছুতেই ছুটি দেওয়া চলবে না, তারচেয়ে তোমার সঙ্গে দু'জন পাঠান বডিগার্ড দেবো।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে একদিন সন্ধ্যার সময়ে একজন ভদ্রলোক ও একজন স্ত্রীলোক মামুদের হোটেলে ঢুকিয়া ডাইনিং কক্ষে গিয়া বসিল। ভদ্রলোকটির পরনে সাহেবী পোষাক, আর স্ত্রীলোকটির পরনে মেম সাহেবের পোষাক। গায়ের রঙ দেখিলে তাহাদের পুরা ইংরাজ মনে হয় না, হয়তো বা ইউরোপীয়ান হইবে।

ভদ্রলোকটি বলিল, তোমার পরামর্শে এলাম, এখন বিপদে না পড়ি। স্ত্রীলোকটি বলিল, ইসাকের চোখে পরীক্ষা না হলে বুঝবো কেমন করে। এ বিষয়ে ঐ লোকটাই তো বিশেষজ্ঞ। দেখো না সরকার ওকে কত যত্ন করে পুষছে।

যদি ধরে ফেলে ?

পাগল না কি। আমি বলছি ধরতে পারবে না। মেয়েদের অশিক্ষিত পটুত্বের খ্যাতি শোননি কি ? তাছাড়া বিপদের ভয় তো আমারও আছে।

আচ্ছা তাহলে ওকে ডাকি।

পুরুষটির আহ্বানে ইসাক আসিলে দু'জনের মতো খাবার আনিতে হুকুম করা হইল।

ইসাক সেলাম করিয়া খাবার আনিতে গেল।

দেখলে তো ধরতে পারেনি।

তাইতো মনে হচ্ছে।

ইসাক খাবার আনিল। দু'জনে হৃষ্ট মনে খাইল। তারপর দাম চুকাইয়া দিয়া ইসাককে কিছু বকশিশ দিল পুরুষটি।

ইসাক সেলাম করিয়া বলিল, সেলাম আজিমুল্লা খাঁ।

বলে কি ! শুনিবামাত্র পুরুষ ও স্ত্রীলোকটির মুখ শুকাইয়া গেল।

পুরুষটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেও স্ত্রীলোকটি প্রত্যুৎপন্নমতিতে বলিল, যাও দু' পেগ মদ নিয়ে এসো।

সে চলিয়া যাইবামাত্র পুরুষটি বলিল, বলেছিলাম ধরে ফেলবে। চলো এখনি পালাই।

স্ত্রীলোকটি বলিল, লোকটা সারাদিন ঐসব নাম ভাবছে, তাই ভুলে বলে

ফেলেছে। দেখবে এর পরে হয়তো নানা সাহেব বলেই সেলাম করে ফেলবে। তাছাড়া পালাবেই বা কোথায়? হোটেলের বাইরেও তো ইংরাজের রাজত্ব।

এমন সময়ে ইসাক দু' পেগ মদ লইয়া আসিল।

দু'জনে পান করিল। এবারে মেয়েটি দাম চুকাইয়া দিয়া বকশিশ দিল।

ইসাক সেলাম করিয়া বলিল, সেলাম জুবেদি বিবি।

নাঃ, আর সন্দেহের এতটুকু অবকাশ নাই। ইসাক দু'জনকেই চিনিয়া ফেলিয়াছে। ভয়ে তাহাদের মুখ পাংশু ও জিহ্বা শুষ্ক হইয়া গেল, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারিল না।

তাহাদের অবস্থা দেখিয়া ইসাক মুখে সেই সর্বজয়ী হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—আজিমুল্লা খাঁ, জুবেদি বিবি, আপনারা ভয় পাবেন না। সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে এসেছেন, এখানে নির্ভয়ে থাকুন, কেউ আপনাদের চিনতে পারবে না।

মেয়েটি বলিল, তুমি চিনলে কি করে?

ইসাক বলিল, আমার চোখে ধুলো দেওয়া কি আপনাদের কাজ? আমি যে নানা সাহেবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

পুরুষ ও রমণী যুগপৎ শুধাইল, কিন্তু তুমি কে? এবারে ইসাক তাহাদের কাছে আসিয়া, কণ্ঠের স্বর অনেকখানি নামাইয়া আনিয়া একবার এদিকে ওদিকে তাকাইয়া লইয়া মৃদুস্বরে বলিল—আমিই নানা সাহেব।

সুতপা

যে সব গুণ ও যে-পরিমাণ রূপ থাকলে বিয়ের বাজারে উচ্চ চাহিদা হয় তার সবগুলি থাকা সত্ত্বেও সুতপা যখন বুঝতে পারলো বিয়ে তার হবার নয়—সে আর দশজন মেয়ের মতো আশাতীতের পিছনে বৃথা ছুটোছুটি না করে জীবন-ক্যালেণ্ডারের সে পাতাখানাকে ছিঁড়ে ফেলে দিল। এবারে তার জীবনে এলো ইস্কুল-মাষ্টারির অধ্যায়। বাংলাদেশের বাইরে ছোট একটি শহরে মেয়ে-ইস্কুলের মাষ্টারি নিয়ে সে চলে গেলো। তার উপরে নির্ভর করে সংসারে এমন কেউ তার ছিল না—সে স্থির ক'রে ফেললো আর কারো উপরেও সে নিজের ভার চাপাবে না। তারপরে একদিন সে নিজের বিছানা বেঁধে, তোরঙ সাজিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ীতে চড়ে বসলো। সে আজ অনেক দিনের কথা।

সুতপা আট বছর এই ইস্কুলে মাষ্টারি করছে বটে, কিন্তু কালের হিসাব আর মনের হিসাবে সব সময়ে খাপ খায় না—তার মনে হয় কত জন্ম ধরে' যেন এখানে সে আছে—আরো কত জন্ম তাকে থাকতে হবে। তার মনে পড়ে যায়, বাল্যকালে সে একবার তার পিতার সঙ্গে নৌকোয় ক'রে মস্ত এক নদী পাড়ি দিয়ে রেলষ্টেশনে আসছিল—একদিকে সরু নীল পাড়ের মতো তীরের রেখা—আর একদিকে ঝাপসা আবছা দিগন্ত—আকাশ আর জল মিশেছে বলে মনে হয় না। সুতপার মনে হয়, এখনো যেন সেই নদীপথেই সে চলেছে—অতীতের দিকে অতি দূরে পূর্বজীবনের ক্ষীণতম একটুখানি আভাস—ভবিষ্যতের দিকে কেবলি অশ্রুর ঘনতর বাষ্প, তীরের লেশমাত্র নেই। সে স্থির ক'রে নিয়েছে এমনি ক'রেই ভাসতে ভাসতে অবশেষে একদিন জীবনের প্রান্তে এসে পৌঁছবে।

ইস্কুলের কাজের ছকের সঙ্গে তার জীবনটা এতদিনে খাপে খাপে মিলে যাওয়া উচিত ছিল, গিয়েছেও তাই। কিন্তু বিপদ হয় ছুটিগুলোকে নিয়ে। ইস্কুলের জীবন নিরেট কাজ নয়—লম্বা এবং ছোটখাটো ছুটির টুক্‌রো সাজিয়ে তৈরি। ওই ছুটিগুলোকে নিয়ে সুতপা পড়ে বিপদে। হাতের প্রচুর অবসর আর মনের গভীর শূন্যতা দুইয়ে মিলিয়ে তার মনে আদিম একটা অরাজকতার

সৃষ্টি করে। নিজের ছোট ঘরখানির শূন্যশয্যায় শুয়ে একখানা বই খুলে নেয়। মনোযোগ বইয়ের পাতার অক্ষরের কালো রেখা ধরে প্রথম প্রথম বেশ ছুটতে থাকে—কিন্তু হঠাৎ কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই গাড়ী এক লাইন থেকে আর এক লাইনে যায় চলে—আর একদিন অনায়াসে জীবন-ক্যালেণ্ডারের যে-পাতাখানাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল কোন্ সঞ্চিত দীর্ঘনিশ্বাসের ঘূর্ণিহাওয়ায়, সেখানা উড়তে উড়তে কোলের উপরে এসে পড়ে—সুতপা চমকে ওঠে!

মিহির বলে,—চলো বেড়িয়ে আসি।

সুতপা বলে,—চলো!

মিহির একখানা গাড়ী ডাকে।

সুতপা বলে,—আবার গাড়ী কেন?

মিহির বলে,—কল্‌কাতার পথে লোকজন ঠেলে আর অপঘাত বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে মনোযোগের পনেরো আনাই মাঠে মারা যায়—পরস্পরের জন্য আর বাকি থাকে না। গাড়ীর সুবিধে এই যে, গাড়োয়ানটাকে ভিড় ঠেলে চলবার ভার দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত মনে গল্পগাছা করা যায়।

দু'জনে গাড়ীতে উঠে বসে।

ক্যালেণ্ডারের তারিখের কালো খোপগুলোর মাঝে মাঝে এক একটা লাল তারিখ—কালোয় ঘের-দেওয়া লাল অঙ্ক।

গাড়ী চল্‌ছে। মিহির কথা বলে না, মুখ ভারি ক'রে থাকে। একটুতেই মিহিরের রাগ করা অভ্যাস। নিরুপায় সুতপা হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে ফেলে ছোট্ট একখানি রুমাল বের করে; ভাঁজ খুলে ফেলতেই বেরিয়ে পড়ে কয়েকটি শুভ্র বেল ফুল। সুতপা বলে,—এই নাও, সন্ধি স্থাপন করলাম।

মিহির ফুলগুলোর সঙ্গে রুমালখানা টান দিয়ে নিয়ে পকেটে ভরে।

সুতপা বলে,—ও কি?

মিহির বলে,—কেন পতাকা।···আচ্ছা এ ফুল কি আমার জন্যে এনেছিলে?

সুতপা গম্ভীরভাবে বলে,—না।

আবার ওর মুখ ভারি হয়। দু'জনেই জানে এ ফুল কার জন্যে আনা। তবে একজনেরই বা কেন জিজ্ঞেস করা এবং আর একজনেরই বা কেন অস্বীকৃতি? কিন্তু সংসারে নিরন্তর কি এমনি ঘটছে না? যে-চোর হাতে-নাতে ধরা পড়েছে সেও তো দোষ স্বীকার করে না।

এমন সময়ে গাড়ী ধাক্কা খায়। সুতপা চমকে ওঠে। নাঃ, গাড়ীর ধাক্কা নয়—চন্দনী এসে দরজায় ধাক্কা মারে। চন্দনী ওর ঝি।

চন্দনী বাইরে থেকে বলে,—দিদিমণি, চায়ের সময় হয়েছে।

সুতপা তাড়াতাড়ি শয্যা ছেড়ে ওঠে—ক্যালেণ্ডারের ছিন্ন পাতাখানা হঠাৎ উড়ে চলে যায়—খুব দূরে নয়—কাছেই কোথাও লুকিয়ে থাকে পুনরাবির্ভাবের সুযোগে।

সুতপা ছোট্ট একখানি বাড়ী পেয়েছে—সরকারী পরিভাষায় যাকে বলে 'ফ্রি কোয়ার্টার'। একটি ছোট ড্রয়িংরুম, একটি বেড রুম। সমুখে একটি জাল দিয়ে ঘেরা বারান্দা, পিছন দিকে বাঁধানো উঠোন, রান্নাঘর, স্নানের ঘর—সবই আছে অল্পের মধ্যে। চন্দনী ওর ঝি—প্রথম থেকেই আছে সুতপার সঙ্গে। রাঁধে বাড়ে, সুতপাকে খাওয়ায়, নিজে খায়। চন্দনী ওইখানেরই লোক।

ইস্কুল খোলা থাকলে সুতপা দশটার মধ্যে খাওয়া সেরে সেজে নিয়ে বেরুবার আগে একবার আয়নার সমুখে দাঁড়ায়। এলোমেলো চুলগুলোকে কপাল থেকে সরিয়ে দিয়ে, মুখের উপরে একবার রুমাল বুলিয়ে, দরজা বন্ধ ক'রে ইস্কুলে চলে যায়। চন্দনী বাড়ীতে থাকে। আবার ইস্কুল থেকে ফিরে দরজা খুলে আয়নার সমুখে দাঁড়ায়—ওটা একরকম তার মুদ্রাদোষ হয়ে গিয়েছে। রোদে আর পরিশ্রমে বিকালবেলায় স্থলপদ্মের মতো মুখ তার ঈষৎ মলিন, চুলগুলো কপালের উপরে এসে পড়েছে। স্থলপদ্মের কথা মনে পড়তেই তার হাসি পায়; উপমাটা মিহিরের। হাসির সঙ্গে সঙ্গেই চোখের কোণ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, বাতাসে নাড়া-খাওয়া পাতার নীচে রৌদ্রে-চিক্কণ শিশিরের ফোঁটা।

এসব তার ইস্কুল-মাষ্টারির প্রথম জীবনের কথা। তখনো তার মন শক্ত হয়নি, শুক্তির মধ্যেকার কাঁচা মুক্তাবিন্দুর মতো একটুতেই চঞ্চল হ'য়ে উঠতো। রাত্রে বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কত রাত্রি পর্যন্ত না সে কেঁদেছে, এখন আর সহজে চোখে জল আসে না। এখন চোখের জল দুঃখের তাপে একেবারে দীর্ঘনিশ্বাসের বাষ্পাকারে বের হয়। এক সময়ে মধ্যরাত্রির অদৃশ্য প্রহরের জন্য যা সঞ্চিত ছিল এখন তা নিরন্তর বাষ্পাকারে উচ্ছ্বসিত—সময় অসময় নেই! পরিমিত চোখের জলের চেয়ে অপরিমিত দীর্ঘশ্বাস কি শ্রেয়ঃ, সুতপা বুঝতে পারে না।

প্রথম যখন সে এখানে এসেছিল, তখন তাকে নিয়ে কানাকানি পড়ে গিয়েছিল, ছোট সহরে ছোট জলাশয়ের মতো একটু আঘাতেই তরঙ্গ-বলয় প্রসারিত হয়ে যায়। তাদের দোষ দিইনে। মাষ্টারণী নামে যে-সব মেয়ের সঙ্গে এরা পরিচিত তাদের চেহারা ও ধরণধারণই স্বতন্ত্র। কোণ-বহুল তাদের মুখমণ্ডল, শীর্ণ তাদের দেহ, তারা যেন সংসার-হর্তুকির শুষ্ক বীচি ; কেউ বা আবার এমন স্থূল যেন গঙ্গাস্নানের যাত্রীর আলগা ক'রে বাঁধা বিসদৃশ বোঁচকা। তাদের কেউ বা প্রগল্‌ভ, আর যারা নীরব তাদের যেন সমাধির স্তব্ধতা। তাদেরি বা দোষ কি? সংসারের ঘাটে ঘাটে ঠোক্কর খেতে খেতে তাদের সুডোল আকৃতি তুব্‌ড়ে তাব্‌ড়ে ওই একরকম হ'য়ে গিয়েছে।

সুতপা তাদের থেকে কত আলাদা!

কাঁচা তার বয়স, কচি তার মুখ, সৌন্দর্যের শুভ্র-শ্রীর উপরে বুদ্ধির চিক্কণতা সদ্যমথিত নবনীতের উপরে রৌদ্রের মতো গড়িয়ে পড়ছে ; চুলগুলি খোঁপায় বদ্ধ, শাড়ী জামা যত কম দামেরই হোক না কেন তার স্পর্শে যেন একটা আভিজাত্য লাভ করে, ছোট্ট জুতোজোড়া দেখে ওর পায়ের লঘুসৌষ্ঠব অনুমান করতে দেরি হয় না। বেশি কথা কয় না অথচ লোকদেখানো নীরবতার ভাণও নেই, অত্যন্ত অপরিচিতের সঙ্গেও অনাড়ম্বর মহিমায় কথা বলতে পারে। আত্মসম্মান রক্ষার সপ্রয়াস বড়াই নেই—ও আপনিই রক্ষিত হয়। সুতপা যেন স্বচ্ছ স্ফটিক জলের উৎস—কত গভীর তা অনুমান করা সহজ নয়।

ইস্কুলের সেক্রেটারি বল্‌লেন,—তুমি একলা থাকবে?

সুতপা সহজভাবে বল্‌ল—আমি তো চিরকালই একলা, ও আমার অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছে।

সেক্রেটারি তাকে বাসা দেখিয়ে দিলেন, চন্দনী নামে ঝি-ও তাঁর স্থির ক'রে দেওয়া।

প্রথম প্রথম মিহির মাঝে মাঝে আসতো। এমন স্থলে একটু কানাঘুষা হ'য়েই থাকে। লোকে ভাবতো এ আবার কে? কিন্তু অপরকে যা মানায় না সুতপার পক্ষে তা যেন অশোভন নয়। লোকের যে কানাকানি দাবাগ্নিতে পরিণত হ'তে পারতো, সুতপার সযত্ন আঁচলের আড়াল তার নিয়ন্ত্রিত জ্যোতিকে গৃহদীপের পদবী দিল। লোকের রসনা ক্ষান্ত হ'ল—কিন্তু তার মনে কি শান্তি ছিল? সুতপা ভাবতো মিহির কি চায়? সে কি ধরা দেবে না? মিহির

মরীচিকার ফসল কেটে গোলা ভরতি করতে চায় নাকি? এমন ক'রে আর কতদিন চলবে? মিহির দু'একদিনের জন্মে আসে আবার চলে যায়—বহুদিন দেখা পাওয়া যায় না—আবার হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত।

আসলে স্তুতপা জানে না যে, পুরুষ দুই জাতের। এক জাতের পুরুষ আছে যারা মেয়েদের হৃদয়ে আগুনের জোয়ার জাগিয়ে দিয়ে চলে যায়, ধরা দেওয়া তাদের স্বভাব নয়; অন্য জাতের পুরুষ চাঁদের মতো পৃথিবীকে আবর্তন করে, ক্রমে তারা পৃথিবীরই এক দূরবিসর্পী অংশে পরিণত হয়, তাদের স্নিগ্ধ আলোক পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে। মিহির প্রথম জাতের পুরুষ। তার সঙ্কেতে নারীচিত্ত আলোড়িত হয়, মথিত হয়, কিন্তু না দেয় সে ধরা, না পারে সে ধরতে। এজন্য তাকে দোষ দেওয়া বৃথা। পূর্বরাগের দীপ্ত অসিকে বিবাহের বক্র খাপের ভিতরে ঢোকানো চলে না। কন্দর্প একবার মহাদেবের বিবাহের ঘটকালি করতে গিয়ে দগ্ধ হ'য়েছিলেন, সেই থেকে প্রজাপতির উপরে তাঁর চিরকালীন বিরক্তি! মিহির যে দেবতার প্রজা তিনি প্রজাপতি নন, কন্দর্প।

স্তুতপার সবচেয়ে অসহ্য শীতের দীর্ঘ রাত্রিগুলো। ছোট শহরে রাত্রির নিশুতি শীঘ্র আবির্ভূত হয়। রাত্রি আটটার মধ্যে খাওয়া সেরে সে ঘরে ঢোকে —চন্দনী যায় তার বাড়ীতে চ'লে। তারপর থেকে তার সুদীর্ঘ নিশি উদ্‌যাপনের পালা। শীতের প্রহর বরফ-জমা নদীর মতো অচল; পাষাণের ভারে তা বুকের উপরে চেপে বসে। স্তুতপা আলোটা উস্কে দিয়ে মাথার কাছে টেনে নেয়—তার পরে লেপের ভিতরে ঢুকে পড়ে একখানা বই খোলে। ওই বই নিয়ে শোয়া তার এক মুদ্রাদোষ—বই সে পড়তে পারে না—তার মন অজানা চিন্তার ধারা বেয়ে ছুটে চলতে থাকে। চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে ঘড়ির দিকে তাকায় কাঁটা দুটো কি চল্‌ছে? এত ধীরে কেন? দেয়ালে টিকটিকি ওৎ পেতে আছে, মাঠের মধ্যে শিয়াল ডেকে ডেকে ওঠে—হঠাৎ জানালার ফাঁকে চোখে প'ড়ে, রেল লাইনের পাশের গাছগুলোর মাথা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল—সাড়ে এগারোটার গাড়ীতে সার্চলাইট। তারপরে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ে—আলোটা জ্বলতে জ্বলতে নিভে যায়। পরদিন চন্দনী এসে বলে—দিদিমণি কেরোসিন যে মেলে না—রাতে অত নাই পড়লে। এমনি প্রতি রাত্রে। শূন্যতার ভার যে এত দুর্বহ তা কি স্তুতপা আগে জানতো!

তার জীবনযাত্রা যখন এমনিভাবে চলছিল—তখন সে এক সঙ্গিনী পেলো। রমা নামে একটি মেয়ে ইস্কুলের সেকেণ্ড টীচার হ'য়ে এলো। সুতপা হেড মিসট্রেস। ছোট জায়গায় অতিরিক্ত বাড়ী পাওয়া সম্ভব নয়। সুতপা রমাকে বলল,—তুমি আমার সঙ্গে থাকো না কেন? রমা রাজী হ'ল। সুতপা তাকে নিজের ড্রয়িং রুমটা ছেড়ে দিল। মিহির দু'একদিনের জন্য এসে পড়লে রমা সুতপার ঘরে রাত কাটাতো। রমার সঙ্গ পেয়ে সুতপার শূন্যতার বোঝা কিছু হাল্কা হ'ল।

রমা সদ্য বি-এ পাশ ক'রে এসেছে—সুতপার চেয়ে প্রায় দশ বছরের ছোট।

মিহির মাঝে এসে একদিন কাটিয়ে গেলো।

রমা বলে—সুতপাদি, তুমি বিয়ে করো না কেন?

সুতপা শুধায়,—বিয়ে করবে কে আমাকে?

বর স্থির ক'রে তবে প্রস্তাব উত্থাপন করতে হবে এমন দায়িত্ব জানলে সে ওকথা কথনোই তুলতো না। তবু সে মনে মনে বলে,—কেন মিহিরবাবু তো আছেন। একবার দেখেই মিহির-সুতপার সম্বন্ধের একটা আঁচ রমা পেয়েছে। এসব জিনিস মেয়েদের চোখ প্রায়ই এড়ায় না।

সুতপা উল্টে প্রশ্ন করে,—তুমি বিয়ে না ক'রে চাকরি করতে এলে কেন?

রমা বলে,—চাকরি আর বিয়েতে তো আড়াআড়ি নেই। করবো।

তারপরে একটু ঝোঁক দিয়ে বলে,—সুতপাদি, আমার বিলেতে যাবার

এবারে সুতপা না হেসে পারে না।

—বিলেতে যাবার সোজা পথ কি হ'ল বিহারের এই ইস্কুলের মাষ্টারি।

সে বলে,—রমা সত্যি যদি বিলেত যাবার ইচ্ছে থাকে—তবে সে পথও হ'তে পারে বাসর ঘরের ভিতর দিয়ে, যদি তেমন তেমন বিয়ে হয়।

সুতপা বুঝ্‌তে পারে, রমা মেয়েটি মনে বয়সে অভিজ্ঞতায় একেবারেই কাঁচা। সংসারের পথঘাট সম্বন্ধে কোন ধারণাই তার নেই। এই জাতের মেয়েরাই বিপদে পড়ে। যে-কোন পুরুষ দুটো মিষ্টি কথা বলে' ওদের বিভ্রান্ত করতে পারে। সে নিজে দুঃখের আগুনে পোড় খেয়ে অনেকটা শক্ত হ'য়েছে—কিন্তু রমাকে আগ্‌লে রাখতে না পারলে বিপদ আছে। সুতপার ঘাড়ে এক নূতন দায়িত্ববোধ চাপে।

মিহির এক মাসের মধ্যে দু'বার এলো। এত ঘন ঘন সে আসে না। সুতপা তাকে বলল,—তুমি এত ঘন ঘন এস না, লোকে নানারকম কথা বলতে সুরু করেছে।

কথাটা সত্য নয়। সুতপার সম্বন্ধে কেউ কখনো কিছু বলেনি, বলা যে চলে তাও কারো মনে হয়নি।

তিন দিন ধরে রমার অসুখ, সে ইস্কুলে যায়নি। ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরে সুতপা দেখ্‌লো—মিহির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। তার মনের মধ্যে বিদ্যুতের মতো খেলে গেলো—এই সুযোগ বুঝেই কি মিহির এসেছে? কিন্তু জানলো কি ক'রে? তবে রমা মিহিরকে চিঠি লেখে না কি?

সুতপা মিহিরকে বল্‌লো,—আজ তোমাকে রাতে থাকতে বলতে পারলাম না।

মিহির বললো—কেন?

—রমার অসুখ, তাকে ড্রয়িং রুম থেকে নড়ানো চলবে না। তোমাকে থাকতে দেবো কোথায়?

মিহির সুতপাকে অবশ্যই চেনে—জানে তর্ক ক'রে তার মত পরিবর্তন সম্ভব নয়। মিহির বিদায় হ'য়ে গেলো। সুতপা লক্ষ্য করলো, মিহির চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রমার মুখ থেকে একটা আলো যেন নিভে গেলো।

রমা বল্‌ল,—সুতপাদি, তুমি মিহিরবাবুকে বিদায় করে দিলে কেন? আমি তোমার ঘরেই শুতাম।

সুতপা বল্‌ল,—না।

যুক্তিতর্কের শৃঙ্খলাহীন ওই মারাত্মক 'না' শব্দটিতে রমা বুঝতে পারলো মিহিরের ঘন ঘন যাওয়া-আসার সঙ্গে রমার উপস্থিতির একটা যোগ সুতপা যেন স্থাপন ক'রে নিয়েছে।

রমা মিহির-সচেতন হ'য়ে উঠল, তারপর থেকে তেমন অনায়াসে আর সে মিহিরের প্রসঙ্গ তুলতে পারতো না।

সুতপার জীবনের শূন্যতার বসনের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ঈর্ষ্যার, অতি সূক্ষ্ম আত্মগ্লানির দুটি সূতোর টানা-পোড়েন ক্রমে যুক্ত হ'য়ে যায়। এসব এমন কথা যার প্রমাণ নাই, অনুমানও বলা চলে না; এ যেন নিজেরই ছায়ায় নিজের ভীড় হ'য়ে ওঠা। অপরের উপরে দোষ দিতে পারলে যে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, সে

সান্ত্বনা-টুকুও নেই এর মধ্যে। মিহির চিঠি লিখলো একবার আসতে চায়। সুতপা লিখে দিল—এখন আসবার প্রয়োজন নেই।

মিহির যে তাকে বিবাহ করবে—এ আশা তার অনেক দিন চলে গিয়েছিল। সে হচ্ছে গিয়ে দুঃখ। আর মিহিরের সঙ্গে রমার যোগাযোগ—সত্যি কি তাই? খুব সম্ভব সেটা কেবল সুতপার অনুমান মাত্র, প্রমাণই হোক্ বা অনুমানই হোক্, সুতপার কাছে তা সত্য। ঈর্ষ্যার সত্য, আত্মগ্লানির সত্য! সেই সত্য তাকে নিরন্তর পীড়িত করতে লাগলো। এ হচ্ছে দুশ্চিন্তা। দুঃখের অন্ত আছে, দুশ্চিন্তার অন্ত কোথায়? এই নূতন দুশ্চিন্তায় সুতপার শরীর ও মন ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে লাগলো। দিনের কাজ বিস্বাদ, রাত্রের নিদ্রা বিষাক্ত, রমার সঙ্গ কাঁটার মতো সূচী-মুখ। কিন্তু তার সব চেয়ে ভয়াবহ সময় রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরগুলো। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হ'য়ে তাকে নিদ্রাকর ঔষধের সাহায্য নিতে হ'ল—আফিঙের আরক দেওয়া ঘুমের ওষুধ।

একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ একটা কোলাহলে তার ঘুম ভেঙে গেল। জানলা খুলে দেখল—তুমুল রবে বাজনা বাজিয়ে, মশাল জ্বালিয়ে একটা শোভাযাত্রা চলেছে, বিয়ের শোভাযাত্রা। একটা খোলা ঘোড়ার গাড়ীতে বর-কনে বিয়ে ক'রে বাড়ীতে ফিরছে। সে মূঢ়ের মতো সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। শোভাযাত্রা চলে যাওয়ার পরে সমস্ত জায়গাটা গভীরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হ'য়ে গেল। সুতপা জানালা বন্ধ ক'রে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লো। তৃষ্ণার্ত পথিক নদীর স্বচ্ছ শীতলধারা দেখতে পেয়েছে!

সুতপা স্থির করলো সে বিবাহ করবে। মিহির যদি সম্মত না হয়—তবে অন্যত্র সে বিবাহ করে ফেল্‌বে। এমন ক'রে দুশ্চিন্তার জাল টেনে আর চলা যায় না। এই সঙ্কল্প করবামাত্র কেমন একটা স্বস্তি বোধ করলো, সে ঘুমিয়ে পড়লো—এমন আরামের নিদ্রা অনেক দিন তার ভাগ্যে জোটেনি।

এদিকে রমার মধ্যেও কেমন যেন একটা পরিবর্তন হ'য়েছে। কিছুদিন থেকে শরীর তার সুস্থ যাচ্ছে না—কিন্তু তাই বলে মনের আনন্দের কিছু অভাব নেই। শীতের রাতের সমস্ত শিশিরবিন্দু গড়িয়ে এসে অশ্বত্থ-পাতার আগটিতে যেমন দুলতে থাকে তার সমগ্র মনটি যেন মুখমণ্ডলে এসে সঞ্চিত হ'য়েছে, প্রতি নিশ্বাসে তা কেঁপে ওঠে। সুতপা ও তার মধ্যে ব্যবহারের যে-আন্তরিকতা আগে ছিল এখন তা আর নেই—ভদ্রতাটুকু অবশ্য আছে। দুপুর বেলা চিঠির

গোছা এলেই তার মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে—সুতপার চোখ তা এড়ায় না, সুতপার চোখ এড়ায়নি এই লজ্জা তাকে দ্বিগুণ লজ্জিত ক'রে তোলে। কিন্তু আশ্চর্যের এই যে, এই সমস্ত লজ্জা, উদ্বেগ, চঞ্চলতা সমস্তর সমষ্টি কিন্তু দুঃখ নয়—কেমন এক রকমের তীব্র উন্মাদনা! অভিজ্ঞতাটা রমার মন্দ লাগে না।

গাড়ীর সময় হলেই রমা আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না—সুতপা লক্ষ্য করে। বাড়ীর বাইরে কারো পায়ের শব্দ শুনলেই তার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের মাথা-কোটা উগ্রতর হয়ে ওঠে—নিজের স্পন্দনে সুতপা রমার স্পন্দন বোঝে; সুতপার হৃৎপিণ্ড বলে, যেন সে না আসে, যেন সে না আসে, আর রমার তালে তালে বাজতে থাকে, আসুক, আসুক, আসুক। রাত্রে পাশাপাশি দুই ঘরে দুইজন শুয়ে থাকে—দুইজনের চিন্তা একই নদীর দুই বিপরীত কূল বেয়ে দুই বিপরীত দিকে গুণ টেনে চলে। আজ দুইজনেই সমান দুঃখী—তবে রমার দুঃখের পাড় দু'খানা উজ্জ্বল, সুতপার দুঃখ নিশ্ছিদ্র।

মিহির অনেকদিন আসেনি। সে রাত্রের অভিজ্ঞতা অনুসারে কাজ করবার জন্যে তার একবার কলকাতায় যাওয়া দরকার। সুতপা ছুটির দরখাস্ত করল। ছুটি অবশ্যই তার মিললো, কিন্তু সবাই বিস্মিত হ'য়ে গেলো—এ আবার কেমন? যে সুতপা ছুটিতে অবধি ছুটি নেয় না,—এখানেই থাকে, তার হঠাৎ এমন কি প্রয়োজন পড়লো!

রমা শুধালো—সুতপাদি, তুমি ছুটি নিচ্ছ?

সুতপা বলল—তোমরা পাড়াসুদ্ধ সবাই এমন অবাক্ হ'য়ে গেলে কেন? আমার কি কোন কাজ পড়তে নেই!

রমা বলল—তা কেন? তবে আমি এসে তোমাকে ছুটি নিতে দেখিনি—তাই একটু অবাক্ লাগছে।

রমার অবাক্ হওয়া উচিত নয়—তার আসার সঙ্গে সুতপার ছুটি নেওয়ার একটা প্রচ্ছন্ন যোগ আছে।

রমা আবার শুধালো—কবে যাবে?

সুতপা একটা শনিবারের উল্লেখ করলো—তখনো তার দশ দিন দেরী।

ইতিমধ্যে সুতপা মিহিরকে খান দুইতিন চিঠি লিখেছে,—উত্তর পায়নি। মন দিয়ে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যেতো—সুতপার মধ্যে কোথায় যেন একটা পরিবর্তন হ'য়ে গিয়েছে। মুখখানা তেমনি সুন্দর আছে—কিন্তু তার উপরে

কেমন যেন একটা স্থির সঙ্কল্পের অস্বাভাবিক দীপ্তি, খোলা তলোয়ারের শাণিত উজ্জ্বলতার মতো!

আজ শনিবার। সুতপার ছুটির দিন। রাত্রের ট্রেনে তার কলকাতা যাত্রার কথা। ইস্কুল থেকে সে একটু আগেই বাসায় ফিরে এল, গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে হবে—রমাকে বাড়ীঘর বুঝিয়ে দিতে হবে—অনেক কাজ বাকি। টেবিলের উপর ছিল একখানা খামের চিঠি, অন্য দিনের মতো স্থিরতা তার থাকলে ঠিকানা দেখে তবে সে খুলতো। চিঠিখানা খুলে ফেলেও তার বিস্ময়ের কোন কারণ হ'ল না। মিহিরের চিঠি। তবে সে এতদিন পরে উত্তর দিয়েছে। মিহির লিখছে যে, সে শনিবার শেষ রাতে যাবে, সে যেন তৈরি থাকে, দু'জনে রওনা হবে জব্বলপুরের দিকে। বিশেষ ক'রে শনিবার স্থির করবার কারণ-স্বরূপ লিখেছে যে, সেদিন মাঝরাতের ট্রেনে সুতপা কলকাতা চলে যাবে, কাজেই এমন সুবিধে আর পাওয়া যাবে না। হঠাৎ নিজের নামটা পড়ে সে চমকে উঠ্‌ল—এ চিঠি তবে কা'কে লেখা? উপরে রমার নাম! তবে সে না জেনে রমার চিঠি খুলে ফেলেছে। কিন্তু ঠিকানাতো মিহিরের হস্তাক্ষর নয়! দুঃখের নূতন জগৎ আবিষ্কারের বিস্ময়ে বসে পড়লো! তবে যা অনুমান করেছিল তা মিথ্যা নয়। অনুমান? এইতো প্রমাণ তার হাতে। দেহের বীভৎস ক্ষতস্থানের দিকে চাইতে যেমন ভয় করে—অথচ না তাকিয়েও থাকতে পারা যায় না—চিঠিখানা নিয়ে সুতপার তেমনি অবস্থা! খানিকটা পড়ে আবার থামে। বটে! দু'জনে পালানোর ব্যবস্থা অনেকদিন থেকেই স্থির—"পাছে তুমি দিনক্ষণ ভুলে যাও, তাই আজ আবার মনে করিয়ে দিলাম!" তা'হলে রমাও তৈরি ওর সঙ্গে পালিয়ে যাবার জন্যে, কিন্তু কই তার মুখ-চোখ দেখে তো সুতপা বুঝতে পারেনি, বুঝতে পারা উচিত ছিল! রমাকে যেমন ভাবা গিয়েছিল তেমন নয় দেখ্‌ছি, বেশ চাপা মেয়ে। চিঠিখানা নিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে সে শুয়ে পড়লো, দরজা দিতে ভুললো না। চিঠিখানা পড়তে পড়তে সে এক রকম হিংস্র-উল্লাস অনুভব করতে লাগলো। এই একখানা চিঠির আঘাতে সে রমা ও মিহির দু'জনকেই ধরাশায়ী করতে পারে। মাত্র দু'জন? সব চেয়ে বেশী আঘাত যে পেয়েছে তার নাম কি সুতপা রায় নয়? "আমি পিছনের দিকের প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবো—তুমি তোমার ঘরের সম্মুখের দরজা দিয়ে না বেরিয়ে বেরুবে পিছনের দরজা দিয়ে—উঠোনের দিকে।

ঘড়িতে চারটার এলার্ম দিয়ে রেখো।" ওঃ, ক্যাম্পেনের প্ল্যানে কোথাও খুঁত নেই যে! মিহির লিখছে, তার পরে দু'জনে পালিয়ে যাবে জব্বলপুরে—সম্মুখে অনন্ত পৃথিবী, অবাধ আকাশ। সুতপার মনে হ'ল—ইস্ একেবারে রোমিও জুলিয়েট আর কি! তার মনের মধ্যে শত-সহস্র স্বতোবিরুদ্ধতার স্রোত প্রবল আবর্ত সৃষ্টি করে পাক খেতে লাগ্ল। কিন্তু রোমিওর আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল—এমন গোপনীয় কথা এরকমভাবে চিঠিতে লেখা উচিত হয়নি। এই দেখ না কেন আমার হাতে পড়ে গেল! এখন যে ইচ্ছা করলে তোমাদের সব প্ল্যান মাটি করে দিতে পারি! তবে অনেকদিন থেকে দু'জনে চিঠি-পত্র চলছে। রমার ক্লাসে একটি ছোট ছেলে পড়তো, তার নাম মিহির। এখন সুতপার মনে পড়লো সেই নামটি ধরে ডাকবার সময়ে রমার গলা এমন কাঁপতো কেন? নাঃ, মিহিরটা এমন নীচ? আর রমাই বা কি সাধু? যাই বলো এমন ডুবে-ডুবে জলখাওয়া মেয়ে দেখতে পারিনে। কিন্তু এমন লুকোচুরির কি প্রয়োজন ছিল? খোলাখুলি সকলকে বলে ক'য়ে কি তারা যেতে পারতো না? ঠেকাতো কে? তখনি আবার তার মনে পড়্ল—এমন গোপনীয়তার পথ বিচারের পথ নয়। সে স্পষ্ট রমার সর্বনাশ চোখের উপরে দেখতে পেলো। তখনি তার মনে হ'ল রমাকে এই সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে হবে। আর মিহিরের প্রতিও কি তার কোন দায়িত্ব নেই? মিহির যে অন্যায় করতে যাচ্ছে—তার পথে বাধা রচনা করাই কি সুতপার কর্তব্য নয়? সুতপা যদি প্রকৃতিস্থ বুদ্ধিতে নিজের মনটাকে বিশ্লেষণ করতো তবে দেখতে পেতো রমা বা মিহির কারো প্রতি কর্তব্যেই সে উদ্বুদ্ধ হয়নি। দারুণ ঈর্ষ্যায় তার মন আলোড়িত হচ্ছে। কিন্তু নিজের দুর্বলতা সে স্বীকার করবে কেন? তাই কর্তব্যবুদ্ধির খাতে নিজের ঈর্ষ্যাকে প্রবাহিত ক'রে দিয়ে সে এক প্রকার আত্ম-প্রসাদের স্বাদ অনুভব করলো। নিজের ঈর্ষ্যাকে স্বীকার করলে সে খাটো হয়ে পড়ত—অপরের প্রতি কর্তব্যের দায়িত্বে নিজেকে হঠাৎ মহৎ বলে মনে হ'ল। কিন্তু রমাকে বাঁচাবার উপায় কি? তাকে সব কথা খুলে বলবে? সুতপার তখনো এটুকু প্রকৃতিস্থতা ছিল যাতে সে বুঝতে পারলো এসব কথা এমন সময়ে এমন ভাবে খুলে বল্লে—কেউ বোঝে না, বুঝতে চায় না, বুঝতে পারে না। তাতে কোন ফল হবে না—বরঞ্চ উল্টো ফল হবে।

কিন্তু যেমন করেই হোক রমাকে বাঁচাতে হবে, তাতে মিহিরকেও বাঁচানো

হবে। তখন অপর কেউ সুতপাকে দেখলে ভাবতো সে নিশ্চয় পাগল হবার মুখে। তার হাতের আঙ্গুলগুলো বারংবার চঞ্চল হ'য়ে উঠছে—যেন অদৃশ্য কোন একটা বস্তুকে নিষ্পেষণ করছে, চোখ হয়ে উঠেছে লাল, কপালের শিরা প্রহৃত তন্ত্রীর মতো লাফাচ্ছে, চুল এলোমেলো, বক্ষের বিস্ফোরণ-সঙ্কোচনে ব্লাউসটা কম্পিত। ভাগ্যিস, বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না—না চন্দনী, না রমা।

এমন সময়ে চন্দনী এসে ডাকলো, দিদিমণি ওঠো, জিনিসপত্র গোছাতে হবেনি!

সুতপা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে চিঠিখানা বুকের ভিতর জামার ফাঁকে রাখলো এবং মুখে চোখে জল দিয়ে চেহারায় অনেকটা সুস্থভাব আনলো।

চন্দনী ঘরে ঢুকে অবাক্ হ'য়ে গেল—একি দিদিমণি, এখনো তোমার জিনিসপত্র গোছানো হয়নি!

সুতপা বলল—আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, এখনি গুছিয়ে নিচ্ছি।

রমা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে সুতপার জিনিসপত্র গোছানোতে সাহায্য করতে লেগে গেল। সুতপা স্থির করেছিল যে, এখন আর আলোড়নের পাকে নিজেকে ক্ষুব্ধ করবে না। তার সঙ্কল্প স্থির হ'য়ে গিয়েছে। সমস্ত সঙ্কল্পের মধ্যেই একটা শান্ত মহিমা আছে—সেই শান্তি তাকে ধৃতি দিয়েছে। জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিয়ে, হ্যাঁ, জিনিসপত্র সঙ্গে নিতেই হবে, সুতপা যাত্রার আয়োজন স্থির করে ফেল্‌ল। কিন্তু রওনা হ'বার এখনো অনেক দেরি—রাত দশটায় গাড়ি।

রমা শুধালো—সুতপাদি, কবে ফিরবে?

সুতপা বল্‌ল—বেশি দেরি হবে না। মনে মনে সে হাসলো—রমা জানে না যে, তার সমস্ত প্ল্যান সুতপার হাতের মুঠোর মধ্যে।

রাত্রের আহার সেরে নিয়ে, সুতপা আর একবার মনে মনে হাসলো, এত দুঃখের মধ্যেও তাকে আহারের ভান করতে হল! বিছানা সুটকেস একটা মুটের মাথায় চাপিয়ে সে ষ্টেশনে যাত্রা করলো। রমা সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, সুতপা তাকে সঙ্গে নিল না। বাড়ির সমুখের দরজা বন্ধ ছিল। খিড়কি দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। খিড়কির একটা চাবি চন্দনীর কাছে থাকে, সে আসে খুব ভোর বেলা, আর একটা চাবি থাকতো সুতপার কাছে।

সুতপা যখন ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হ'ল—তখনো গাড়ির অনেক দেরি।

সে সেকেণ্ড ক্লাস ওয়েটিং রুমে বিছানা রেখে একখানা আরাম কেদারায় গিয়ে বস্‌ল, টিকিট কিনবার কোন তাগিদই অনুভব করল না। সেই নির্জন ওয়েটিং রুমে আবার সে নিজের অবস্থা ভাববার অবসর পেলো। বাইরে জনতার কোলাহল, গাড়ির শব্দ, লাল নীল আলো, সমস্তই যেন আর এক জগতের ব্যাপার। যে-নৌকো ডুবতে বসেছে তীরের চিহ্ন তার কাছে মরীচিকা ছাড়া আর কি! অনেকক্ষণ বসে থেকে সে বাইরে বেরিয়ে এলো। ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় আকাশ ও পৃথিবী রহস্যময়। সে প্ল্যাটফর্ম্ম ছেড়ে নীচে নেমে রাস্তা ধরে চলতে সুরু করল। কিছুক্ষণ চলবার পরে ষ্টেশনের সীমানা ছাড়িয়ে একটা শালবনের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। একদিকে এই শালবন, ওপারে শহর, যে শহরের মধ্যে তার বাড়ি—মাঝখানে রেলপথ।

বনের মধ্যে একটা গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়ে সুতপা বসলো। মাটিতে গাছের ছায়া পড়েছে—কালো কালো ধ্বসে পড়া স্তম্ভশ্রেণীর মতো, কার কল্পনার ইন্দ্রপ্রস্থপুরী যেন ভূমিকম্পে ধ্বংস হ'য়ে গিয়ে ধূলোয় লুটোচ্ছে, সেই ধ্বংসাবশেষের মায়ার মধ্যে বিমূঢ়ের মতো সুতপা বসে রইলো। শালের ফুল সব ফুটতে সুরু করেছে—ক্ষীণ জ্যোৎস্নার সঙ্গে সেই ক্ষীণ সুগন্ধ অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশ্রিত, চোখের জ্যোৎস্না আর ঘ্রাণের সৌরভ একেবারে এক হ'য়ে গিয়েছে; অবিরাম ঝিল্লির তালে তালে জোনাকিগুলো চমকাচ্ছে; হাওয়ায় শুকনো পাতা শিরশির করে নড়ছে, আর নিস্তব্ধতার আঁচলে বেষ্টিত সুতপা নিস্তব্ধ।

সুতপার মনে পড়লো ছেলেবেলায় তার মা সুতপা নামের ব্যাখ্যা করে বল্‌তেন—মেয়ে আমার আর জন্মে উমার মতো অনেক তপস্যা করেছিল, তাই নাম পেয়েছে সুতপা, এজন্মে বর পাবে মহাদেবের মতো। তার মনে হ'ল—মা থাকলে দেখতো তার কথাই সত্যি হ'তে চলেছে—সে মৃত্যুঞ্জয়কে ছাড়া আর কাউকে বরণ করবে না। একবার তার বিস্ময় বোধ হল—এই কি তার জীবনের শেষরাত্রি! আর একটু পরেই কি তার অস্তিত্ব থাকবে না? তার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা কি ছায়ার প্রাসাদের মতোই ধূলোয় লোটাবে না? যে প্রাণ-স্ফুলিঙ্গ মির্মিরিত হচ্ছে ওই জোনাকি-জালের মতো, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ওই জোনাকিগুলোর চেয়েও মিথ্যে হয়ে যাবে! জলমগ্নের অন্তিম দৃষ্টিতে পৃথিবী যেমন সুন্দর দেখায় তেমনি সুন্দর মনে হ'ল পৃথিবীকে। কিন্তু

তৎসত্ত্বেও সে কেমন এক অনাস্বাদিতপূর্ব শান্তি অনুভব করলো। তখনি তার মনে হ'ল—মৃত্যুর উপকূলের এই শান্তি কি সেখানে আরও গভীর হয়নি।

হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল রাত্রি নিশ্চয় অনেক হয়েছে, বাতাস বেশ শীতল। সে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে পড়লো। সে আর ষ্টেশনের দিকে গেল না। —রেল লাইন পার হ'য়ে সোজা বাড়ির দিকে চল্‌ল। চারিদিক নির্জন, কলকাতাগামী ট্রেন অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে। পথে লোক নেই, একটা কুকুর একবার ডেকে উঠে থেমে গেল, অদূরে রেলের ভারি আলো হাতে একটা লোক চলে গেল—আলোর গোলাকার দাগ পড়লো মাটিতে, বাতাসে টেলিগ্রাফের তারের শনশনানি, খটাৎ ক'রে শব্দ হ'য়ে সিগন্যালে আলোর রং বদলালো, অন্ধকারের লেবু ফুলের করুণ গন্ধ, চাঁদ প্রায় ডুবলো বলে'।

সুতপা এসে দাঁড়ালো তার বাড়ির খিড়কি দরজার সমুখে। কান পেতে শুনলো সাড়াশব্দ নেই। একবার পৃথিবী আর আকাশের দিকে তাকিয়ে নিয়ে খট্‌ করে তালা খুলে ভিতরে ঢুকলো, তারপরে দরজা দিল বন্ধ করে। তখন চাঁদ অস্ত গিয়েছে।

রমার এলার্ম ঘড়ি বেজে উঠল। রমা লাফিয়ে উঠে দেখে রাত্রি চারটা। হঠাৎ তার মনে পড়ল না, কেন এই জাগরণ। তারপরে ধীরে ধীরে যেন তার সব কথা মনে পড়তে লাগলো। সব তার গোছানোই ছিল—ছোটো একটা ব্যাগের ভিতরে টুকিটাকি পুরে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। একবার তপ্তশয্যা, বহুদিনের ঘরটির দিকে তাকিয়ে তার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো। জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলো—তখনো পূব আকাশে রঙ ধরেনি।

পা টিপে টিপে এসে সে দরজার খিল খুলে ফেলে ধাক্কা দিল, কিন্তু দরজা খুললো না। ঘুমের চোখে ছিটকিনি খুলতে ভুলে গিয়েছে ভেবে খোলা ছিটকিনি আবার খুল্‌ল। আবার দরজায় ধাক্কা দিল—কিন্তু তবু দরজা খুল্‌ল না। এ আবার কি? ওদিক থেকে তবে কেউ কি দরজা বন্ধ করে দিয়েছে? তার মনে পড়লো কাল নিজে সে সুতপা ও চন্দনীকে বার ক'রে দিয়ে খিড়কি এঁটে দিয়েছে। তবে? আবার দরজায় ধাক্কা দিল। মনে হ'ল বাইরে থেকে কেউ যেন দরজা চেপে বসে রয়েছে। কে? তার শরীর কেঁপে উঠল। তার মিলনের অব্যবহিত এই মুহূর্তে বাধা এলো কোন্ সূত্র ধরে? নানা আশঙ্কায় তার মন চঞ্চল হ'য়ে উঠল। তার মনে পড়লো মিহির অপেক্ষা

করছে ষ্টেশনের পথে—ভোরের আলো হবার আগেই ট্রেনে উঠতে হবে। এবারে সে প্রাণপণে ঠেলা দিল—দরজা ঈষৎ ফাঁক হ'ল। যাক্, তবে বাইরে থেকে কেউ দরজা বন্ধ করেনি, সে খানিকটা স্বস্তি অনুভব করলো। দরজা একটু ফাঁক হ'ল কিন্তু না খোলার কারণ বুঝতে পারা গেল না—বাইরে অন্ধকার। রমা টর্চের আলো ফেল্‌ল—কালো কালো ওকি? কোন রকমে আঙুল চালিয়ে অনুভব করলো—মানুষের চুল নাকি? না তা অসম্ভব। কিন্তু দরজা তো আর খোলে না। মনে হ'ল—কি যেন, কে যেন দরজা চেপে বসে রয়েছে। কি? কে? কেন? কিন্তু ভোর হ'বার আর বিলম্ব নেই—যেমন করেই হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সে মূঢ়ের মতো দরজা ঠেলাঠেলি করতে লাগলো —চুল খুলে গেল, কাপড় শিথিল হলো—কপাল থেকে তার ঘাম ঝরতে আরম্ভ করল।

অনেক ঠেলাঠেলির পরে দরজা দু'চার ইঞ্চি ফাঁক হ'ল—তখন আকাশেও একটু আলো হয়েছে। রমার মনে হ'ল কে যেন প্রাণপণ শক্তিতে দরজা ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে। তার কম্পিত কণ্ঠ থেকে প্রশ্ন হ'ল—কে? নিজের বিকৃত স্বরে সে নিজেই চমকে উঠল।—কে? উত্তর নেই। এবারে টর্চ ফেলতেই তার চোখে পড়ল শাড়ীর পাড়। পরিচিত শাড়ী। সুতপার শাড়ীর পাড়। —তবে কি সুতপাদি সব জানতে পেরেছে? রমা সুতপার নাম ধরে ডাক্‌লো —কোন সাড়া নেই। এবারে ভালো ক'রে আলো ফেলতেই দেখতে পেলো সেই নারীমূর্তির ডান হাতে একখানা চিঠি, পাশে গড়াচ্ছে একটা ওষুধের শিশি। রমা মরিয়া হ'য়ে উঠেছে—এবারে ধাক্কা দিতে দরজার একখানা পাল্লা খুলে যেতেই একটি অসাড় নারীদেহ মাটিতে পড়ে গেল—রমা দেখল—সুতপার প্রাণহীন দেহ।

রমা একটা অর্ধস্ফুট শব্দ করে মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে গেল। চৌকাঠের দু'দিকে দুই নারীদেহ লম্বিত, মৃতপ্রায় ও মৃত।

সুতপার সঙ্কল্প সার্থকতায় পৌঁছেছে, দুর্গতির হাত থেকে রমাকে রক্ষা করবার জন্যে সর্বনাশের দ্বার রুদ্ধ ক'রে সে আত্মবিসর্জন করেছে। রমা ও মিহিরকে সে বাঁচিয়েছে—কিন্তু নিজে বাঁচলো কি?

শকুন্তলা

অতীশ ও মালতী এইমাত্র হিন্দু বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ-পর্ব সমাধা করিয়া বাসর-ঘরে আসীন হইয়াছে। বন্ধুরা ফুলের মালা, ফুলের তোড়া দিয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। অতীশ হাসিতেছে, মালতী নতমুখী। এইখানে আমাদের গল্পের শেষ, আরম্ভটা অনেক আগে—আর অন্যত্রও বটে। বঙ্গোপ-সাগরে আসিয়া যে-জলধারার সমাপ্তি, তাহার সূত্রপাত হিমালয়ের দুর্গম শিখর-মালার অরণ্যে। আমাদের এবার সেই তুষারিক নির্জনতায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।

সাঁওতাল পরগণার পরিজ্ঞাত শহরগুলি রুগ্ন স্বাস্থ্যান্বেষীদের নিশ্বাসবিষে কলুষিতপ্রায় হইয়া উঠিলেও, এখনও অম্লানবায়ুস্থানের সেখানে অভাব নাই। এই স্থানগুলি রেলষ্টেশনের পরিধির মধ্যে পড়ে না—তাই জনসমাগম নাই বলিলেই হয়। বিশুদ্ধ বাতাহারী বায়ুগ্রস্তদের কেহ কেহ দু'চারখানা বাড়ীঘর তৈয়ারি করিয়াছে এইমাত্র। বায়ু এখানে নিষ্কলুষ হইলেও শুধু বায়ুতে মানুষের জীবন চলে না। দূরবর্ত্তী শহর হইতে প্রাণধারণের অন্য সব সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া নিতান্ত বাতাশ্রয়ী ব্যক্তি ছাড়া কেহ এখানে ইচ্ছা-সুখে বড় আসে না। অতীশ সেই বায়ুমার্গীয় লোকেদের অন্যতম। সে তাহার পরিচিত এক ব্যক্তির বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। স্থানটির নাম জোড়া-মউ।

বন্ধুরা শুধায়—মানচিত্রে এত স্থান থাকিতে এমন তেপান্তরের মাঠে কেন?

অতীশ বলে—কলিকাতার বহুজনীয়তার প্রতিষেধক এই স্বল্পজনীয় তেপান্তরের মাঠ।

বন্ধুরা আবার বলে—তবে তেপান্তরের উপমাটা পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোল না কেন? রাজকন্যা কি জুটিল?

অতীশ হাসিয়া বলে—এখনও জোটে নাই বটে, তবে জুটিতে কতক্ষণ?

এপারের উচ্চ ভূখণ্ডে জোড়া-মউ। ওপারের উচ্চতর ভূখণ্ডে মদন-কোঠা,

মাঝখানে স্ফটিকজলের জয়ন্তী নদী। নদীর ধারে অনেকটা স্থান জুড়িয়া শাল, হর্তুকি, মহুয়ার বন।

অতীশ নিত্যকার মতো প্রাতভ্রমণে বাহির হইয়াছে। শরৎ কালের মাঝামাঝি। বৃষ্টিবাদল কাটিয়া গিয়াছে—অথচ শীতের প্রভাব এখনো পড়ে নাই—ঘাসের ডগায় ডগায় শিশিরবিন্দু ঝলমল-করা সকালবেলা; দিগন্তে কুয়াশার ছোপ লাগিয়াছে—অথচ আকাশের নির্মল নীলে স্বচ্ছতম মেঘের অন্যতম চিহ্নও নাই। নিখিল প্রকৃতি সদ্য-খনিত কুমারী সরসীর মতো কূলে কূলে পূর্ণ—এখনও তাহাতে প্রথম কলসটিও ডুবানো হয় নাই। অতীশ এই পূর্ণতার মধ্যে নিজেকে প্রতিদিন প্রভাতে একবার নিমজ্জিত করিয়া লয়।

এমন সময়ে সে চমকিয়া উঠিল—কে যেন খিলখিল করিয়া হাসিতেছে? এখানে এই নির্জনতায় হাসিতেছে কে? না গৃহকার্যে নিরত দিগ্বালার হাতের রেশমী চুড়ি নাড়া খাইয়া বাজিয়া উঠিল? অতীশ উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ক্রমে তাহার কাণে মানবকণ্ঠ—মানবী-কণ্ঠ বলিলেই যথোচিত হয়, প্রবেশ করিল।

একটি কণ্ঠ বলিল—ভাই, আমার গায়ের চাদরখানা একটু জড়িয়ে দাও না।

অপর কণ্ঠ বলিল—মালতী দি, তোমার চাদরখানা না হয় খুলেই রাখো।

অতীশ বুঝিল কণ্ঠাধিকারিণীদের অন্যতমার নাম মালতী। কিন্তু কোথায় তাহারা? সে আর একটু অগ্রসর হইতেই রহস্যভেদ হইল। বন্ধুর তরঙ্গায়িত ভূমির দুই তরঙ্গের মধ্যস্থিত উপত্যকায়, নদীর তীরে, শাল-মহুয়া বনের পাশে কয়েকটি মেয়ে চড়িভাতির আয়োজনে ব্যস্ত। অতীশ উচ্চভূমি হইতে তাহাদের দেখিল—তাহারা নীচু হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল না। অতীশ ভাবিল—এ যে মহুয়া বনের শকুন্তলা। যদিচ নদীটার নাম মালিনী নয়—তবু সমীচারিণী শকুন্তলার সঙ্গে ইহাদের তেমন প্রভেদ নাই। সে এমন এক স্থানে বসিল, যাহাতে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়—অথচ তাহারা অতীশকে দেখিতে না পায়।

একটি নারীকণ্ঠ বলিল—ভাই, এ যে তেপান্তরের মাঠ, তার উপরে কাছেই বন, হঠাৎ একটা বুনো ভালুক এসে পড়লে কে রক্ষা করবে?

অপর কণ্ঠ তাহার উত্তরে বলিল—তেপান্তরের মাঠ হ'লে তেপান্তরের রাজপুত্রও নিশ্চয় আছেন—রক্ষা করবার ভার তাঁরই উপরে—'কেন না রাজারাই আশ্রমের রক্ষক।'

অতীশ বুঝিল ইহাদের পরিচয় যাহাই হোক, শকুন্তলা নাটকখানা ইহারা ভালো করিয়াই পড়িয়াছেন। মেয়েগুলি শিক্ষিতা। অতীশ বসিয়া রহিল—দেখা যাক, নাটক আর কত দূর গড়ায়।

এমন সময় নারীকণ্ঠসমূহ ভীত কোলাহল করিয়া উঠিল। অতীশ ভাবিল এতগুলি কণ্ঠ আসিল কোথা হইতে? মেয়ে তো ছিল গুটিতিনেক। কণ্ঠস্বর শুনিয়া মেয়েদের কণ্ঠসংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নহে।

কোন কণ্ঠ বলিল—ভালুক।

কেহ বলিল—বাঘ।

কেহ বলিল—বুনো শূয়োর।

সকলেই বলিল—কে আছ গো—বাঁচাও।

অতীশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল—ব্যাপার কি? সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সে হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। সাঁওতালদের গোটা কয়েক পোষা শূয়োর মেয়েদের দিকে আসিতেছিল—মেয়েদের কোলাহলে ভীত হইয়া এক্ষণে পলাইতেছে—বাঘও নয়, ভালুকও নয়, তবে শূয়োর বটে, কিন্তু বন্য নয়।

মেয়েদের কোলাহল তবু থামে না। তখন অতীশের মনে হইল—একবার অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহাদের অভয় দেওয়া উচিত।

সে চীৎকার করিয়া উঠিল—ভয় নাই, আমি আছি—এবং তখনই নীচের দিকে ছুটিয়া চলিল।

নিকটেই রক্ষককে দেখিয়া মেয়েদের সাহস ফিরিয়া আসিল। তাহারা বলিল—আমরা একটু ঠাট্টা করছিলাম—ভয় পাবো কেন?

কিন্তু তাহাদের কম্পমান শরীর ও ভূলুণ্ঠিত চাদর অন্যরূপ সাক্ষ্য দিতেছিল।

অতীশ পুনরায় বলিল—ভয় নাই, আমি আছি।

* * * *

রাজা। ভয় নাই, ভয় নাই……

শকুন্তলা। আঃ, এই দুষ্ট মধুকর এখনও নিবৃত্ত হইতেছে না, আমি এখান হইতে অন্যত্র যাই।

রাজা। দুর্বিনীতের শাসনকর্তা পুরুবংশীয় রাজার শাসনকালে সরলহৃদয়া তাপসবালাদিগের প্রতি এইরূপ অসদ্ব্যবহার করে, এমন সাধ্য কাহার?

অনসূয়া। আর্য্য! কোনরূপ বিপদ ঘটে নাই। আমাদের এই প্রিয়সখী মধুকর কর্তৃক আকুল হইয়া কাতর হইয়াছেন।

রাজা। অয়ি, আপনার তপস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তো?

অনসূয়া। এখন বিশিষ্ট অতিথি লাভে তপস্যা বর্ধিত হইল। শকুন্তলে! তুমি শীঘ্র কুটীর হইতে ফল ও অর্ঘ্যপাত্র আনো, এই ঘটের জল পাদোদক হইবে।

রাজা। আপনাদের মিষ্ট সম্ভাষণেই আমার আতিথ্য হইয়াছে।

প্রিয়ম্বদা। তবে এই ছায়া-শীতল সপ্তপর্ণ-বেদিকায় মুহূর্তকাল উপবেশন করিয়া পরিশ্রান্তি দূর করুন।

রাজা। তোমরাও এই জল-সেচন কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া নিশ্চয়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছ।

অনসূয়া। শকুন্তলে! অতিথির অভিপ্রায় মতো কার্য করা আমাদের কর্তব্য। অতএব এসো, আমরাও উপবেশন করি।

শকুন্তলা। (স্বগত) এই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে আশ্রমবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে কেন?

*   *   *   *

অতীশ বলিল—আপনারা খুব ভয় পেয়েছিলেন, না?

একটি মেয়ে বলিল—না, না, আমরা ঠাট্টা করছিলাম।

অতীশ শুধাইতে পারিত—কাহার সঙ্গে! কিন্তু তৎপরিবর্তে শুধাইল—তা হবে—কিন্তু লোকে শুনলে ভয় পেয়েছিলেন বলেই মনে করবে।

অতীশ দেখিল মেয়েরা চড়িভাতি করিতে আসিয়াছে—হাঁড়িকুঁড়ি, চাল-ডাল রহিয়াছে। সে বলিল—যাই হোক, এত সকালে একলা আপনাদের এমন নির্জন স্থানে আসা উচিত হয়নি।

একতমা বলিল—ঠাকুর-চাকর আমাদের সঙ্গে আছে—তারা এখনো এসে পৌঁছয়নি।

ইহা শুনিয়া সে বলিল—তবে তো রক্ষক আপনাদের সঙ্গেই আছে। আর যদিই বা না থাকতো তবু ভয়ের কারণ নেই—যেহেতু এখানকার বনে বাঘ-ভালুক তো দূরের কথা, একটা শিয়াল পর্যন্ত নেই। ইতস্ততঃ পোষা শূয়োর থাকা বিচিত্র নয়। তবে কারো কারো ভয় পাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

কথাটা বলিয়াই সে বুঝিল—মন্তব্যটা একটু রূঢ় হইয়া গিয়াছে। নিজের ত্রুটি সারিয়া লইবার উদ্দেশ্যে সে বলিল—তবে আমি এখন আসি।

এবারে যে মেয়েটি কথা বলিল—তাহার নাম মালতী। মালতী বলিল—কিন্তু আপনাকে না খেয়ে যেতে দিচ্ছে কে?

অতীশ মৃদু আপত্তি করিল। কিন্তু তাহার স্বরে বুঝিতে পারা গেল, না খাইয়া এবং খুব সম্ভব খাওয়ার পরেও তাহার যাইবার ইচ্ছা আদৌ নাই।

অপরাহ্ণে আহারাদি শেষ হইলে মেয়েরা বিদায় লইবার আগে অতীশের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইল যে, সে তাহাদের আশ্রয়ে একবার গিয়া দেখা দিয়া আসিবে।

অতীশ তার পরদিনই সেখানে গেল এবং তার পরদিন এবং তার পরদিন এবং জোড়া-মউতে সে যতদিন ছিল প্রতিদিন একবার করিয়া গেল। সেবারে জোড়া-মউ হইতে কলিকাতায় ফিরিতে তাহার অনেক দেরী হইল।

অতীশের প্রমুখাৎ মেয়ে তিনটির যে ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—তাহাই বলিব—আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার একান্ত অভাব।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, জোড়া-মউর অপর পারে, জয়ন্তী নদীর ধারে, মদন-কোঠা। সেখানে মিশনারিদের একটি বালিকা-বিদ্যালয় আছে। আশে-পাশের সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্যই ইস্কুলটি স্থাপিত। মেয়ে তিনটি সেই ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী—মালতী হেড-মিসট্রেস্। এখন পূজার ছুটি উপলক্ষ্যে ইস্কুলটি কয়েক দিনের জন্য বন্ধ। সামান্য কয়েক দিনের ছুটি বলিয়া তাহারা বাড়ী যায় নাই। সেদিন সকালে তাহারা পূর্বোক্ত স্থানে চড়িভাতি করিতে আসিয়াছিল।

মেয়ে তিনটির একতমার নাম মালতী, অপর দু'জনের নাম রমা ও বিনতা। কাল তাহাদের ইস্কুল খুলিবে, অতীশেরও কাল কলিকাতা রওনা হইবার কথা। আজ মালতীর নিমন্ত্রণে সে চা খাইতে আসিয়াছে।

ইস্কুলটি ছোট, একপাশে শিক্ষয়িত্রীদের বাসের স্থান, চারদিকে ফুলের বাগান আর শাল, মহুয়া, অর্জুন ও সেগুনের গাছ। এই গাছগুলির জন্যই জোড়ামউ হইতে ইস্কুলটি দেখা যায় না—নতুবা মাঠের মধ্যে দেখা না যাইবার কথা নয়।

মালতীর ঘরের বারান্দায় চৌকি ও টেবিল পাতা। টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম ও খাদ্য। মালতীরা তিনজন ও অতীশ ছাড়া আর কেহ নাই। চারজনের

মধ্যে আজ গল্পগুজব খুব জমিয়া উঠিয়াছে—তার মধ্যে অতীশ ও মালতীই বেশী মুখর। সে কি কাল বিদায়ের দিন বলিয়া, না বিদায়ের ব্যথাকে চাপা দিবার জন্যই? মধ্য-সমুদ্রে ঢেউ নাই—উপকূলের কাছেই তরঙ্গের বিক্ষোভ।

চা-পান শেষ হইলে অতীশ বলিল—চলুন, সকলে মিলে একটু বেড়িয়ে আসা যাক। 'সকলে মিলে' বলিলেও সে মনে মনে আশা করিতেছিল 'সকলে' তাহার অনুগমন করিবে না। প্রেমের ব্যাকরণে 'দ্বিবচনেই' চরম, বহুবচন বলিয়া কিছু নাই।

তাহারা চারজনেই বাহির হইল বটে—কিন্তু দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই রমা ও বিনতা পিছাইয়া পড়িয়াছে, অতীশ ও মালতী একটি ভূ-তরঙ্গের আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সমস্ত প্রান্তরখানা এক জায়গায় আসিয়া হঠাৎ ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে—তাহার নিম্নতম অংশে জয়ন্তী নদীর বালুশয্যা দেখা যায়, সেখান হইতে জমি আবার উঁচু হইতে হইতে দিগন্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে—দিগন্তের ধারে ঝাপসা বনরেখা। অতীশ ও মালতী সেই উপত্যকার প্রান্তে বসিল।

মালতী শুধাইল—কাল তা'হলে নিশ্চয় যাচ্ছেন?

অতীশ বলিল—হাঁ। আপনিও একবার কলকাতায় চলুন না কেন?

মালতী বলিল—ছুটি কোথায়? তার চেয়ে আপনার আসাই তো সহজ।

অতীশ বলিল—বড়দিনে আসবার চেষ্টা করবো।

অতি তুচ্ছ সব কথা। মহৎ কথার সূত্র তুচ্ছ কথা—সামান্য বনলতার সূত্রে যেমন বকুলের মালা গাঁথা। কিন্তু এক সময়ে এই তুচ্ছ কথাও থামিয়া গেল। বাতাস পড়িয়া গেলে বুঝিতে পারা যায় এইবার বৃষ্টি নামিবে।

কিছুক্ষণ দুইজনে নীরব। হঠাৎ অতীশ বলিয়া বসিল—মালতী, তোমাকে আমি ভালবাসি। মালতী কোন উত্তর না দিয়া আঙ্গুল দিয়া আঁচলের প্রান্ত বারংবার জড়াইতে ও খুলিতে লাগিল।

—আঃ, কাপড়খানা নষ্ট করে ফেললেন যে! বলিয়া অতীশ মালতীর অপরাধী হাতখানাকে নিজের হাতে বন্দী করিল। সত্যই কাপড়খানার প্রতি তাহার গভীর দরদ!

*　　*　　*　　*

শকুন্তলা। আমাকে একাকিনী ফেলিয়া সখীরা যে সত্য সত্যই প্রস্থান করিল।

রাজা। সুন্দরি! তোমার শুশ্রূষার জন্য আমিই তোমার সখীদের স্থান অধিকার করিলাম। এখন কি করিতে হইবে?

শকুন্তলা। সম্মানিত ব্যক্তির নিকট নিজেকে অপরাধী করিতে আমার বাসনা নাই। [প্রস্থানের উদ্যোগ]

রাজা। সুন্দরি! দিবাভাগের সন্তাপ এখনো সম্যক্ দূর হয় নাই—এখন তুমি কি প্রকারে গমন করিবে?

শকুন্তলা। ছাড়ুন, ছাড়ুন, আমাকে ধরিবেন না।

রাজা। ধিক্, বড়ই লজ্জা পাইলাম।

শকুন্তলা। আমি মহারাজকে কিছুই বলি নাই, আপনার দৈবকে নিন্দা করিতেছি মাত্র।

রাজা। নিজের ইষ্টসাধন কেন না করি? [নিকটে গিয়া শকুন্তলার অঞ্চল ধারণ করিলেন।]

শকুন্তলা। হে পৌরব! বাসনা পূর্ণ না করিলেও ঐই অভাগিনী শকুন্তলাকে ভুলিবেন না।

নেপথ্যে। চক্রবাক্-বধূ। আপনার সহচর চক্রবাকের সহিত সম্ভাষণ কর; ঐ দেখ, রাত্রি সমাগত।

শকুন্তলা। আর্যপুত্র! আর্যা গৌতমী এই দিকে আসিতেছেন।

* * * *

এমন সময় রমা ও বিনতার গান অদূরে শ্রুত হইল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহারা চারজনে ইস্কুল-বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। তখন পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত গিয়াছে। অস্ত-সূর্যের রশ্মি-রসে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল প্রভাবিত। চারজনে নীরবে অস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

তার পরে মাস দুই গত হইয়াছে। বড়দিনের ছুটিতে সন্ধ্যাবেলায় অতীশ ও মালতী ঠিক সেইখানেই আবার উপবিষ্ট। দুইজনেই নীরব। মাত্র কয়েক মিনিট আগে অতীশ মালতীর কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে। মালতী কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া ছিল—কি ভাবিতেছিল জানি না। কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—আকাশে ইন্দ্রধনু ফুটিয়াছে—তাহারই প্রান্তভাগ দিগন্তের যেখানে নামিয়া পড়িয়াছে—সেখানকার তরুরাজিতে অলৌকিক বর্ণের

তুলি বুলানো। মালতী এই অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছিল। হয়তো সে ভাবিতেছিল—ওই যে দিব্য জ্যোতি, কিছুক্ষণ পরেই তাহার আর কোন চিহ্ন থাকিবে না, মলিন তরুরাজি অধিকতর মলিন হইয়া দেখা দিবে। এই দৃশ্যের উদাহরণ সে কি নিজের জীবনেও সন্ধান করিতেছিল? প্রেমের পূর্বরাগের বিভা কি অমনি ক্ষণস্থায়ী নয়? বিবাহিত সংসারে কি তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইবে? যদি না হয় তবে পূর্বরাগের জ্যোতির তুলনায় সংসার কি মলিন মনে হইবে না? সে মলিনতা বহন করিবার ক্ষমতা কি তাহার আছে? কোন মানুষেরই কি আছে?

বিবাহ সম্বন্ধে মালতীর একটি ধারণা ছিল। ভালবাসিয়া বিবাহ করিলে তাহার পরিণাম শুভ হয় না। বিবাহের পরে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এক প্রকার দাম্পত্য-রস জাগ্রত হয়, সুখে-দুঃখে দু'জনের জীবন এক রকম করিয়া চলিয়া যায়—কিন্তু তাহা ভালবাসা নয়। কিন্তু যে-হতভাগ্যেরা পূর্বরাগের ইন্দ্রধনুর সূত্র ধরিয়া বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করে—আশাভঙ্গজনিত দুঃখ তাহাদের ভাগ্যে সুনিশ্চিত। সে স্থির করিয়াছিল যদি কখনো বিবাহ করে—তবে গতানুগতিক ভাবেই করিবে—ভালবাসিয়া করিবে না। কিন্তু অদৃষ্টের এ কি বিড়ম্বনা! অতীশ তাহাকে ভালবাসিয়াছে—সেই অতীশ আবার বিবাহের প্রস্তাব করিল। সে-ও অবশ্য অতীশকে ভালবাসে। এখন কিং কর্তব্য?

বিবাহ-বিষয়ক এই ধারণা কোন গ্রন্থ হইতে সে সংগ্রহ করে নাই। তাহার বিবাহিতা বন্ধুনীদের জীবনের অভিজ্ঞতা দেখিয়া সে সঞ্চয় করিয়াছে। ইহাকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার মতো বিদ্যাবুদ্ধি তাহার নাই—হয় তো ইহা অমূলক। কিন্তু ওই ইন্দ্রধনুখানাও তো অমূলক—তাই বলিয়া তাহা তো মিথ্যা নয়।

কিন্তু মানুষ এমনি দুর্বল যে, পরিণাম জানিয়াও তাহাকে নিজের বিরুদ্ধে যাইতে হয়। গুড ফ্রাইডের ছুটিতে আবার অতীশ আসিয়াছে। সেবারে নিজের প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া সে ফিরিয়া গিয়াছিল। এবারে নূতন উদ্যমে আসিয়া সে উত্তর আদায় করিয়া লইয়াছে এবং বোধ করি উত্তরটা তাহার অপ্রীতিকর হয় নাই।

অতীশ এবার সঙ্গে একখানা মোটরকার আনিয়াছে। সেই গাড়ীতে করিয়া তাহারা দুইজনে দগ্ধ প্রান্তরের তাম্রপথ বাহিয়া দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই দিকে পলাশের বন আপাদমস্তক পুষ্পিত।

অতীশ বলিতেছে—আমরা যেন ইস্কুলপলাতক, ছুটেছি আকাশ-প্রান্তরে প্রেমের পিকনিকে, আর ওই পলাশের গাছ জ্বালিয়েছে রঙীন ফুলের মশাল—

মালতী বলিল—কিন্তু মশাল তো একদিন নিববেই—

অতীশ বলিল—কোন্ মশাল না নেবে? আর আমাদের পিকনিকই কোন্ চিরস্থায়ী?

মালতী—সেই তো ভয়—

অতীশ বাধা দিয়া বলিল—মালতী, তোমার ওই ভয়ের কথা কিছুতেই বুঝতে পারি না। আজ যদি তোমাকে ভালবাসি—বিয়ের পরে পারবো না কেন?

মালতী—কেন তা জানি না। বোধ করি বিবাহেরই তা ধর্ম, বোধ করি ভালবাসারই তা প্রকৃতি—কিন্তু পারে না দেখছি—

অতীশ—কেউ যদি না পারে তাই বলে আমি পারবো না কেন?

মালতী চুপ করিয়া রহিল।

সেই দ্রুত ছুটন্ত গাড়ীর মধ্যে বসিয়া কেবলি তাহার মনে হইতে লাগিল—এই পলাশের মায়া, এই বসন্তের জাদু যেমন চিরস্থায়ী নয়, ফাল্গুনের এই বনানীকে বৈশাখে যেমন অপরিচিতবৎ বলিয়া মনে হইবে, তেমনি প্রাক্-বিবাহ মালতীকে কি বিবাহোত্তর মালতী হইতে ভিন্ন মনে হইবে না? যদি হয়, তবে অতীশের কি আশাভঙ্গ হইবে না? আশাভঙ্গ হইলে তাহা পূরণ করিবার ক্ষমতা কি তাহার, মালতীর আছে? যদি না থাকে তবে দু'জনের জীবনই না কি বিষম দুর্বহ হইবে? অতীশ দেখিতেছে পলাশ বনের প্রলাপ! সে ভাবিতেছে ফুলের এত ছায়া-সুষমা, এত ছায়াতপও আছে—পলাশ ফুলের রঙ লাল, এ কথা কেবল অন্ধেই বলে। পলাশ ফুলের হাজার রকম রঙ—লাল তার মধ্যে অন্যতম। তাহার মনে হইল—কে বলিল ইহা ক্ষণস্থায়ী—যখন সাক্ষাৎ দেখিতেছি, অন্যথা প্রমাণিত না হওয়া অবধি ইহাই একমাত্র সত্য।

মালতী ভাবিতেছে—এ জাদু তো অন্তর্হিত হইল বলিয়া! বৈশাখের শুষ্ক বনস্থলীর উদাসী নিশ্বাস ইতিমধ্যেই কি জীর্ণ পত্রের মর্মরে শ্রুত হইতেছে না? হায়! হায়! এমন ক্ষণিকের উপরে বিশ্বাস রাখিয়া কে ঘর বাঁধে? মরীচিকা নদীর তীরে স্ফটিকের ঘাট বাঁধিবার ক্ষতিপূরণ কোন কালে কি সম্ভব?

দু'জনের চিন্তা জীবন-কোদণ্ডের দুই কোটি আশ্রয়ী—ইহাদের মিলন কি

করিয়া সম্ভব? আশাভঙ্গ অনিবার্য। তখন, তখন কি হইবে? তখন কি পরস্পরের বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহ করিয়া উঠিবে না? তখন কি তাহাদের মনে হইবে না—একে অপরের সহিত ছলনা করিয়াছে? আজ যাহারা সরসতম মিত্র, তখন কি তাহারাই চরমতম শত্রুতে পরিণত হইবে না?

বিবাহের হোমানলে পূর্বরাগের দেবতা কন্দর্প কি নিত্যনিয়ত ভস্মীভূত হইতেছেন না? তবে এ চেষ্টা কেন? তবু এ চেষ্টা কেন? পূর্বরাগের বিনি সূতায় বনফুল গাঁথা চলে কিন্তু বিবাহের যৌতুকের গুরুভার মণিমুক্তা গাঁথিবার এ বৃথা চেষ্টা কেন? মানুষে ইহা বুঝিয়াও বোঝে না। মালতী ভাবিতেছে—অতীশ বুঝিল না। অতীশ ভাবিতেছে—মালতী পাগল।

তারপর একদিন শুভলগ্নে অতীশ ও মালতীর বিবাহ সমাধা হইয়া গেল। এই সংবাদ গল্পের প্রারম্ভেই আমরা দিয়াছি। বন্ধুরা বিদায় লইলে বাসরঘরের দরজা বন্ধ হইল। সকালবেলার দীপ্ত আলোকে তাহারা পরস্পরকে দেখিল।

* * * *

রাজা। ভগবান্ কণ্ব কি আদেশ করিয়াছেন?

শার্ঙ্গরব। তিনি বলিয়াছেন, আপনি নির্জনে গান্ধর্ব-বিধানে তাঁহার এই কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ধর্মাচরণার্থ ইহাকে এখন গ্রহণ করুন।

রাজা। ইহা আমার নিকট উপন্যাস বলিয়া বোধ হইতেছে।

শার্ঙ্গরব। আপনি ইহাকে উপন্যাস বলিতেছেন কেন?

রাজা। আমার সহিত কি ইহার পরিণয় হইয়াছে?

শকুন্তলা। হৃদয়! তুমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলে তাহাই ঘটিল।

গৌতমী। বৎসে, একবার লজ্জা ত্যাগ কর, আমি তোমার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিতেছি।

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া) এই অম্লানকান্তি সুন্দর রূপ যে পূর্বে পরিগ্রহ করিয়াছিলাম, চিত্তনিবেশপূর্বক চিন্তা করিয়াও তো তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না।

শকুন্তলা। যদি প্রকৃতপক্ষেই আপনি পরদারা জ্ঞানে আশঙ্কা করেন, তবে কোনরূপ অভিজ্ঞান দেখাইয়া আপনার সে আশঙ্কা দূর করিতেছি।

রাজা। সেই কথাই ভালো।

শকুন্তলা। (অঙ্গুরীয় স্থান দেখিয়া) হা ধিক্! হা ধিক্! আমার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় নাই।

* * * *

বিবাহিত জীবনের প্রথম আলোকে অতীশ ও মালতী পরস্পরকে দেখিল। অতীশ নিজের অগোচরে চমকিয়া উঠিল—একটি অতি-ক্ষুদ্র, অতি-গুপ্ত দীর্ঘ-নিশ্বাস অলক্ষ্যে তাহার বক্ষ হইতে নিঃসৃত হইল। তাহার কেন যেন মনে হইল—এই কি সেই মালতী? মালতী বিস্মিত হইল না। সে তো পূর্বাহ্ণে সমস্তই কল্পনা করিতে পারিয়াছিল। অতীশের মুখে পূর্বগামিনী ছায়ার আভাস লক্ষ্য করিয়া সে নীরবে নিজের অনামিকার দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। সে কি শকুন্তলার মতোই ভাবিতেছিল না,—হা ধিক্! হা ধিক্! আমার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় নাই!

অতি সাধারণ ঘটনা

মানুষের মাথা যে এমন করিয়া কাঠের উপরে ঢুঁ মারিতে পারে এই লাইনের 'বাসে' না উঠিলে তাহা কখনই জানিতে পারিতাম না। উঁচু নীচু রাস্তায় বাসখানা এক একবার হুঁচোট খায় আর আট দশটা মাথা ছাদের কাঠের তক্তায় গিয়া আঘাত করে। কাঠও ফাটে না, মাথাও ভাঙে না—দুই-ই সমান শক্ত! আমি মাথায় ছোট, আমার মাথা ততদূর পৌঁছায় না বটে, কিন্তু সম্মুখবর্তীর পিঠে গিয়া গুঁতা মারে, গুঁতাটাকে সে আগে চালান করিয়া দেয়, এমনি করিয়া গুঁতাটা অগ্রসর হইতে হইতে গতির তীব্রতা হারাইয়া ফেলিয়া প্রথম সারির লোকের একটা শিরঃকম্পনে গিয়া অবসিত হয়। বাসের গায়ে পুরাতন অক্ষরে লেখা আছে বটে ষোলজন যাত্রী বসিবে, কিন্তু আমরা প্রায় পঞ্চাশজন লোক বসিয়া, দাঁড়াইয়া, বাঁকিয়া, দুমড়িয়া ঝুলিয়া, এবং দুলিয়া চলিয়াছি; পঞ্চাশজন এবং পঞ্চাশজনের আনুষঙ্গিক পোঁটলা পুঁটলী। ভিড়টা এমনই সূচীভেদ্য যে সহযাত্রীদের কাহারো পূর্ণ মূর্তি দেখিবার সুযোগ নাই। কাহারো চেহারার সিকি, কাহারো দু'আনা, কাহারো মাথা, কাহারো জুতা মাত্র দেখিতেছি। আবার, একজনের দেহটাকে অনুসরণ করিয়া আর একজনের পায়ে গিয়া দৃষ্টি ঠেকে, একজনের হাতটাকে অনুসরণ করিলে আর একজনের কাঁধে গিয়া পৌঁছায়—গন্তব্যস্থলে পৌঁছান অবধি যখন এইভাবে ঝুলিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই, কাজেই ওই এক ধাঁধার মীমাংসা লইয়া কাটাইতেছি। পা দু'খানা এত পুষ্ট অথচ মুখখানা রোগা! পা এবং মুখ একই জীবের কি না মীমাংসা করিতে ব্যস্ত এমন সময়ে কাঠামো শুদ্ধ একবার নড়িয়া গেল, আর একটু হইলে একখানা মিলিটারী গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়াছিল আর কি! ধাক্কা দিলে কাহারো বাঁচিবার আশা ছিল কি?—পথের পাশেই গভীর নালা! বোধ করি কেহই বাঁচিত না! মুখ তুলিতেই বাসের দেয়ালের গায়ে লেখা চোখে পড়িল—"No chance"—কি সর্বনাশ! কোম্পানী তো স্পষ্ট করিয়া সতর্কবাণী লিখিয়া রাখিয়াছে—নো চান্স! যে রকম ব্যাপার দেখিতেছি

তাহাতে 'নো চান্সই' বটে তো! কোন রকমে একবার নামিতে পারিলে হয়। পরে জানিয়াছি কথাটা 'No chance' নয়, 'No change'—অর্থাৎ ভাঙানি পাওয়া যাইবে না। কিন্তু G-টা C-এর মতো দেখায়—লেখাটা বোধ হয় দ্ব্যর্থক!

এমন সময়ে নর-ব্যূহের অবকাশে একখানা হাতের মণিবন্ধের অংশ চোখে পড়িল। আর কিছু দেখা যাইতেছে না। ধাঁধার মীমাংসায় আবার লাগিয়া গেলাম—এ মণিবন্ধ যার, তার মুখ কোথায়? মণিবন্ধটা কোমল, সুকুমার, বর্ণ উজ্জ্বল! কিশোর বালকের হওয়াই সম্ভব। এমন সময়ে একটা গুঁতার ফলে সম্মুখে ঝুঁকিতে বাধ্য হইলাম—তখনি চোখে পড়িল মণিবন্ধের প্রান্তে একখানি শাঁখা। তবে তো বালিকার হাত। আর একবার হুঁচোট—আরও একটু অগ্রসর হইতেই চোখে পড়িল শাঁখার নীচেই একখানি লোহা। এবারে আর সন্দেহ নাই যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের ওই মণিবন্ধ। তার মুখখানা বোধ করি ওই পাঞ্জাবীদ্বয়ের দাড়ির মেঘের আড়ালে অন্তর্হিত। এমন সময়ে গোটা দুই আচ্ছা রকম ধাক্কা দিয়া বাসখানা থামিয়া গেল। একটা স্টেশন। এই লাইনের ইহাই উপান্ত স্টেশন। অধিকাংশ লোক ভারতীয়, বহু জাতির বিচিত্র প্রতিনিধির দল—দাড়ি, পাগড়ী, টুপি, টিকি, টাক ও পোঁটলা পুঁটলি লইয়া প্রস্তরখণ্ডবাহী জলস্রোতের মতো সবেগে নামিয়া গেল। বাস প্রায় খালি—এতক্ষণে বসিবার জায়গা পাওয়া গেল।

বসিয়া পড়িলাম। হাত, পা, ঘাড়, মাথা সব যেন আর কাহারো। বাঁকিয়া চুরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে সব অবশ হইয়া গিয়াছিল। হাত পা টান করিয়া ঘাড়টাকে কয়েকবার ঘুরাইয়া চেতনা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টায় নানারূপ কসরত করিতেছি। ঘাড়টাই সবচেয়ে অসাড় হইয়াছে—বারংবার দুই বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া লইতেছি। একবার ঘাড় ঘুরাইতেই পাশের দিকের বেঞ্চিতে একটি মেয়ের উপরে চোখ পড়িল। কচি বয়স, সিঁথায় সিঁদুর, মুখে কচি ডাবের শ্যামল সৌকুমার্য এবং অনবদ্য স্নিগ্ধ রমণীয় একটি নিটোলতা; শ্যামল বাঙলার শ্যামা বালিকা।

লাবণ্যমসৃণ দু'খানি বাহু ক্রমশ সূক্ষ্ম হইয়া অবশেষে পাঁচটি নীরব আঙুলে পর্যবসিত হইয়াছে। কোমল মণিবন্ধে শুধু একখানি করিয়া শাঁখা ও লোহা। ওঃ, তবে ইহারি মণিবন্ধের অংশ জনতার অবকাশে চোখে

পড়িয়াছিল। কিন্তু ঘাড়টা এখনো স্ববশে ফেরে নাই—এখনো মাঝে মাঝে ঘুরাইতেছি। একবার মেয়েটিকে চোখে পড়ে আর একবার পথের পাশের কৃষ্ণচূড়ার অফুরন্ত পুষ্পিত আবীরের ছটা। হঠাৎ মনে হইল কিন্তু এ কি! মেয়েটি বিবাহিত অথচ হাতে কোন অলঙ্কার নাই কেন? বাঙলাদেশের বিবাহিত মেয়ে যত গরীবই হোক না কেন, আর মেয়েটিকে তো চেহারায় ও পোষাকে মধ্যবিত্ত ঘরের বলিয়াই মনে হয়, দু'একখানা সোনার অলঙ্কার পরিয়াই থাকে। একটা রুলি, দু'খানা চুড়ি, যা সকলেরই জোটে, বিবাহের সময়ে এই সামান্য অলঙ্কার না পায় এমন মেয়ে বাঙলাদেশে বিরল. ইহার কি তাহাও জোটে নাই? ইহার দারিদ্র্য কি এমনি অসাধারণ! অথচ মেয়েটির মধ্যে আর কোন অসাধারণত্ব চোখে পড়ে না। কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, অলঙ্কারগুলা কোন অসন্ন বিপদের পথ রোধ করিতে গিয়াছে? এই অল্প বয়সে কি বিপদ ইহার ঘটিল যাহাতে শাঁখা ও লোহা ছাড়া আর সব খুলিয়া দিতে হইয়াছে? ওই রিক্ত মণিবন্ধের নিরঞ্জন কোমলতা কেবলি মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগিল। অলঙ্কারের মধ্যে মেয়েদের ইতিহাস নিহিত—তাহাদের সৌভাগ্যের, দুর্ভাগ্যের এবং পতনের।

বাস শেষ স্টেশনে আসিয়া থামিল। এখানে একটি প্রসিদ্ধ যক্ষ্মানিবাস অবস্থিত। যাহারা আসে—ওই যক্ষ্মানিবাসের আত্মীয়স্বজনকে দেখিতেই আসে। অন্য কাজে বড় কেহ আসে না। মেয়েটি নামিল—হাতে ছোট একটি ফলের পুঁটুলি। আর পাঁচজনের সঙ্গে সে অদূরস্থিত যক্ষ্মানিবাসের দিকে দ্রুত-পদে চলিয়া গেল। অমনি এক বিদ্যুতের ঝলকে তাহার মণিবন্ধচ্যুত অলঙ্কারের ইতিহাস বেদনার বহ্নি-ভাষায় আমার মনে উচ্চারিত হইয়া গেল। কোথায়, কেন সেই অলঙ্কারগুলি গিয়াছে বুঝিতে বিলম্ব হইল না। লুপ্ত অলঙ্কারের মধ্যে তাহার গুপ্ত ইতিহাসের একটা আভাস পাওয়া গেল। গাছপালার আড়ালে পথের বাঁকে মেয়েটি অন্তর্হিত হইয়া গেল, কিন্তু আসন্ন অস্ত-আভায় করুণ তাহার সেই মুখ, শঙ্খমাত্রসহায় অনন্য-অলঙ্কার সেই শূন্য মণিবন্ধ, কিছুতেই ভুলিতে পারিলাম না। অনেক দিন ধরিয়া এই দু'টি ছবি আমার চেতনার মধ্যে সূচী চালনা করিয়া বেদনার কন্থা বুনিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিলাম, যক্ষ্মানিবাসে গিয়া একবার খোঁজ করিলেই তো সব জানা যায়—সব জানাতেই সব কৌতূহলের পরিসমাপ্তি! কিন্তু তাহা আর সম্ভব হইল

কোথায়? ভাবিলাম, নিজের মনেই মেয়েটির ইতিহাস রচনা করিয়া কৌতূহল শান্ত করি না কেন? তাহার ইতিহাসের কাঠামোটা তো সর্বজনবিদিত—তাহার ভাগ্যে নূতন আর কি ঘটিবে? তাহার ব্যক্তিগত বেদনার মেঘের মধ্যেই তো সহস্রের অশ্রুজল সঞ্চিত হইয়া আছে! তাহার অজ্ঞাতে তাহার কাহিনী রচনা স্থির করিয়া ফেলিলাম। দুঃখের চক্রাবর্তনে তাহার কাহিনী শিল্পসামগ্রী হইয়া উঠিল। শিল্পেই পূর্ণতা—পূর্ণতাই শান্তি।

অতি সাধারণ ঘটনা, অতি সাধারণ মানুষ। অমিত আর শমিতার মাথা ভিড়ের মধ্যে তলিয়ে যাবার মাপে বিধাতা তৈরী করেছিলেন বলেই হোক, আর ইচ্ছার অভাবেই হোক, কখনো তারা ভিড়ের ঊর্ধ্বে নিজেদের মাথা উদ্ধত করে তোলেনি। পাহাড়ের সানুতে দৃষ্টির অতীত যে-সব শিলাখণ্ড পড়ে থাকে, তারাও একদিন অগ্ন্যুৎপাতের ঠেলায় অন্তিম ভাস্বরতায় আকাশপথে উৎক্ষিপ্ত হয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে—অমিত-শমিতার ভাগ্যে এমন কি সেই বেদনার দ্যুতিরও সৌভাগ্য ছিল না, বিধাতা নিতান্তই কৃপণ হাতে তাদের গড়েছিলেন। তারা ছিল ইতিহাসের রাজপথের 'ক্যাম্প্ ফলোয়ার'—যেখানে কেবল রাজা মন্ত্রী পাত্র মিত্রকেই চোখে পড়ে, বাকি অগণ্য লোক যেখানে নগণ্য; তারা জন নয়, জনতা মাত্র।

অমিত-শমিতা নাম এক সঙ্গে করলাম বটে, এক জায়গায় তাদের জীবনে গ্রন্থিও পড়েছিল সত্য, কিন্তু বরাবর তারা এমন এক ছিল না। গোড়া থেকে এক থাকলে মাঝখানে এক হবার আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত হ'ত। বিধাতা তাদের নগণ্য করেছিলেন কিন্তু নিরানন্দ করেন নি।

অমিত-শমিতার বিবাহের কথারই আভাস দিলাম। আধুনিক মতে স্ত্রী এক, পুরুষ এক; বিবাহে একে একে গ্রন্থি বেঁধে মিলন হয় বটে কিন্তু সে দুইয়ের মিলন; সংসারের উচ্চাবচ পথে একটু জোর হুঁচোট খেলেই গ্রন্থি ছিঁড়ে মিলিত দুই আ-কার হয়ে যায়—এক আর এক। আধুনিক মতে স্ত্রী আধ, পুরুষ আধ; বিবাহের হোমানলে দুইআধ গলিত হয়ে একে পরিণত হয়। সংসারের আবর্তে তাতে টান পড়ে বটে, কিন্তু ভিন্ন হবার কথাই ওঠে না;—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, আধে আধে পূর্ণতা ঘটেছে যে!

অমিত-শমিতার বিবাহ হ'ল। কিন্তু অমনিতে হয় নি। প্রজাপতি

অবশ্য অনুকূল ছিলেন কিন্তু সেই প্রজাপতির গুটি থেকে ঠিক কতখানি স্বর্ণসূত্র পাওয়া যাবে তা পরিমাপ করার ভার যাঁর উপরে, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন প্রতিকূল। অমিতের পিতা অর্ধেন্দুবাবু একালের নূতন বোতলে সেকালের পুরানো মদ। ছিপি না খোলা পর্যন্ত হালের চোলাই বলে মনে হয়, কিন্তু ছিপি খুললেই বেরিয়ে আসে মনুসংহিতার গন্ধ। সেকালের মদ বললো, পুত্রের বিবাহের কর্তা পিতা; একালের বোতল বললো, দেখই না, ছেলে যদি নিজের শক্তিতে সোনার খনি আবিষ্কার করেই ফেলে—অত গোল করা কিছু নয়। তখন মদে বোতলে আপোষ হয়ে গিয়ে গ্রামের তারিণীচরণকে চিঠি লিখে দিল—ব্যাপারটার একবার খোঁজখবর করা দরকার। তারিণীচরণ অর্ধেন্দুবাবুর গ্রামের লোক—থাকে কলকাতায়, যেখানে এখন রয়েছে অমিত এম-এ পাঠের উপলক্ষ্যে। তারিণীচরণের চিঠি এলো—শমিতারা জাতের এক আধ ধাপে নীচে হলেও তা চোখ বুজে সহ্য করবার মতো—কারণ গুটিতে স্বর্ণ-সূত্রের দৈর্ঘ্য বললেই হয়। তারিণীচরণ আবগারী বিভাগের লোক—জানে যে সত্যে পৌঁছবার পথ অত্যুক্তি। অর্ধেন্দুবাবু চোখ বুঁজেই রইলেন, সব জেনেও কিছু জানলেন না। বরঞ্চ না জানার পথ খোলা রাখবার জন্যে পুত্রকে একখানি চিঠি লিখে 'ফর্মাল প্রটেষ্ট' জানালেন, অথচ তার ভাষা এমন হল না, যাতে বিবাহ ভেঙে যাবার আশঙ্কা আছে। অতএব অর্ধেন্দুবাবুর অনুপস্থিতিতেই অগত্যা অমিতের সঙ্গে শমিতার বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

ওরা ছিল এক কলেজের পড়ুয়া। কলকাতায় তখন সবে দ্বৈতী শিক্ষার ধারা স্বর্গলোক থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। স্ত্রী-পুরুষের দ্বৈতী ধারার মিলনে কলেজের কলরোল নদনদী সঙ্গমের কলধ্বনিকে ছাপিয়ে গিয়েছে। কিছুদিন এমন চলবার পরে কর্তৃপক্ষের মনে কি হ'ল, যার ফলে দ্বৈতী শিক্ষা অদ্বৈতপাঠে পরিণত হ'ল। মেয়েদের সময় ধার্য হ'ল সকালে; ছেলেদের দুপুরে। তবু ঐ এগারটার কাছ ঘেঁষে রইলো একটা দেখা-শোনার দিগন্ত।

অমিত-শমিতা মাত্র এক বছর দ্বৈত সাধনার সুযোগ পেয়েছিল—তার পরে এলো এই অসি-পত্রের ব্যবধান। প্রেম দুর্মর, সহজে তার অঙ্কুর মরতে চায় না; বাস্তব থেকে উৎপাটিত মূল হয়ে গেলেও আশার মধ্যে বায়ুজীবী রূপে বেঁচে থাকে। অমিত-শমিতার আশা রইলো—কলেজের গণ্ডী পার হতে পারলে আবার শিক্ষা-জগতের পরলোক, অর্থাৎ পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটে গিয়ে দেখা হবে।

সেখানে বিরহের আশঙ্কা নেই। হ'লও তাই। কিন্তু এখানে একটু কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। কলেজের সীমাতেই তাদের সম্বন্ধে প্রেম শব্দটা প্রয়োগ উচিত হয়নি—কারণ সে অনুভূতি ওখানে তাদের ঘটেনি। অমিতের কথাই বলি। সে প্রথমে দেখতো প্রেমের একান্তে এক গুচ্ছ মেয়ে—সকলকে একসঙ্গে চোখে পড়তো অর্থাৎ কাউকেই চোখে পড়তো না। এ সেই যুধিষ্ঠিরের অস্ত্র পরীক্ষার ব্যাপার আর কি! যুধিষ্ঠির তো শুধু পাখীটাকে দেখেননি, গাছ এবং আকাশের সঙ্গে এক করে পাখীটাকে দেখেছিলেন বলেই তিনি দ্রোণাচার্যের "ফেল করা" ছাত্র। তারপরে অমিত এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অনুভব করলো। মাঝে মনে হ'ত সব মেয়েই এসেছে—তবু যেন ও-দিকটা শূন্য—সবই আছে, তবু কি যেন নেই। কেউ যদি তখন তাকে রহসে বলে দিত যে, অমিত, একেই বলে প্রেমের পূর্বাভাস, তবে সে কথাটা নিশ্চয়ই হেসে উড়িয়ে দিত। যখন এইরকম চলছে, অর্থাৎ ক্লাসের স্বাদ-বিস্বাদ, এমন সময়ে হঠাৎ সে করিডরে শমিতাকে দেখতে পেলো। চমকে উঠলো, সে যেন এক আবিষ্কার!—আমেরিকার ডাঙা চোখে পড়বার আগে তার ভাঙা ডালপালা সমুদ্রে দেখে কলম্বাস যেমন চমকে উঠেছিলেন। অমিতের মনে হ'ল, তাই তো! এই মেয়েটিই তো ক্লাসের লাবণ্য, যার অভাবে সমস্ত এমন বোধ হচ্ছে! পরীক্ষা করতেও বিলম্ব হ'ল না। তারপর দিন ক্লাসে শমিতা এলো, অমিতের মনে হ'ল—ক্লাস যে শুধু শূন্য হয়েছে তা নয়, এতক্ষণে পূর্ণ হ'ল। এতদিনে সে জনতা ভেদ ক'রে বিশেষ একটি জনকে দেখতে পেলো। এবারে সে অস্ত্র পরীক্ষায় যুধিষ্ঠিরের স্থান থেকে অর্জুনের স্থানে ডবল প্রমোশনে উন্নীত হ'ল।

তারপরে এলো তারা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের ক্লাসে। সেখানে প্রতিদিন প্রেমের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা কচি গাছের নূতন কিশলয়ের মতো খেলতে লাগলো তাদের হৃদয়ে। কিন্তু অমিত-শমিতার প্রেমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে আমি বসিনি তো। আর বসলেই বা কি হ'ত? এমন কোনো অভিজ্ঞতা তাদের জীবনে ঘটেনি যাকে নূতন বলা যায়; বিধাতা যে তাদের প্রতি অকৃপণ নন, সে তো গোড়াতেই বলে রেখেছি। জগতের আদি যুগে কোন কোন প্রবল জ্যোতিষ্ক আর একটা গ্রহের কাছ ঘেঁষে চলে যাবার সময়ে তার হৃদয়ে আগুনের জোয়ার জাগিয়ে দিয়ে যেতো, কিন্তু নিজে ধরা দিত না। অনেকেরই প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা ঐ জাতীয়। জ্যোতিষ্কের টানে হৃদয়ে জোয়ার জাগে—কিন্তু

না দেয় ধরা, না পারে ধরতে। কিন্তু ওরা প্রথমবারেই পরস্পর পরস্পরের কাছে ধরা দিল। অমিত-শমিতা বিবাহে প্রতিশ্রুত হ'ল।

শমিতার সংসারে ছিলেন বিধবা মা। হিন্দু সংসারে স্ত্রীর মূল্য শূন্য, কিন্তু স্বামীর পাশে অধিষ্ঠিত হবার ফলে তার মূল্য যায় বেড়ে; সেই স্বামীর অবর্তমানে আবার সে শূন্যতায় পর্যবসিত হয়। শমিতার মা-র মূল্য এখন শূন্য। তাঁর হাতে কিছু টাকা ছিল, কিন্তু টাকাকে মূলধন ক'রে কি ভাবে সংসারে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে হয়, সে কৌশল তাঁর জ্ঞাত ছিল না। বিশেষ ও-টাকাকে তিনি মেয়ের সম্পত্তি ব'লেই জানতেন—সংসারে তাঁর আর কেউ তো নেই। তিনি বিবাহে খুসিই হলেন।

ওদের বিবাহ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, অর্ধেন্দুবাবু এলেন না—কেননা, বিবাহে উপস্থিতিতে বিবাহকে কতখানি স্বীকার করে নেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল—অথচ মনে মনে অনিচ্ছা ছিল না, কাজেই এ-দুয়ের সামঞ্জস্য করবার উদ্দেশ্যে বিবাহে হল তাঁর কূটনৈতিক অনুপস্থিতি।

বিবাহের পরে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ওদের সম্মিলিত জীবনে ঘটলো। অমিত সামান্য একটি চাকুরী পেলো আর শমিতার মা মারা গেলেন। যাই হোক, ইতিহাসের পাতার বাইরে যে অগণ্য লোকের জীবনস্রোত বইছে, তাদের সঙ্গে মিলিয়ে তাদের জীবনও চলা শুরু করলো—কখনো বা দুঃখের কালো পাথর ডিঙিয়ে, কখনো বা উচ্ছল হাসির অজস্রতায়, আবার কখনো বা পঙ্কিল আবর্তনের মন্থন সহ্য করে।

ওদের একটি দুঃখ ছিল যে অর্ধেন্দুবাবু এলেন না। কিন্তু সে দুঃখ দীর্ঘকাল রইলো না। অর্ধেন্দুবাবু এলেন না বটে, কিন্তু তাঁর পত্র এলো। সে পত্রের ছত্রে ছত্রে পুরাতন মদের ছিটা। অর্ধেন্দুবাবু পুত্রের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাকে তিরস্কার করেছেন। প্রাচীনকালের রাম ও পরশুরাম প্রভৃতি প্রাতঃ-স্মরণীয় ভদ্রলোকগণ পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য কত কি অপ্রত্যাশিত কাজ করতে কুণ্ঠিত হননি—তার দীর্ঘ ফর্দ সেই পত্রে রয়েছে। অবশেষে আছে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের স্মারক। অর্ধেন্দুবাবু উদারভাবে লিখেছেন যে, যদিচ বধূমাতার জলগ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তত্রাচ অমিত যদি তাঁকে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠায় তবে তা তিনি গ্রহণ করতে সম্মত আছেন।

পড়ে শমিতা বললো—মার তো কিছু টাকা আছে, তাই থেকে মাসে মাসে কিছু পাঠালেই হয়।

অমিত বললো—তা কি হয়? আমি দেখি কি করতে পারি।

সে কাজের উপরে খুচরো আর একটা কাজ জোগাড় করে নিলো এবং উদ্বৃত্ত অর্থ পিতাকে পাঠাতে লাগলো। এতে তার খাটুনি বেড়ে গেল। স্বাস্থ্য তার কোনদিনই ভালো ছিল না, এখন তাতে ঘাটতি দেখা দিতে শুরু হ'ল।

শমিতা বলে,—তুমি কাজ ছেড়ে দাও, এই টাকা থেকে পাঠালেই চলবে।

অমিত বলে—ও-টাকাও তো আমার, প্রয়োজনকালে ও-টাকা কাজে লাগবে। এখন চলছে—চলুক।

অর্ধেন্দুবাবু টাকা পেয়ে খুসি হলেন, কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না। যে এত দিচ্ছে সে আরও কত দিতে পারতো, এই চিন্তা তাঁকে অসন্তুষ্ট করে রাখলো। একটা না একটা উপলক্ষ্য করে তিনি টাকার দাবী চড়িয়ে যেতে লাগলেন, অমিতও সাধ্যাতীত পরিশ্রম ক'রে সে চাহিদা মিটিয়ে যেতে লাগলো। অর্ধেন্দুবাবু মনে মনে হাসেন, বৈবাহিক তাঁকে ঠকিয়েছিল বটে, এখন তিনি তার সঞ্চিত স্বর্ণসূত্রে টান দিচ্ছেন। আর হাসতেন বিধাতা পুরুষ, অর্ধেন্দুবাবু স্বর্ণসূত্র উপলক্ষ্য করে নিজের পুত্রের স্বাস্থ্যে টান দিচ্ছেন, দেখতে পেয়ে।

২

অবশেষে ডাক্তারে একদিন স্পষ্ট করে বলতে বাধ্য হল যে, রোগটা টি-বি বলেই মনে হচ্ছে, তবে কি না ভগবান আছেন। বাঘে যখন ধান খায় আর ডাক্তারে যখন ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, তখন বুঝতে হবে সর্বনাশের আর অধিক বিলম্ব নেই।

সেদিনও প্রতিদিনের মতো অমিত অফিসে বেরুতে উদ্যত হচ্ছিল, শমিতা একেবারে দরজা রোধ করে দাঁড়ালো। বললো,—তুমি কি সর্বনাশের কিছুই বাকি রাখবে না!

অমিত বললে,—কিন্তু চাকরী না করলে চলবে কি করে?

শমিতা বললো,—তুমি চলে গেলে আমার চ'লে কি সুখ? শমিতা চাপা মেয়ে—এর বেশি বলা তার স্বভাবসিদ্ধ নয়। অমিত বুঝলো যে ওই কথা

কয়টিতে আর দশজন মেয়ের অনেক কান্না, অনেক মাথাকোটা ঘনীভূত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে রয়েছে। অগত্যা সে বেরুবার আশা ছাড়লো।

তবু অমিত আর একবার বলবার চেষ্টা করলো—শমি, চলবে কেমন করে?

শমিতা শুধু বললো,—সে আমি দেখবো। মেয়েরা যখন 'দেখবো' বলে, তারা সত্যিই দেখে। পুরুষের মুখে ওটা একটা কথার মাত্রা মাত্র। অমিত শয্যা গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ল; শমিতা সংসারের ভার তুলে নিল।

যক্ষ্মা ব্যাধিটা রাজকীয় ব্যাধি। প্রাচীনকালে রাজারা মানুষের দণ্ডাতীত ছিলেন, তাই তাঁদের দণ্ডিত করবার জন্যে অদৃষ্ট এই ব্যাধিটির সৃষ্টি করেছিল, সেই জন্যেই তো ওর পুরা নাম রাজযক্ষ্মা। কিন্তু যেহেতু আধুনিক গণতন্ত্রের যুগে প্রত্যেক মানুষই একটি ছোট-খাটো রাজা, ওই ব্যাধিটা তাই ক্ষুদে রাজাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। কিন্তু স্বভাব বদলাতে পেরেছে কি? ওকে রাজকীয় আড়ম্বরে চিকিৎসা করতে হয়। সে সামর্থ্য আছে ক'জনের? আবার লোকেও ব্যাধির পূর্ব কৌলীন্য ভুলতে পারেনি; কাজেই যক্ষ্মাবাসগুলোতে খরচের উদারতা ঘটিয়ে সাধারণের আয়ত্তের বাইরে করে রেখেছে।

শমিতা সংসারের ভার নিয়ে দেখলে আয় বাড়াবার একমাত্র উপায় খরচ কমানো। শ্বশুরের মাসোহারার দিকেই তাহার প্রথম দৃষ্টি পড়লো। শমিতা অনেক ভেবে চিন্তে রাত জেগে অর্ধেন্দুবাবুকে সব অবস্থা জানিয়ে একখানা চিঠি লিখে ফেললো। শ্বশুরকে এই তার প্রথম চিঠি। অর্ধেন্দুবাবুর উত্তর এলো—কিন্তু তা অমিতের নামে, তাতে পুত্রবধূর উল্লেখ পর্যন্ত নাই। পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে বিবাহ করবার দণ্ডস্বরূপ এই ব্যাধি যে তাকে আক্রমণ করেছে—একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন। অদৃষ্টের উপরে তাঁর হাত নেই। পুনশ্চ জানিয়ে লিখেছেন এখন থেকে অমিত যেন তার মাসোহারা চুনারের ঠিকানায় পাঠায়; ওখানকার স্বাস্থ্য ভালো ব'লে তিনি সেখানে কিছুকাল থাকবেন। শমিতা চিঠিখানা প'ড়ে ছিঁড়ে ফেললো, অমিতকে কিছু জানালো না। অমিত মাঝে মাঝে শুধাতো—বাবার টাকা নিয়মিত পাঠানো হচ্ছে কি না? শমিতা বলতো, হচ্ছে বই কি। কি ক'রে যে হচ্ছে অমিত আর তা জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতো না। এই মিথ্যা কথাটা বলে শমিতা এমন আনন্দ পেলো, মহা সত্যকথা বলেও তেমনটি কখনো সে পায়নি।

ওদের সংসার কেমন ক'রে চলে এ প্রশ্ন অবান্তর, কারণ সংসার চলে না,

চালাতে হয়। শমিতা কিছু কিছু সঞ্চয় করেছিল, তার সঙ্গে মা'য়ের টাকা যুক্ত হ'য়ে একরকম ক'রে তাদের দিন চলে যায়—যাতে ভিতরে ভিতরে টান পড়ে অথচ বাইরে টোল খায় না।

অমিতের রোগ সারবার নয়, কিন্তু হয়তো কমতো যদি মনে তার দুশ্চিন্তা না থাকতো। সে যে অসহায় একটি মেয়ের ঘাড়ে নিজের ভার তুলে দিতে বাধ্য হ'য়েছে, এই গ্লানি তাকে ভিতরে ভিতরে চাবকাচ্ছিল।

তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে শমিতা কতবার চাকুরি করতে চেয়েছে—অমিত হেসে জবাব দিয়েছে, তুমিও যদি আয়ের পথ দেখো, তবে খরচ করবে কে? অমিত কিছুতেই তাকে চাকুরি করতে দিতে সম্মত হয়নি—ওতে তার পৌরুষ ব্যথা পেয়েছে। এখন তাই শমিতা চাকুরি করবার প্রস্তাব আর পাড়েনি, জানতো ওতে তাকে মর্মান্তিক কষ্ট দেওয়া হবে। কিন্তু সেদিন হঠাৎ অমিতই তাকে চাকুরি নেবার জন্যে অনুরোধ করলো। বললো—শমি, একটা ভাল চাকরির বিজ্ঞাপন দেখছিলাম, একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না। এই কথা শুনে শমিতার চোখ ছল ছল ক'রে উঠলো, তার কাছে কি লুকানো থাকবে না—কত দুঃখ, কত সংস্কার দমন ক'রে তবে ওই প্রস্তাব অমিত করতে পেরেছে? অমিত তখন কি দেখছিল? দেখছিল সকালবেলার স্থলপদ্মের পাপড়ির মতো শাড়িখানা প'রে শমিতা সবে ফিরেছে, গ্রীষ্মের দুপুর তখন আড়াইটে, রৌদ্রের তাপে গাল দুটিতে তপ্ত আভা, কপালে অশাসিত চূর্ণ কুন্তল নানা বিচিত্র রেখায় লিপ্ত, কণ্ঠে স্বেদবিন্দুর মুক্তার পাঁতি, চোখের কোণে ঈষৎ রক্তিমা। অমিত দেখলো, শমিতা সুন্দর। বাস্তবিক রৌদ্রে ঘুরে না এলে মেয়েদের সত্যিকার সৌন্দর্য খোলে না!

অমিত ভাবলো—এখন আর বৃথা পৌরুষের গর্ব ক'রে কি হবে? শমিতা চাকুরি নিলে আয়ের পথ প্রশস্ত হ'য়ে তার দুশ্চিন্তা কমবে।

শমিতা বল্‌লে, সে কি হয়! এখন চাকরি করতে গেলে তোমাকে দেখবে কে?

আসলে দেখবার সময়ের অভাবটা সত্য নয়। যে-কষ্ট সুস্থ সময়ে অমিতকে সে দিতে পারেনি, অসুস্থতার মধ্যে তা দেবার কল্পনাও শমিতার কাছে অসহ্য। কাজেই শমিতার আর চাকুরি করা হ'ল না। ওদের সংসার কি করে চলে? সংসার চলে না—সংসারকে চালাতে হয়।

৩

এই রকমে সুখে দুঃখে যখন ওদের জীবনযাত্রা চলছিল তখন অমিতের দেহের যক্ষ্মার বীজাণুগুলো নিশ্চিন্ত ব'সে ছিল না। ওই অন্ধ রোগ-বীজাণুর শ্রেষ্ঠ আবাস মানুষের দেহ বটে, কিন্তু মানুষের-সঙ্গে তাদের হৃদ্যতার কোন সম্বন্ধ নেই; তারা দিনরাত্রি মানুষের স্নেহ দয়ামায়ার প্রতি সম্পূর্ণ অন্ধনিরপেক্ষতায় নিজেদের নিজেদের ধ্বংসমূলক কাজ করে যায়; নিরন্তর তারা মানুষের ফুস্‌ফুসে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলেছে—জীবন থেকে মৃত্যুতে পৌঁছবার নিশ্চিততম, সরলতম, একান্ততম পথ। ওরা স্নেহহীন, দয়াহীন, মায়ামমত্বহীন, ওরা অন্ধ, অজ্ঞান, সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী; মানুষের বুকের মধ্যে আর এক বিচিত্র জগৎ; মানুষের জগৎ ও বীজাণুর জগৎ এমন সমান্তরাল যে কোন কালে তাদের মিলিত হ'বার সম্ভাবনা নেই। তারপরে হঠাৎ একদিন দুই সমান্তরাল রেখা এক জায়গায় গিয়ে থেমে যায়—একই সঙ্গে দুইয়ের চিরাবসান।

এমন সময়ে শমিতার এক আত্মীয় শহরের নিকটের এক যক্ষ্মাবাসের ডাক্তার হ'য়ে এলেন। শমিতা তাঁকে গিয়ে ধরলো। তিনি অমিতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখিয়ে তাকে কিছু কম খরচে যক্ষ্মাবাসে ভর্তি ক'রে নিলেন।

অমিত টাকার কথা তুললো না, জানে যে ওতে শমিতাকে কেবল কষ্ট দেওয়াই হবে। তা'ছাড়া ভাবলো—আর কতদিনই বা! এ-ক'টা দিন শমিতার ইচ্ছেয় বাধা দেবার উৎসাহ তার হ'ল না। ও ভাবলো—এ-ক'টা দিনের সেবার স্মৃতি শমির মনে অক্ষয় হ'য়ে থাক। আমার যখন আর কিছু করবার সাধ্য নেই—ওর মনে দুঃখের খোঁচা দেবার অহঙ্কারই বা করি কেন?

অমিত যক্ষ্মাবাসে ভর্তি হ'লে শমিতা রোজ বিকেলে দেখা করতে যায়। অমিত টাকার প্রশ্ন তোলে না দেখে শমিতার ভাল লাগে না। বুঝতে পারে যে তার মনে প্রশ্নটা অব্যক্ত কাঁটার মত বিঁধে আছে। তাই সে একদিন নিজেই কথাটা তুলে বসলো—জানো, আমি স্কুলে একটা চাকরি নিয়েছি। কিন্তু পাছে এই কথায় ও মনে করে যে তার জন্যেই শমিতার এই কাজ গ্রহণ করতে হ'য়েছে, তাই ব্যাখ্যা স্বরূপে বললে—এখন তো সারাদিন ব'সে থাকা, একা একা ভাল লাগে না, তাই কাজ নিয়ে কোন রকমে ভুলে থাকি।

অমিত কি একথা বিশ্বাস করলো? কি জানি, হয়তো সে বিশ্বাস করতেই চায়। কিন্তু টাকা যে কোত্থেকে আসছে তা অমিতের চোখ এড়াতে পারলো

না। সে দেখছে শমিতার হাতের চুড়ির গোছা ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে আসছে। সে দেখতো, সবই বুঝতো, তবু চুপ ক'রে থাকতো, কারণ চুপ ক'রে থাকা ছাড়া আর যা করবে, তাতেই শমিতার কষ্ট বাড়বে বই কমবে না। কেবল সে রাতের বেলায় জেগে থেকে অনেকক্ষণ ধ'রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতো,—সেরে উঠবার নয়, কারণ তা বিধাতারও অসাধ্য,—সে প্রার্থনা করতো মরবার; শমিতার চুড়ির গোছা নিঃশেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার জীবনান্ত ঘটে। যে বিধাতা জীবন দান করতে অশক্ত, তিনি কি এই ইচ্ছামৃত্যু দানেও সমর্থ নন?

নিজের হাতের চুড়ির গোছা যে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসছে, সেদিকে শমিতার খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একদিন আচম্বিতে তার খেয়াল হ'ল। শমিতা এলে অমিত তার অগোচরে একবার ক'রে চুড়ির সংখ্যা গুণে দেখতো। শমিতা এতদিন তা লক্ষ্য করেনি। আজ হঠাৎ দু'জনের দৃষ্টি পরস্পরের কাছে ধরা পড়ে গেল। কিন্তু শমিতা যেন কিছুই বোঝেনি এমন ভাবে বললো,—একলা আসতে হয়, ফিরতেও একলা, তাতে আবার সন্ধ্যে হ'য়ে যায়, দিনকাল খারাপ, কতকগুলো চুড়ি খুলে রেখেছি। কেমন, ভালো করিনি?

অমিত শুধু বললো, ভালোই করেছো। সে রাত্রে অমিত একা বিনিদ্র জেগে প্রার্থনা করলো—হে সুখ-দুঃখের দাতা, যে একই সঙ্গে মানুষের বুকে আত্ম-বিস্মৃত প্রেম আর যক্ষ্মার বীজাণু বিতরণ ক'রে রেখেছ, তোমার কাছে কি ক'রে প্রার্থনা করিতে হয় জানিনে। সে প্রার্থনার কতটুকু তুমি গ্রহণ করো, কতখানি বর্জন করো তাও জানিনে। তবু এ বিশ্বাস আছে, সুখের প্রার্থনার চেয়ে দুঃখের প্রার্থনা তুমি হয়তো দ্রুত হস্তে মঞ্জুর করে থাকো। আমার দেহাবসান শমির ওই চুড়ি ক'গাছার সঙ্গে ঘটিয়ে দাও, প্রভু! তারপরে তার মনে হ'ল, এ প্রার্থনা কি তার সুখের নয়? এ অবস্থায় একমাত্র সুখ যা সম্ভব, তাইতো সে চেয়েছে! সর্ব-দুঃখের দাতা কি তা মঞ্জুর করবেন? দুঃখের ছদ্মবেশে এই সুখটুকু কি সে ফাঁকি দিয়ে আদায় ক'রে নিতে পারবে? আর যদি শমির চুড়ি নিঃশেষ হ'বার পরেও তার জীবনান্ত না ঘটে, তখন কি হবে? সে শঙ্কিত-সম্ভাবনাকে আর সে কিছুতেই চিন্তা করতে পারলো না। ঘুমিয়ে পড়লো।

শমিতার সে রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে ঘুম হ'ল না। ঘুম না হওয়া তার নূতন নয়। কিন্তু আজকার নিদ্রাহীনতা একপ্রকার নূতন আনন্দের। সে ঘরে

থেকে উল্লাসে পায়চারী ক'রে ফিরতে লাগলো—আমি মিথ্যা কথা বলেছি—আমি মিথ্যাবাদী। মিথ্যা কথা সে অমিতের জন্যে আগেও বলেছে—কিন্তু আগে এমন মিথ্যা কথায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেয়নি। আজকার বিশেষ আনন্দ ওতেই। শমিতার মনে হচ্ছিল, কাছাকাছি যদি কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকতো তবে তাকে এখনি এত রাত্রে ঠেলে তুলে সব ঘটনা বর্ণনা করলে যেন আনন্দ দ্বিগুণিত হ'য়ে ফিরে পাবে। এই মিথ্যাভাষণের আনন্দ প্রণয়ের বিদ্যুৎ শিখার মতো তার আসন্ন বৈধব্যের শুভ্রশূন্যতার প্রান্ত বেষ্টন ক'রে চিরায়ুষ্মতীর রঙিন পাড় অঙ্কিত ক'রে দিল।

এর পরের ঘটনা অতিশয় সংক্ষিপ্ত। সুখদুঃখের বিধাতা, সুখের চেয়ে দুঃখ দিতে যিনি অধিকতর তৎপর, তিনি অন্তত একবারের জন্যেও অমিতের কথা রাখলেন। শমিতার শেষ চুড়িখানা নিঃশেষ হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই অমিতের জীবনান্ত ঘটলো।

সেদিন শমিতা যখন এলো—তার হাতে একখানাও চুড়ি নেই। সেদিন সকালেই শেষ চুড়ি ক'খানা বেচে যক্ষ্মাবাসের আগামী মাসের পাওনা সে মিটিয়ে দিয়েছে।

শমিতা নিজেই প্রসঙ্গ তুললো। কালকে ফিরবার পথে হঠাৎ মাঠের মাঝখানে 'বাস্'এর কল বিগড়ে গেল। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে, 'বাসে' আমরা দু'জন মাত্র যাত্রী—চারিদিক নির্জন, অনেক কিছুই ঘটতে পারতো। যাক্, কোন বিপদ অবশ্য ঘটেনি। আমি ফিরে গিয়েই স্থির করলাম—আর নয়। তখনি চুড়ি ক'গাছা খুলে তুলে রেখে দিলাম। কেমন ভাল করিনি?

অমিত ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল। তারপরে একদিন সব অবসান হ'ল। তার হাতের শুভ্রশঙ্খের ক্ষীণ শশীকলা শুক্লা চতুর্থীর নবযৌবনের অকাল দিগন্তে কখন খসে পড়ে গেল। তার সিঁথির সিঁদূরের শেষ রেখাটির চিহ্নমাত্রও আর কোন দিক্‌প্রান্তে রাখলো না। এতদিনে শমিতার নব নব মিথ্যাভাষণের শেষ আনন্দের অবকাশও অন্তর্হিত হ'ল।

অমিতের মৃত্যুর পরে যক্ষ্মাবাসের কর্তৃপক্ষ তার একখানি চিঠি শমিতাকে পাঠিয়ে দিল।

অমিত লিখছে—

"শমি,

তোমার জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। শুধু রইল আমার ভালবাসা, আর তোমার অলঙ্কারগুলো। তুমি এম-এ পাশ করেছ, কোনরকমে তোমার চলে' যাবেই জেনে আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে চললাম।

অমি।"

মিথ্যা কথার প্রতিদান অমিত মিথ্যা কথায় দিয়ে গিয়েছে। শমিতা চিঠি প'ড়ে ভাবলো—তবে তো উনি আমার মিথ্যা ধরতে পারেন নি। বিধাতার আশীর্বাদে মিথ্যাই আমার সত্যের চেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠলো। তবু কি তার সর্বত্যাগ অমিত জানতে পারলে শমিতা আরও বেশি সুখী হ'ত না! হয়তো হ'ত—নিশ্চয় ক'রে কে পরের মনের কথা বলতে পারে?

পণ্ডিতেরা বলেন কাজই নাকি মানবজীবনের লক্ষ্য। হয় তো তাই! কিন্তু এ সব অকাজের কথা ভাবিবার অবসরটুকু অন্তত পণ্ডিতদের আছে। আমার তাও নাই। আমার কর্মতালিকা দেখিলে পণ্ডিতদেরও স্বীকার করিতে হইত—কিছু বাড়াবাড়ি হইতেছে।

সকালে পাড়ায় দুটি ছেলে পড়াই। ছাত্র দুটির পিতা সত্যই পুত্রের শুভানুধ্যায়ী—পাঠের সময়ে তাঁরা কাছেই বসিয়া থাকেন—একটাও বাজে কথা বলিবার সময় পাই না। একজনের মাছ কিনিয়া দিবার ভার আমার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। উক্ত পিতা মৃদু হাসিয়া বলেন, মাস্টার মশায়, একবার বাজার থেকে······ওরে রামা সঙ্গে যা। আচ্ছা, আপনি এগোন—রামা যাচ্ছে।

বলা বাহুল্য রামা যায় না—আমি একাই যাই এবং মাছ কিনিয়া আনি।

চাকরের হাতে মাছ কিনিবার ভার দিলে চুরির আশঙ্কা; আমাকে দিয়া সে ভয় নাই, হাজার হোক নোব্‌ল প্রফেশানের লোক তো! বাঙালী পিতাদের প্রাইভেট্ টিউটারদের উপরে অগাধ বিশ্বাস।

আহারান্তে সাড়ে দশটায় আসল কর্মস্থলে যাই। আমি 'জুট-মিল বিদ্যাকেন্দ্রের' অধ্যাপক। দশটা হইতে ছাত্ররা আসিতে থাকে; এগারটার মধ্যে বাড়ি ভরিয়া যায়; আড়াই হাজার গাঁট ছাত্র সংখ্যা আমাদের। বছরে বছরে দেড় হাজার গাঁট শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিই; সেখানে ভালমন্দ মাঝারি দর কষা হইয়া থাকে। আমাদের কাজকে প্রায় নিষ্কাম বলা যাইতে পারে; বেতন এতই অকিঞ্চিৎকর, মাসের প্রথম দিনের পরে হাতে আর কিছু থাকে না। তবে নোব্‌ল প্রফেশানের লোক বলিয়া দোকানে বাকি পাওয়া যায়। হায়, হায়, লোক ঠকাইবার মরাল কারেজও আমাদের নাই—এ কথা সবাই জানিয়া ফেলিয়াছে। 'জুট-মিল

বিস্তাকেন্দ্রের' মালিক সুবিধাজনক পোষমানা একটা মৃগী ব্যারাম অর্জন করিয়াছেন, বেতন বৃদ্ধির কথা তুলিলেই তিনি মূর্ছা যান।

সন্ধ্যাবেলাতেও ছুটি নাই, রাত্রে 'জুট মিলে' বাণিজ্য শিক্ষা দিই। ব্ল্যাক আউটের রাত্রি, বাণিজ্য শিক্ষার উপযুক্ত সময় বটে। রাত্রি ন'টায় ছুটি। কলিকাতা শহরে নিতান্তই চৌকিদারি প্রথা নাই—নতুবা রাত্রিটা চৌকিদারি করিয়া কাটাইয়া দিতাম। কাজের জন্যই যখন মানুষের জন্ম তখন আর এটুকু ফাঁক থাকে কেন?

সেদিন রাত্রি ন'টার সময়ে 'জুট মিল' হইতে বাহির হইতেছি, সহকর্মী বলিলেন, চলুন বৈঠকখানা বাজার থেকে মাছ নিয়ে যাওয়া যাক। তার পরে একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন, রাত্রে ইলিশ মাছ সস্তা হয়।

আমি বলিলাম—চলুন।

মনে মনে ভাবিলাম, পরের জন্যই তো মাছ কিনিয়া আসিতেছি, নিজের জন্য তো কিনিবার কখনো অবসর হয় না।

সহকর্মী বাজারে ঢুকিয়া পড়িলেন, বুঝিলাম তিনি মাঝে মাঝে আসেন। ঝুড়ির মধ্যে স্নিগ্ধ চিক্কণ গঙ্গার ইলিশগুলি চক্রাকারে সজ্জিত, ছোট, বড়, মাঝারি; কোনটা বা তৃতীয়ার চন্দ্রকলা, কোনটা বা চতুর্থীর, কোনটা পঞ্চমীর, কোনটা ষষ্ঠীর।

সের, নয় সিকে। সহকর্মী বলিলেন, কাল যে দেড় টাকা ছিল। ওহে গণেশ—

গণেশ মৎস্য বিক্রেতা। সে যেন কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় অন্য একজন খদ্দের আসিতেই তার প্রতি মনোনিবেশ করিল। সহকর্মী আগামীকল্যের আশায় রহিলেন—আমার এই প্রথম (এবং শেষও বটে) তাই এক সেরের একটা মাছ কিনিয়া ফেলিলাম। সঙ্গে একটা কাগজের থলে ছিল —মাছটা তা'তে ভরিলাম। কেবল শুভ্র পুচ্ছটি বৃদ্ধের পাকা গোঁফের মতো বাহির হইয়া রহিল।

সহকর্মী বলিলেন, আপনি এগোন। বুঝিলাম, গণেশ ও তাঁহার মধ্যে এখন ধৈর্য পরীক্ষার দড়ি টানাটানি চলিতে থাকিবে।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে ট্রামে উঠিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রত্যেকখানা গাড়িতেই সূচীভেদ্য ভিড়। সাতখানা ট্রাম ছাড়িয়া দিয়া রবার্ট ব্রুসের কীর্তিকে

খর্ব করিয়া অষ্টম ট্রামে উঠিয়া পড়িলাম। ভিড়ের জন্য সরলভাবে দাঁড়ানো সম্ভব হয় নাই; দেহখানা তিন চার দফা বাঁকিয়া গিয়াছে, কিন্তু হাতে সেই খামখানা ঠিক আছে—তার ফাঁক দিয়া মৎস্য-পুচ্ছ দৃশ্যমান।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তারপরে যা ঘটিয়া গেল একটি মুহূর্তের মধ্যে। একজন পুছিল—কোথায় কিনলেন মাছটা?

—আজ্ঞে বৈঠকখানা বাজারে।

তিনজন সমস্বরে পুছিল—কত নিলে?

নোব্‌ল প্রফেশানের লোকেরা চেষ্টা করিলেও মিথ্যা কথা মুখে টানিয়া আনিতে পারে না। কিন্তু কে যেন আমার মুখ দিয়া বলিয়া ফেলিল—

—আজ্ঞে পাঁচসিকে।

ট্রামের সেই স্ূচীভেদ্য জনতা ঐক্যতানে চিৎকার করিয়া উঠিল—পাঁচসিকে!

ট্রামখানা ঘুরিয়া যেমনি শিয়ালদ' স্টেসনের মুখে থামিয়াছে, অমনি সেই জনতা মুহূর্ত মধ্যে একজনবৎ ট্রাম হইতে নামিয়া পড়িল—এবং পরক্ষণেই 'বিশেষ ধরণের লরি' অগ্রাহ্য করিয়া বৈঠকখানা বাজারের মুখে ছুটিয়া চলিল। কে বলিল বাঙালির মধ্যে একতার অভাব? তবে তেমন তেমন উপলক্ষ্য চাই।

ট্রাম খালি হইয়া গেল। নিতান্ত কর্তব্যবোধে না বাধিলে বোধ করি কন্‌ডাক্‌টার ও ড্রাইভারও যাইত। আরামে বসিয়া পড়িলাম। বাঙালির মৎস্য-প্রীতি ও যুদ্ধের বাজার সম্বন্ধে অনেক কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম, কেবল ভয় ছিল হতাশ জনতা দ্রুততর বেগে ফিরিয়া আসিবার আগে ট্রামখানা এ অঞ্চল ছাড়িয়া গেলে হয়। ব্যাপারখানা হাস্যকর, মনে মনে একটু হাসিলামও বটে। কিন্তু তখনও কি জানিতাম এই মৎস্যক্রয় মাৎস্যন্যায়ে পরিণত হইবে।

নির্বিঘ্নে বাসায় পৌঁছিলাম। গৃহিণীর হাতে মাছটি দিলাম।

—কত নিলে?

—পাঁচসিকে।

বারংবার আবৃত্তির ফলে মিথ্যাও না কি সত্য হইয়া ওঠে—

পাঁচসিকে!

গৃহিণীর মুখে এই প্রথম আমার বুদ্ধির প্রতি প্রশংসার আভা দেখিলাম।

তারপরে আমাকে ছাড়িয়া মাছটি লইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে মাছটি ছাড়িয়া চাকরকে লইয়া পড়িলেন।

—হাঁ, হরি, তুমি মাছ কিনতে গেলে তিন টাকা সের লাগে—আর দেখ তো বাবু কেমন পাঁচসিকের মাছ কিনে এনেছে।

হরি কি যেন বলিতে গেল কিন্তু গৃহিণীর ব্লিৎসক্রিগের সম্মুখে সে দাঁড়াইতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে হরিকে আর দেখা গেল না। হরি খদ্দর পরে, মেদিনীপুরের লোক, তার আত্মসম্মান কিছু উগ্র। সে যে চৌরাপবাদে পলাইবে—কিছু বিস্ময়ের নয়।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপারও ছিল। খবরের কাগজ খুলিতেই চোখে পড়িল, বৈঠকখানার বাজারে দাঙ্গা। মৎস্য ক্রেতা ও জেলেদের মধ্যে মাছের দর লইয়া ছোটখাটো এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না—এ আমার সেই মৎস্য-লোলুপ জনতার কীর্তি।

বিকাল বেলা বেড়াইতে বাহির হইব, এমন সময়ে গৃহিণী আমার হাতে পাঁচসিকে পয়সা দিয়া বলিলেন—আসবার সময়ে কালকের মতো একটা মাছ নিয়ে এসো।

কি সর্বনাশ! এ জন্য তো প্রস্তুত ছিলাম না। বলিলাম—আজ তো 'জুট-মিল' ছুটি। রবিবার যে।

গৃহিণী বলিলেন—কিন্তু বাজার তো ছুটি নয়। ও বেলা আবার বাজার হয়নি, চাকর পালিয়েছে।

তারপরে আরো তিন দফা পাঁচসিকে হাতে দিয়া বলিলেন—ওই তিন বাড়ির গিন্নীরা দিয়েছে—তাদের জন্যেও তিনটা।

পাড়াতে তিনটি বাড়ির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আছে। আমার গৃহিণী দুপুরবেলা সে সব বাড়িতে গিয়া স্বামীর অসাধারণ সাফল্যের বার্তা ঘোষণা করিয়াছেন এবং আসিবার সময়ে মাছের সুলভ মূল্য লইয়া আসিয়াছেন।

অগত্যা গৃহিণীর স্বামীর মর্যাদা রক্ষার জন্য চার দফা পাঁচসিকে পয়সা লইয়া যাত্রা করিলাম। বাজারে পৌঁছিয়া ভাবিলাম যা করেন সিদ্ধিদাতা গণেশ।

সিদ্ধিদাতা গণেশই বটে। পূর্বোক্ত গণেশ তখন দুই ঘটি সিদ্ধি ঘুঁটিয়া পার্শ্ববর্তীর হাতে এক ঘটি দিতেছিল। সে আমাকে দেখিয়াই চিনিল। নোব্‌ল প্রফেশানের লোক দেখিলেই চেনা যায়।

—কত করে হে ?

—আজ্ঞে তিন টাকা।

—সে কি হে ?

—আজ মাছের আমদানী কম।

মাছেরাও সুযোগ বুঝিয়া ধর্মঘট করিয়া বসিয়াছে। চারিটি মাছ কিনিয়া বাড়ি ফিরিলাম। জুতা কিনিবার জন্য একখানা দশ টাকার নোট রাখিয়াছিলাম—সেখানা ঘাটতির পথে গঙ্গার ইলিশের পিছনে গঙ্গাজলে গিয়া পড়িল। সবটা জলে পড়িলেও সান্ত্বনা ছিল—অধিকাংশই সিদ্ধিদাতা গণেশের ফাঁকে আটকাইয়া রহিল।

নিজের ও পরের গৃহিণীরা আমার বিস্ময়কর চাতুর্যে খুশী হইলেন।

পরদিন শুনিলাম তাঁদের চাকর তিনটিও পলাতক। সকলেই মেদিনীপুরের লোক—খদ্দর পরে।

তারপর হইতে এখন সন্ধ্যাবেলা নিয়মিতভাবে ঘাটতি দিয়া গঙ্গার ইলিশ আমদানি করিয়া পাড়ার গৃহিণীদের বিস্ময় উদ্রেক করিতেছি। কিন্তু এমন করিয়া আর কয়দিন চলিবে ? 'জুট-মিল' হইতে বেতনের মধ্যে কিছু অগ্রিম লইয়াছিলাম, তাহাও নিঃশেষ। এখন কি করিব ?

সত্য কথা বলিব কি ? না, মাছ খাওয়া ছাড়িব ? না, মাছ কন্‌ট্রোল হইয়াছে বলিব ? কন্‌ট্রোল হইলেই যে দাম বাড়ে—একথা গৃহিণীরাও জানেন।

সত্য বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না—বিনয় বলিয়া উড়াইয়া দিবে। মাছ খাওয়া ছাড়িলেও সকলকে তো ছাড়াইতে পারিব না, কাজেই ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই। কন্‌ট্রোল ? ওকথা চলিবে না—গৃহিণীরা নিয়মিত কাগজ পড়া উপলক্ষ্যে ঘুমাইয়া থাকেন।

মিথ্যা বলাতে যে এমন ক্ষতি তাহা জানিলে কে না সত্য বলিবে !

ইলিশ মাছের সময়টা গেলেও বাঁচা যায়, কিন্তু তার অনেক আগেই যে আমার তিন মাসের অগ্রিম বেতনও যাইবে !

কি করিব ভাবিতেছি—এমন সময়ে পূজাসংখ্যার লেখার জন্য তাগিদ আসিল! লক্ষ্মীর টানাটানিতে যে সরস্বতী এমন সাহায্যার্থ আসিতে পারেন, শাস্ত্রকারেরা কি তা ভাবিতে পারিয়াছিলেন? স্থির করিলাম দেশের উপকারের জন্য ঘটনাটা লিখিয়া ফেলি না কেন? ঘাটতির কিয়দংশ যদি উঠিয়া আসে নিজের উপকারও হইতে পারে। নিজের ও পাড়ার গৃহিনীরা অবশ্যই পড়িবেন—চাই কি আমার প্রতি দয়া হইলেও হইতে পারে।

নাঃ, সে ভরসা বড় নাই। একবার রসিক বলিয়া খ্যাতি রটিয়া গেলে তার দুঃখে আর কেহ বিশ্বাস করে না—না 'জুট-মিল বিদ্যাকেন্দ্রে', না বাড়িতে!

পেস্কার বাবু

জজের পেস্কার রতনমণি বাবু পঁয়ত্রিশ বছর কাজ করিবার পরে পেন্সন লইলেন।

সেদিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। অন্যদিনের মতোই রতনমণি বাবু আদালতে আসিলেন, সেই বুকের কাছে প্লেট-দেওয়া পুরানো ধরণের শার্টের উপরে তৈলাক্ত চাদরখানা ভাঁজ করিয়া রক্ষিত; ঘরে ঢুকিয়াই দেওয়াল-ঘড়ির দিকে একবার তাকাইলেন, ঘড়িটা ঠিক চলিতেছে বলিয়া যেন তাহাকে উৎসাহ দিলেন, যেমন উৎসাহ দেয় ক্লাসটিচার ঘরে ঢুকিয়া পাঠ-নিরত ভালো-ছেলেটিকে; তারপরে চেয়ারখানা রুমাল দিয়া বেশ করিয়া ঝাড়িয়া লইয়া সন্তর্পণে বসিয়া পড়িলেন; চাদরখানা গলা হইতে খুলিয়া চেয়ারের হাতলে জড়াইয়া পকেট হইতে চশমার ভাঙা খাপটি বাহির করিলেন; চশমার কাঁচ যতই পরিষ্কার থাক না কেন কোঁচার খুঁট দিয়া অন্তত পাঁচ মিনিট ধরিয়া পরিষ্কার করিবেন; তারপর চশমা পরিয়া লইয়া আর একবার ঘড়ির দিকে তাকাইবেন —ভাবটা যেন বিনা চশমায় দৃষ্টিতে ফাঁকি দিয়াছ কি না এইবার দেখিব; ঘড়ি নিতান্ত সুবোধ বালকের মতো চলিতেছে দেখিয়া সমর্থন-মূলকভাবে একবার হাসিলেন; তারপরে ভাঙা গলায় হাঁক দিবেন—রঞ্জন, জল! রঞ্জন আদালতের বেয়ারা—সে এক গেলাস জল আনিয়া দেয়। রতনমণি বাবুর নিজস্ব একটি চিহ্নিত গেলাস আছে। রঞ্জন তাঁহার গেলাসে একটা চিহ্ন করিয়া রাখিয়াছিল পাছে ভুল ভ্রান্তি হয়। সে সেই চিহ্নটা পেস্কার বাবুর দিকে ফিরাইয়া গেলাসটা হাতে দেয়, কিন্তু তিনি এত সহজে ভুলিবার লোক নহেন, তাঁহার নিজের একটি গোপন চিহ্ন আছে, গেলাসটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেটা দেখিয়া লইয়া এক নিঃশ্বাসে জলটা আলগোছে পান করিয়া ফেলিয়া একটা তৃপ্তির দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন—গেলাসটা রঞ্জনের হাতে ফিরাইয়া দিতে দিতে বলেন—বেঁচে থাক্ বাপু! কেমন, বাড়ীর সব ভালো তো!

তাঁহার নিত্যকার নিয়ম এই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হইলে অন্যান্য আমলারা আসিতে থাকে, দু'চারজন করিয়া উকীল বাবু আসিতে থাকেন—সবাই ঘরে ঢুকিয়া বৃদ্ধ রতনমণি বাবুকে একটা করিয়া নমস্কার করে—কিন্তু তখন তাঁহার

বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—তিনি স্তূপীকৃত নথীর গাদার মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন—কেবল যখন জজসাহেব আসেন তখন তিনি যন্ত্র চালিতের মতো উঠিয়া একবার মাথা বাঁকাইয়া নমস্কারের ভঙ্গী করিয়া বসিয়া পড়েন—নথীর গাদার মধ্যে হইতে তখন তাঁহাকে টানিয়া বাহির করা সব সময়ে জজের সাধ্যেও কুলায় না।

ইহাই রতনমণি বাবুর নিত্যকার অভ্যাস—এই রকম পঁয়ত্রিশ বছর ধরিয়া চলিতেছে। অবশ্য প্রথমদিকে তিনি পেস্কার ছিলেন না—কিন্তু সে সব এখন স্মৃতির বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। শহর সুদ্ধ লোক তাঁহাকে পেস্কারবাবু বলিয়া জানে, আদালত সংক্রান্ত সবাই তাঁহার অতি তুচ্ছ অভ্যাসটির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত।

আদালতের সবাই জানিত টিফিনের সময়ে পেস্কার বাবুকে কোথায় দেখা যাইবে। উত্তরদিকের বটগাছটার তলায় কাঠের ঘরখানায় মোতি ময়রার প্রসিদ্ধ সন্দেশের দোকান, সেখানে একটি কাঠের টুলের উপরে পেস্কার বাবু আসিয়া বসেন, ময়রা শশব্যস্তে কলার পাতে করিয়া দুটি বড় সন্দেশ রতন বাবুর হাতে দেয়—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে সন্দেশ দুটি গলাধঃকরণ করেন—তখন মোতি ঘটি হইতে তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দেয়, তিনি পান করেন; মোতির অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি গেলাসে জল গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। সত্য কথা বলিতে কি আমাদের রতনমণি বাবু একটু শুচিবায়ুগ্রস্ত। মোতি কলার পাতার ঠোঙায় টাটকা সাজা তামাকের কল্কেটি তাঁহার হাতে দেয়—রতনমণি বাবু ধূমপান করেন, অতিরিক্ত ধূমপানে তাঁহার গোঁফের প্রান্ত তামাটে হইয়া গিয়াছে। রতনমণি বাবু উঠিয়া পড়িতেই আর সকলে তাড়াতাড়ি জলযোগ ও বিশ্রাম সারিয়া নেয়—এবারে পুনরায় আদালত বসিবে। মোতি ময়রা পেস্কার বাবুকে বড় খাতির করে—তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই অন্যান্য কর্মচারী ও উকীলের মুহুরিরা তাহার দোকানে জলযোগ করে। মোতি রতনমণি বাবুর প্রিয় সন্দেশের নাম রাখিয়াছে 'পেস্কার-ভোগ'।

আমাদের রতনমণি বাবু কি ঘুষ লইতেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। মাছ যেমন জলে বাস করে, মানুষ যেমন বাতাসে বাস করে, আদালতের জীবগণ তেমনি ঘুষের মধ্যে বাস করে। কিন্তু রতনমণি বাবু সম্বন্ধে এ বিষয়ে দ্বিমত আছে। তাঁহার বন্ধুরা বলে তিনি ঘুষ নিয়া থাকেন,

শত্রুরা বলে ঘুষ লইবার মতো সাহস তাঁহার নাই। কিন্তু আমাদের মতো নিরপেক্ষ লোকের অভিজ্ঞতা এই যে তিনি ঘুষ নেন এবং নেন না। অর্থাৎ সারা বছর ঘুষ নেন না। কিন্তু বিজয়া দশমীর পরে যেদিন আদালত খোলে, সেদিনটা তিনি ঘুষ নিয়া থাকেন। সেদিন একখানা বড় রুমাল তাঁহার টেবিলের উপর পাতিয়া দেন, অর্থী, প্রার্থী, দারোয়ান, চাপরাশি, আমলাগণ এমন কি অনেক জুনিয়ার উকীল পর্যন্ত সাধ্যানুযায়ী টাকাটা সিকেটা দেয়। আদালত শেষ হইলে ভারি রুমালখানায় তোড়া বাঁধিয়া একবার মাথায় ঠেকাইয়া পকেটে ভরিয়া তিনি বাড়ী যান এবং গৃহিনীকে ডাকিয়া সন্তর্পণে তাঁহার হাতে দিয়া বলেন—'ভালো করিয়া তুলিয়া রাখিও—মায়ের আশীর্বাদ।'

ইহাই রতনমণি বাবুর জীবনের রুটিন। ইহাই তাঁহার পঁয়ত্রিশ বছরের রুটিন, পঁয়ত্রিশকে তিন শ পঁয়ষট্টি দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা দাঁড়ায়—তাহার অভ্যাস, কেবল ছুটির ক'টা দিন ছাড়িয়া দিতে হইবে। সেই রতনমণি বাবুর আজ আদালত জীবনের শেষ দিন—কাল হইতে তাঁহার পেন্সন জীবন শুরু হইবে।

আদালতের কাজ শেষ হইল মাত্র—নাজির বাবু আসিয়া রতনমণি বাবুর কানে কানে বলিলেন—পেস্কার বাবু, একবার এদিকে আসবেন। নাজির বাবুকে অনুসরণ করিয়া তিনি নাজির বাবুর আফিস ঘরে গিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—বহুলোক সেখানে সমবেত—সবাই আদালতের কর্মচারী, নাজির, সেরেস্তাদার হইতে চাপরাশি পর্যন্ত সবাই আছে।

তিনি নাজির বাবুকে কহিলেন—এ আবার কি ?

নাজির বাবু তাঁহাকে একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—বসুন।

ব্যাপার আর কিছুই নয়। রতনমণি বাবুর বিদায় উপলক্ষ্যে আদালতের কর্মচারিগণ একটি প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছে মাত্র।

সকলের সম্মতিক্রমে নাজির বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে মুন্সেফের পেস্কার যে ছোকরাটি স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে জনার অভিনয় করিয়া মহিলাগণের অশ্রু ও ভদ্রমহোদয়গণের করতালি আকর্ষণ করিয়া থাকে, সে হার্মোনিয়ম বাজাইয়া স্বরচিত সঙ্গীত আরম্ভ করিল—

"সত্যই কি তুমি যাবে চলে
আমাদের একা ফেলে—
মোরা অসহায়—"

করতালির মধ্যে সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে নাজির বাবুর আহ্বানে বক্তারা একে একে রতনমণি বাবুর গুণ বর্ণনা ও তাঁহার বিদায়ে তাঁহাদের দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন—আর রতনমণি বাবু মূঢ়ের মতো বসিয়া বসিয়া সমস্ত দৃশ্যটি দেখিতে লাগিলেন—যেন ইহার প্রকৃত তাৎপর্য তিনি গ্রহণ করিতে অশক্ত।

অবশেষে সকলের বক্তব্য শেষ হইলে নাজির বাবু দু'চার কথায় মনোভাব প্রকাশ করিতে রতনমণি বাবুকে অনুরোধ করিলেন। রতনমণি বাবু উঠিয়া বলিলেন—'আজকার মতো যাওয়া যাক—কাল আবার দেখা হবে।' এই বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল পেস্কার বাবু অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন—দেখিলে না তাঁহার কণ্ঠস্বর কি রকম গদগদ। লোকে যাহাই বলুক, আমরা জানি রতনমণি বাবু পেন্সন লইবার মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই আদালতেই তাঁহার জীবন, এখানে তাঁহার জীবনের পঁয়ত্রিশ বছর কাটিয়াছে, পঁয়ত্রিশ বছর ত অনেকেরই জীবনের আদ্যন্ত, সেখান হইতে যে একদা তাঁহাকে অকস্মাৎ বিদায় লইতে হইবে ইহা কখনও তিনি ভাবেন নাই—আজও তাহা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বলিলেন—'আজকার মতো যাওয়া যাক, কাল আবার দেখা হবে।'

সভাভঙ্গে প্রচুর জলযোগের আয়োজন ছিল—'পেস্কার-ভোগ' সন্দেশ। জলযোগান্তে যে যাহার গৃহে রওনা হইল—রতনমণি বাবুও নিত্যকার মতো চাদরখানা কাঁধের উপর ফেলিয়া আদালত ত্যাগ করিলেন।

পরদিনও নিত্যকার মতো বেলা দশটায় চাদরখানা কাঁধের উপরে ফেলিয়া যখন রতনমণি বাবু বাহির হইতে উদ্যত, তখন গৃহিণী বলিলেন—কোথায় চললে আবার?

রতনমণি বাবু নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন—কেন, আজ কি নতুন দেখছ না কি? আমি দশটায় যাই তা কি জানো না?

বিস্মিত গৃহিণী বলিলেন—তোমার যে পেন্সন হয়েছে।

কিন্তু গৃহিণীর সব কথা তাঁহার কানে পৌঁছিল না, অনেক আগেই তিনি গৃহিণীর কণ্ঠস্বরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

● প্রমথনাথ বিশীর ●

আদালতে পৌঁছিয়া রতনমণি বাবু দেখিলেন যে, শ্যামাচরণ নামে একজন জুনিয়ার কেরাণী পেস্কার পদে উন্নীত হইয়া তাঁহার বহুকালের চেয়ারখানি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। রতনমণি বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—ও তুমি এখানে বসেছ? আচ্ছা, ব'সো ব'সো, আমি ওঘরে বসছি। এই বলিয়া তিনি সেরেস্তাদারের ঘরে গিয়া একখানা শূন্য চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে কেরানীকুলে ও অর্থী প্রার্থীতে আদালত পূর্ণ হইয়া উঠিল। সবাই রতনমণি বাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। ব্যাপার কি? আবার তিনি কেন? পেন্সন লইয়া মানুষে দুপুরটা সুখে ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিবে। নতুবা কাশীবাস করিবে—কিন্তু রতনমণি বাবুর সবই নূতন!

সেরেস্তাদার পুছিলেন—দাদা, আপনি এখানে যে?

রতনমণি বাবু প্রশ্নটা ভুল বুঝিয়া বলিলেন—হাঁ, আর আদালতে বস্‌বো না, ছেলেমানুষদেরও একটা সুযোগ দেওয়া চাই। তাই শ্যামাচরণকে দিলাম ওখানে বসিয়ে। ছেলেমানুষ পাছে ভুলভ্রান্তি করে—তাই আমি রইলাম মাথার উপরে।

তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন—দাও, তোমাদের হাতে বেশি কাজ থাকলে দাও, একবার দেখি।

অতিরিক্ত কাজ পাইবার আশায় তিনি মোটেই বঞ্চিত হইলেন না। অনেকগুলি খাতা ও নথী তাঁহার টেবিলের উপর আসিয়া পড়িল। রতনমণি বাবু এক মুহূর্তে নথীর ডুবজলে অন্তর্হিত হইলেন। টিফিনের ফাঁকে নিয়মিতভাবে টিফিন সারিয়া আসিলেন। তারপরে আবার কাজ—এইভাবে পাঁচটা পর্যন্ত চলিল। পাঁচটা বাজিলে চাদর লইয়া রতনমণি বাবু উঠিয়া পড়িলেন।

রতনমণি বাবুর পেন্সন হইয়াও ছুটি হইল না। তিনি আগেকার মতই নিয়মিত সময়ে আসেন, সেরেস্তাদারের ঘরে বসিয়া বাড়তি কাজকর্ম করেন, ছুটি হইলে আগেকার মতই বাড়ী চলিয়া যান। সবাই তাঁহাকে বড় পেস্কার বাবু বলে, শ্যামাচরণের নাম হইয়াছে ছোট পেস্কার বাবু। টিফিনের অবকাশে শ্যামাচরণের সঙ্গে দেখা হইলে রতনমণি বাবু তাঁহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলেন —শ্যামাচরণ কোন ভয় নাই, মাথার উপরে আমি। আর ভয়ই বা কিসের? নথী ঠিক থাকলে কেউ কিছু বলতে পারবে না! তবে শোন একটা গল্প বলি,

—একবার এক জজ সাহেব এল—মিঃ রঙ্গনাথম্। এদিকে মাদ্রাজী—যেমন রং, তেমনি চেহারা, কিন্তু মেজাজে সাহেবের বাবা! আসছে মেদিনীপুর থেকে, আমি আগেই খবর পেয়েছি ; ওখানকার নাজির আমার বন্ধু কি না! সে লিখে পাঠালো—দাদা, এবারে বাঘ যাচ্ছে—এখানকার তিনটে পেস্কারের চাকরি খেয়েছে, সাবধানে থেকো। আমি লিখে পাঠালাম, ভয় ক'রোনা—এখানে বাঘের ঘোগ আছে। জজ সাহেব তো চেষ্টায় আছেন আমার ভুল ধরবেন—হঠাৎ যখন তখন নথী তলব ক'রে বসেন। নাঃ, কোন দিনও কোন খুঁত পান না। অবশেষে যাওয়ার সময়ে সাহেব বলে গেলেন—পেস্কার বাবু, আপনার মতো 'এফিসিয়েণ্ট অফিসার' এর আগে আমি দেখিনি। তবেই তো দেখ্‌লে নথী ঠিক থাকলে কারো বাপের সাধ্য নেই কিছু বলে।

এই অত্যাশ্চর্য কাহিনী বলিয়া অবশেষে গলা খাটো করিয়া শ্যামাচরণের কানে কানে বলেন—আর একটা কথা, বিজয়া দশমীর পরে কাছারী খোলার দিন ছাড়া কখনো যেন 'দর্শনী' নিয়ো না!

রতনমণি বাবু 'ঘুষ' শব্দের পরিবর্তে 'দর্শনী' শব্দ ব্যবহার করেন। শ্যামাচরণ সব মন দিয়া শোনে—নথী ঠিক রাখিতেও তাহার আপত্তি নাই তবে শেষের উপদেশটি সে কি ভাবে পালন করিত সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় প্রবেশ না করিলেই তাহার প্রতি সুবিচার করা হইবে।

এই ভাবে দিনের পরে দিন, মাসের পরে মাস অতিবাহিত হয়। বড় পেস্কার বাবু পেন্সন লইয়াও আদালতের কর্মচারী শ্রেণীভুক্ত হইয়া কাজ করেন। কর্মচারীরা অপচ্ছন্দ করে না, একে তো সবাই তাঁহাকে ভালোবাসে, তা ছাড়া হাতের কাজটা তাঁহার কাছে ফেলিয়া দিলে সম্পন্ন হইয়া যায়। সবাই জানে বিজয়া দশমীর পরে বড় পেস্কার বাবুর রুমালে কিছু দিতে হইবে—প্রধানতঃ কর্মচারীরাই দেয় ; আগেকার মত তোড়া তেমন ভারি হয় না। রতনমণি বাবু হাসিয়া বলেন—পেন্সেনের মতো দর্শনীও আমার অর্ধেক হ'য়েছে।

আসল কথা, মানুষের জীবন ধারণের জন্য একটা মোহের আবশ্যক। তাই একটা না একটা মোহের সে সৃষ্টি করিয়া লয়। হাঁসের ডিমের ভিতরকার পাখীর পক্ষে যেমন ডিমের প্রয়োজন, নহিলে কোমল অঙ্গে বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিবে কেমন করিয়া? মানুষের পক্ষেও তেমনি প্রয়োজন একটা আবরণের। পাখীটা একটু শক্ত হইলেই খোলস ভাঙ্গিয়া আকাশে উড়িয়া যায়

হংসরূপে ; ভগ্নমোহ মানুষও তেমনি কৈবল্যের আকাশে পরমহংসরূপে উড়িতে থাকে। কিন্তু তেমন সৌভাগ্য কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ? অধিকাংশের জীবন ধারণের পক্ষে মোহাবরণ অত্যাবশ্যক। এই বড় পেস্কারের ভূমিকা রতনমণি বাবুর মোহাবরণ—ইহার ভঙ্গে হয় তাঁহার মুক্তি, নয় তাঁহার মৃত্যু।

রতনমণি বাবুর পেন্সন লইবার পরে প্রায় দশ বৎসর গত হইয়াছে। এখন তিনি প্রায় চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধ। তবু তাঁহার আদালতে আসিবার কামাই নাই। একজন চাকরে তাঁহাকে বাড়ী হইতে ধরিয়া আনিয়া পুরাতন চেয়ারখানাতে বসাইয়া দেয়। দৈবাৎ চেয়ার বদল হইলে তিনি ব্যস্ত হইয়া ওঠেন—বলেন, আমার চেয়ারখানা গেল কোথায়। তাঁহার চেয়ার খুঁজিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হয়—তিনি বসিয়া পড়িয়া চোখ বুঁজিয়া একটা আরামের দীর্ঘ 'আঃ' শব্দ করেন। রতনমণি বাবু প্রায় অন্ধ, চোখে অল্পই দেখেন—হাতে কলম সরে না, তবু এক গাদা নথী তাঁহার সম্মুখে রাখা চাই—তিনি সেগুলি নাড়াচাড়া করেন। এরূপে অভিনয় সাঙ্গ হইলে কাছারীর শেষে আবার চাকরের সাহায্যে বাড়ী ফিরিয়া যান। এই রকম চলিতেছে—হয় তো তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ভাবেই চলিত—কিন্তু ইতিমধ্যে এক বিঘ্ন ঘটিল। সে বিঘ্ন আর কিছুই নয় ; এক বাঙালী আই-সি-এস-যুবক জজরূপে বদলি হইয়া আসিলেন। মাঝে মাঝে তিনি আদালতের সেরেস্তা প্রভৃতি পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে কড়া তামাকের পাইপ টানিতে টানিতে এঘরে ওঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই জাতীয় পরিদর্শনে রতনমণি বাবুর ভয়ের কোন কারণ ছিল না—কারণ ইতিপূর্বে একাধিক জজ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে নাই ; বুড়া মানুষের এই ছেলেমানুষিকে তাঁহারা স্নেহের চক্ষেই দেখিয়াছেন ; একজন ইংরাজ জজ তো তাঁহাকে 'গ্র্যাণ্ড পা অব্ দি কোর্ট' পদবী আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণ বাঙালী আই-সি-এস সেরেস্তাদারের অফিসে প্রবেশ করিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে রতনমণি বাবুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রতনমণি বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিলেন। জজ সাহেব তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সেরেস্তাদারকে ইংরাজিতে পুছিলেন—এই বৃদ্ধ লোকটি কে ?

সেরেস্তাদার বলিলেন—আমাদের পুরাতন পেস্কার বাবু।

বাঙালী জজ পাইপ কামড়াইতে কামড়াইতে বলিলেন—লোকটা এখানে কেন? সেরেস্তাদার বাবু দীর্ঘ-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলে মধ্য-পথে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া জজ বলিলেন—লোকটাকে বাহির হইয়া যাইতে বলো।

রতনমণি বাবু যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন—কর্তব্য-পরায়ণ বাঙালী জজ হাঁকিলেন—চিপ্‌রাশি—

চাপ্‌রাশি শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিল। জজ বলিলেন—বাবুকো বাহার দেখ্‌লাও। চাপরাশি রতনমণি বাবুর হাতে ধরিয়া আদালতের বাহিরে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। রতনমণি বাবুর চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল। অন্ধের চোখে দৃষ্টি নাই—কিন্তু জল আছে। কর্তব্য সমাধান করিয়া শিষ্‌ দিতে দিতে বাঙালী জজ খাস কামরায় ফিরিয়া গেলেন। কে বলিবে বাঙালী কর্তব্যপরায়ণ নহে?

বাড়ী ফিরিয়া সেই রাতেই রতনমণি বাবুর বিষম জ্বর হইল—এবং অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জ্বর ঘোর বিকারে পরিণত হইল। খবর পাইয়া আদালতের কর্মচারিগণ দেখিতে গেল—কিন্তু চৈতন্যহীন রতনমণি বাবু কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। ডাক্তার জবাব দিয়া চলিয়া গেল, বন্ধুরা হতাশ্বাসে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—আর মুমূর্ষু রতনমণি বাবু বিকারের ঘোরে নথীর নম্বর হাঁকিয়া যাইতে লাগিলেন—

৭৭৩।২১ খাজনা

৩৯৩।২৩ মর্টগেজ

২৯১।২৪ মোৎফরাক্কা

…চিপ্‌রাশি, বাবুকো বাহার দেখ্‌লাও…

…হুজুর, আমার নথী ঠিক আছে…

…না, না, আমি বাইরে যাবো না…

…শ্যামাচরণ, নথী ঠিক থাকলে আর কোন ভয় নাই…

…চিপ্‌রাশি, বাবুকো বাহার দেখ্‌লাও…

…হুজুর, আমার নথীপত্র সব ঠিক আছে…

…না…না…আমি বাইরে যাবো না…

৭৭৩।২১ খাজনা

৩৯৩।২৩ মর্টগেজ

২৯১।২৪ মোৎফরক্কা···

সবাই বুঝিল আর কোন আশা নাই। তাহারা নীরবে দাঁড়াইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিল—আর মুমূর্ষু পূর্বোক্তরূপ বকিয়া যাইতে থাকিল।

···না, না, হুজুর আমার নথী ঠিক আছে···

···৭৭৩।২১ খাজনা···

এইরূপ বকিতে বকিতে মুমূর্ষু ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিকারের উক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগে ঠিক আদালত ভাঙিবার সময়ে রতনমণি বাবু শেষনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এখানকার আদালতের লীলা তাঁহার শেষ হইল। বোধ করি উচ্চতর কোন আদালতে নথী পেশ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্থান করিলেন। প্রকৃতিস্থ মানুষের কথার চেয়ে বিকারের রুগীর কথাই এ ক্ষেত্রে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য···হুজুর, আমার নথীপত্র সব ঠিক আছে। উচ্চতর আদালতে তাঁহার নথীতে কোথাও ভুলভ্রান্তি বাহির হইবে না, আর সেখানকার জজ যতই কর্তব্যপরায়ণ হোক এই বৃদ্ধকে চাপ্‌রাশি দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিবে না, ইহাও একপ্রকার নিশ্চিত।

গদাধর পণ্ডিত

নরেশচন্দ্র পাটের হাকিম হইয়াছে। জোড়াদীঘি গ্রামে তাহার আফিস। চাকুরিটি পাইয়া তাহার ভরসা হইয়াছিল, কলিকাতায় না হোক কোন জেলা-শহরে সে থাকিতে পাইবে। কিন্তু এমনি তাহার ভাগ্য যে, জেলা তো দূরে থাকুক, মহকুমাতে থাকাও ঘটিয়া উঠিল না—একেবারে গ্রামে আসিয়া বসিতে হইল। গ্রামে থাকিবার হুকুম পাইয়া তাহার কলিকাতাবাসী মন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া উঠিল—এমন কি একবার চাকুরি ইস্তফা দিবার কথাও চিন্তা করিয়া ফেলিল, কিন্তু বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের উৎপাতে কোন সৎকার্য করিবার কি উপায় আছে? তাহারা বুঝাইল, সরকারী চাকুরি হেলায় হারাইবার বস্তু নয়, বিশেষ করিয়া চিরকালই যে তাহাকে গ্রামে থাকিতে হইবে এমন নয়; চাকুরি পাকা হইলেই চেষ্টাচরিত্র করিয়া শহরে ট্রান্সফার হইলেই চলিবে—এমন কত হইয়াছে। তা ছাড়া গ্রামে থাকিবার কতকগুলি সুবিধাও আছে, যেমন অনেক জিনিস খুব সুলভ, আর অনেক জিনিস আদৌ মেলে না—কাজেই সে সব কিনিয়া বৃথা অর্থব্যয় করিতে হয় না। আর গ্রামে সে-ই একমাত্র সরকারী চাকর, কাজেই অখণ্ড সম্মান ভোগ করিতে পারিবে—শহরে পাটের হাকিমকে চেনে কে? এই সব যুক্তির তাড়নায় আর প্রয়োজনের তাড়াতেও বটে নরেশচন্দ্র জোড়াদীঘিতে গিয়া কাজে যোগ দেওয়া স্থির করিয়া ফেলিল।

ইহা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল, যাহা তাহার বন্ধুবান্ধবেরা জানিত না, কিন্তু পাঠকের জানিতে বাধা নাই নরেশচন্দ্র অল্পবয়স হইতেই আদর্শবাদী। ইস্কুলে পড়িবার সময়ে সে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতাদি শুনিত ও কাগজে পড়িত। তখন হইতেই সে স্থির করিয়াছিল যে গ্রামে গিয়া দেশের উন্নতি করিবে। কলেজে ঢুকিয়া রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' পড়িয়াছে, গান্ধীজীর 'হরিজন' নিয়মিত পড়িত। কাজেই ইস্কুলের আদর্শবাদ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কিন্তু অবশেষে সত্য সত্যই একদিন যে তাহাকে গ্রামে যাইতে হইবে, তাও আবার পাটের হাকিম হইয়া—ইহা স্বপ্নাতীত ছিল। কলিকাতায় থাকিয়া গ্রামের উন্নতি—এই ছিল তাহার স্বপ্ন। হঠাৎ তাহার

মনে হইল বিধাতা পুরুষ নিতান্ত কৃপাপরবশ হইয়াই গ্রামে তাহার চাকুরি করিয়া দিয়াছেন—গ্রামের ও নিজের উভয়েরই উন্নতি হইবে—'এক ঢিলে দুই পাখী' প্রবাদের বাহিরেও মরে।

এমন সময় সে শহর হইতে তাহার বাল্যবন্ধু অভয়কুমারের এক পত্র পাইল। অভয়কুমার লিখিয়াছে যে, সে আজ কয়েক বৎসর সেখানে ইস্কুলের সাব-ইন্সপেক্টররূপে রহিয়াছে। শহরের অধীনেই জোড়াদীঘি গ্রাম ; এই পথ ছাড়া জোড়াদীঘিতে যাইবার উপায় নাই। কাজেই নরেশ যেন আগে এখানে আসিয়া তাহার বাসায় ওঠে—তার পরে জোড়াদীঘিতে যাইতে পারিবে। অভয়কুমারের পত্র পাইয়া নরেশ অনেকটা আশ্বস্ত হইল—তাহা হইলে নিতান্ত সে জলে পড়িবে না। আর অভয় বাল্যকাল হইতেই বাস্তববাদী, সব দিক দিয়াই সে ছিল আদর্শবাদী নরেশের বিপরীত। নরেশ বুঝিল, বিদেশে নির্ভর করিবার মতো একটা লোক পাইবে। সংসারপটুতা বিষয়ে আদর্শবাদীরা বাস্তববাদীদের উপর নির্ভর করে, মনে মনে তাহাদের ঈর্ষ্যা করে—ওইখানে বাস্তববাদের জিত।

২

জোড়াদীঘিতে আসিয়া নরেশচন্দ্র একেবারে মুষড়িয়া গেল। এতদিন সে সাহিত্যের ত্রিশিরা কাচের ভিতর দিয়া পল্লীকে দেখিত, পল্লী বড়ই মনোরম লাগিত। এবারে প্রথম বাস্তবে পল্লী দেখিল, সাহিত্যের বর্ণনার সঙ্গে যাহার কোন মিল নাই। তাহার আরও ধারণা হইয়াছিল, সে যখন পল্লীর প্রতি সহানুভূতি লইয়া আসিতেছে, পল্লীবাসীরা তাহাকে দু'হাত মেলিয়া আলিঙ্গন করিয়া লইবে। কিন্তু তেমন কিছুই ঘটিল না। এই সাহেবী পোশাকধারী ইংরাজি শিক্ষিত বিদেশী যুবককে গ্রামের লোক এড়াইয়া চলিতে লাগিল। দূর হইতে লোকে তাহাকে সেলাম করে কিন্তু তাহাতে প্রাণের টান নাই, সরকারী চাকুরির মোহ মাত্র আছে। এমন যে হইবে বন্ধু অভয়কুমার ইঙ্গিতে বলিয়াছিল কিন্তু আদর্শবাদী নরেশ তাহা বিশ্বাস করে নাই।

গ্রামের জমিদারের বৈঠকখানা বাড়ীতে সে আশ্রয় পাইয়াছে। জমিদারবাবু কলিকাতায় থাকেন, কাজেই বৈঠকখানায় তাহার একাধিপত্য। কলিকাতায় থাকিতে গ্রামের যে বর্ণনা পাইয়াছিল তাহার কতক অংশ সত্য বলিয়া বুঝিল।

খাদ্যবস্তু যে এত সুলভ হইতে পারে এ ধারণা তাহার ছিল না। কাজ তাহার সামান্যই, অধিকাংশ সময় সে বই ও খবরের কাগজ পড়িয়া কাটাইয়া দেয়। গল্পগুজব করিবার বা আড্ডা দিবার মতো লোকের সঙ্গে এখনো তাহার আলাপ হয় নাই।

একদিন সকালে সে বসিয়া আছে, এমন সময়ে একটি লোক তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়া মাথা হইতে একটা ঝুড়ি নামাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। লোকটা বৃদ্ধ, শরীর কৃশ, মাথাভরা টাক, পরণে মলিন একখানি খাটো ধুতি।

লোকটি প্রণিপাত সারিয়া উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—হুজুরের জন্য কিছু তরকারী এনেছি। নরেশ দেখিল, ঝুড়ির মধ্যে কুমড়ো, লাউ, বেগুন প্রভৃতি আনাজ।

নরেশ বলিল—তা বেশ করেছ, এর দাম কত ?

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিল—এ আমার ক্ষেতের তরকারী—দাম আর কি ? তা ছাড়া হুজুরের কাছে থেকে কি দাম নিতে পারি ?

বিস্মিত নরেশ বুঝিতে পারিল না এই অনুগত লোকটি কে ? সে শুধাইল—তুমি কে ? তোমাকে তো আমি চিনি না।

বৃদ্ধ বলিল—হুজুরকে আমি খুব চিনি। আপনি মহামান্য ইন্সপেক্টার শ্রীল শ্রীযুক্ত অভয়কুমার রায়ের বন্ধু। হুজুর, আমি এখানকার পাঠশালার হেড পণ্ডিত।

এতক্ষণে নরেশের মনে পড়িল, অভয়কুমার তাহাকে এখানকার পাঠশালার কথা বলিয়াছিল বটে। অভয় তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল, পাঠশালার প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিও। হেড পণ্ডিত বেজায় ফাঁকিদার। সে আরও বলিয়াছিল, গ্রামের উন্নতি করিবার আশা ছাড়িয়া দাও। ও সব তোমার আমার কর্ম নয়। যদি পাঠশালার পণ্ডিতটাকে একটু শাসনে রাখিতে পার, তবেই অনেক করা হইবে। নরেশ শুধাইয়াছিল, পাঠশালার পণ্ডিত তাহাকে মানিবে কেন ? অভয় বলিয়াছিল, আরে তুমি যে সাহেবী পোশাক পর তাহাই যথেষ্ট। বিশেষ সে যখন জানিবে যে তুমি আমার বন্ধু, তখন আমার চেয়ে তোমাকে বেশী করিয়া মানিবে। নরেশ দেখিল তাহার কথাই সত্য। সে পাঠশালার সন্ধান লইবার আগেই পাঠশালা তাহার সন্ধান করিয়া লাউ এবং কুমড়ো লইয়া ভেট করিতে আসিয়াছে।

নরেশ বলিল—পণ্ডিত মশাই, এ সব তো আমি নিতে পারি না। এ যে প্রকারান্তরে ঘুষ নেওয়া।

এ রকম কথা পণ্ডিত জীবনে প্রথম শুনিল। সে একেবারে বসিয়া পড়িল। হাত জোড় করিয়া বলিল—হুজুর, ঘুষ দেওয়া বেআইনি এ কথা আমি জানি। কিন্তু লাউ কুমড়ো কোন কালেই ঘুষ নয়, বিশেষ সবাই এসব জিনিস নিয়ে থাকেন।

নরেশ বলিল—কিন্তু এত হাঙ্গামা করবার দরকার ছিল কি? আমার প্রয়োজন অতি সামান্য, আর এসব তো এখানে খুব সস্তা!

পণ্ডিত সপ্রতিভাবে বলিল—সেই জন্যই তো এনেছি হুজুর। দামী জিনিস দেওয়ার মতো কি আমার অবস্থা?

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া সহজেই পণ্ডিতের আর্থিক অবস্থার কথা আসিয়া পড়িল। নরেশ বলিল—আপনি বসুন। এই বলিয়া সে একটা মোড়া দেখাইয়া দিল। কিন্তু পণ্ডিতকে কিছুতেই বসাইতে পারিল না। পণ্ডিত ক্রমাগত বলে—হুজুর আমার অন্নদাতা, পিতৃতুল্য—তাঁহার সম্মুখে কি বসিতে পারি?

নরেশ শুধাইল—পণ্ডিত মশাই, আপনার স্যালারি কত?

এখন 'স্যালারি' কথাটা পণ্ডিত কোন জন্মে শোনে নাই—কি উত্তর দিবে?

নরেশ তাহার অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া ব্যাখ্যা করিয়া শুধাইল—আপনি পান কত?

পণ্ডিত বলিল—হুজুর, চার টাকা।

চার টাকা! ব্যাপারটা পুরাপুরি বুঝিতে না পারিয়া নরেশ শুধাইল—মাসে?

পণ্ডিত বলিল—মাসে আর পাই কই হুজুর? পাঁচ, ছ'মাস অন্তর টাকা আসে। এবারে তো এগার-মাস বাকি পড়েছে।

চার টাকা বেতন, তার আবার এগার মাস বাকি! নরেশের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাহার মনে হইল বৈঠকখানার কড়িকাঠ ফাঁক হইয়া তাহার যত সদিচ্ছা ও গ্রামোন্নয়ন-স্পৃহা সোজা নির্বাণলোকের দিকে প্রস্থান করিল।

নরেশ এবারে পুছিল—তবে আপনার চলে কি ক'রে?

পণ্ডিত বলিল—এই ক্ষেতখামার ক'রে, লাউ বেগুন লাগিয়ে।

ক্ষেতখামারের কথাটা নরেশের মন্দ লাগিল না, কারণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীকে এই পরামর্শ বহুবার দিয়াছেন। কিন্তু পড়া কখন হয়? তাহার

সমাধান তো আচার্যদেবের বক্তৃতায় নাই। কাজেই সে পুছিল—ক্ষেত খামার করা মন্দ নয়, কিন্তু পাঠশালার কাজে অসুবিধা হয় না ?

পণ্ডিত বলিল—পাঠশালার কাজে অসুবিধা! পাঠশালা আছে বলেই তো সুবিধা হয়, ছেলেগুলোকে নিয়ে লেগে যাই।

—তবে পড়ান কখন ?

—ওই কাজ করতে করতে। যেমন ধরুন, শশার মাচায় অনেক শশা ফলেছে। আমি বললাম—ওরে নন্তু, দেখত ক'টা শশা। নন্তু গুণে এলো তিন আর চার সাত, আর পাঁচ বারো, আর আট কুড়ি। যোগ শিক্ষা হ'ল। আবার ধরুন, যে দিন শশা তুলতে হবে সেদিন বিয়োগ শিক্ষা হ'ল। কুড়িটা শশার মধ্যে বারোটা তোলা হ'ল—থাকলো আটটা।

দেশজ কিণ্ডারগার্টেনের নমুনা পাইয়া নরেশ কৌতূহলী হইয়া উঠিল। পুছিল—আর গুণ, ভাগ ?

পণ্ডিত হাসিয়া বলিল—ততদিন কোন ছাত্রই পাঠশালায় থাকে না। তার অনেক আগেই পাঠশালা ছেড়ে নিজের ক্ষেত-খামারে লেগে যায়।

—আপনার এই পড়াবার রীতি ইন্সপেক্টর সাহেব জানেন ?

—বিলক্ষণ! সেবারে যখন আমি শশার ক্ষেতে যোগ শিক্ষা দিচ্ছিলাম, হুজুর হঠাৎ সাইকেল করে এসে উপস্থিত। অমনি বিয়োগ শিক্ষাও দিলাম। তেত্রিশটা শশার মধ্যে তেইশটা তুলে হুজুরকে ভেট দিলাম। হুজুর সে কি খুশি!

এই পর্যন্ত বলিয়া একটু থামিয়া বলিল—হুজুর, একদিন পাঠশালায় পায়ের ধুলো দেবেন।

নরেশ বলিল—অবশ্যই একদিন যাবো। কিন্তু আমার মনে হয় যে, আপনি কর্তব্যকার্যে অবহেলা করছেন।

নরেশের কথার সম্যক মর্ম বুঝিতে পারিলে পণ্ডিত হয়তো কাঁদিয়া ফেলিত, কিন্তু কি যে তাহার কর্তব্য এবং কিভাবে যে সে তাহা অবহেলা করিতেছে বুঝিতে না পারিয়া হুজুরকে পাঠশালা দর্শনের জন্য বারংবার অনুরোধ করিয়া সে প্রস্থান করিল।

পণ্ডিতের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া নরেশের মোহ-যবনিকার একপ্রান্ত কিঞ্চিৎ ফাঁক হইয়া গিয়াছিল বটে—কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার বার বার মনে হইল—

লোকটা জাতিগঠনকার্যে বিষম অবহেলা করিতেছে, ইহার একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু একবারও তাহার মনে হইল না, যে কাজের মাসিক বেতন চার টাকা এবং তাহাও এগার মাস বাকি পড়ে—সে কাজের অবহেলার অভিযোগ একেবারে অচল। তাই কেহ অভিযোগও করে না, মাহিনাও মিটায় না—অনেক দিন হইল একটা বোঝাপাড়া হইয়া গিয়াছে। শূন্য উদরের উপর কাহারো দাবী নাই—সে দাবী যতই না কেন মহৎ হোক।

৩

বাজারের কাছে ছোট একখানি চারচালা ঘরে গদাধর পণ্ডিতের পাঠশালা বসিয়াছে। চারচালাখানার খড় জীর্ণ, মেঝে কাঁচা, বেড়া ভাঙ্গা। তারই মধ্যে কোন রকমে তিনটা ভাগ। একদিকে চিনি, বাতাসা, গুড় প্রভৃতির ছোট একখানা দোকান। সেখানে গদাধর পণ্ডিত উপবিষ্ট ; হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, কাঁধের উপরে একখানা গামছা, গলায় মলিন উপবীত, হাতে একখানা ছড়ি। সেই ছড়িখানাই বোধ করি পণ্ডিতের পাঠশালার রাজদণ্ড। কিন্তু সেখানা দিয়া যে কেবল ছাত্র তাড়না চলে এমন মনে করিলে ভুল হইবে ; ছাত্র তাড়নায় অবশ্য সেটা লাগে—কিন্তু এখন দোকানের মাছি তাড়াইবার কাজে নিযুক্ত। গদাধর বসিয়া দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার আমেজে ঢুলিতেছে, আর মাঝে মাঝে অনুচ্চস্বরে বলিতেছে—পড়্, পড়্। যাহাদের উদ্দেশ্যে এই উপদেশ উচ্চারিত—তাহারা, গুটি আট-দশ বালক, মাঝখানের ঘরে হুটোপাটি করিতেছে। তৃতীয় ঘরটায় কয়েকটা গোরু বসিয়া রোমন্থনকার্যে নিরত। পাঠশালার অদূরে বিখ্যাত সেই শশার মাচা—সেখানে ছাত্ররা যোগবিয়োগ শিক্ষা পাইয়া থাকে।

একদিন দুপুর বেলা নরেশচন্দ্র পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া গদাধর শশব্যস্তে উঠিয়া পাশের দোকান হইতে একটা মোড়া আনিয়া দিয়া বলিল—বসুন, হুজুর। তারপর হাত জোড় করিয়া বলিল—একেবারে খবর না দিয়ে—

নরেশ বলিল—ইচ্ছে করেই খবর না দিয়ে এসেছি—কি রকম কাজ চলে দেখবার জন্যে।

তারপর দোকানখানার দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি, দোকানও চালান না কি ?

গদাধর পণ্ডিত বলিল—আজ্ঞে, না চালিয়ে করি কি ? ছেলেমেয়েতে চারটি। বিশেষ, এতে ছেলেদের মণকিয়া, সেরকিয়া শিখবার সাহায্য করে।

—কই, আপনার ছাত্রসব কই ?

পণ্ডিত হাঁকিয়া উঠিল—ওরে নন্তু, গদা, রতা, পল্‌তা—সব কোথায় গেলি ? হুজুর এসেছেন যে, সেলাম ক'রে যা।

কিন্তু পণ্ডিতের আদেশ সত্ত্বেও কেহ আসিল না। আসিবে কে ? ছাত্রেরা কেহই নাই।

পণ্ডিত বলিল—হুজুর, সবাই ছিল। আপনার সাহেবী পোশাক দেখে সব ভয়ে পালিয়েছে। দূর্, দূর্, দূর্—

শেষোক্ত সাবধান-বাণী একটি কুকুরের প্রতি।

নরেশ বলিল—ও ঘরটাতে আবার গোরুও ঢুকিয়েছেন দেখছি।

গদাধর হাসিয়া বলিল—ঠিক তা নয়, আমরাই গরুর ঘরে ঢুকেছি।

তার পরে ব্যাখ্যা করিয়া বলিল—পুরানো পাঠশালা ঘরখানা ও বছর পুড়ে যায়। সদরে লেখালিখি করে ঘর তুলবার টাকা পাওয়া যায় না। অবশ্য ইন্সপেক্টর সাহেব বলেছেন যে, এজন্যে বারো টাকা দেবেন। কিন্তু দু' বছর হ'য়ে গেল—টাকা এলো না। কাজ তো চালান চাই। তখন বাজারের দোকানদারদের ধরলাম। তারা এই ঘরখানা তুলে দিল। সর্ত এই হ'ল যে, এর একখানা কামরায় তাদের গোরুগুলো থাকবে। কাজেই হুজুর, এ-ঘরে ওদেরও যে অধিকার, আমাদেরও সেই অধিকার।

পাঠশালার আদ্যন্ত স্বচক্ষে দেখিয়া নরেশের কেমন বিভ্রান্তি ঘটিল। যে শিক্ষাসূত্রের একটা দিক সে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিয়াছে, তাহারই অপর দিকটা যে খড়ের জীর্ণ চারচালায় আসিয়া পর্যবসিত—যাহাতে গরু ও মানুষের সমান অধিকার—ইহা তাহার কল্পনারও অতীত ছিল। কিন্তু কেন জানি না তাহার মনে হইল, ইহার জন্য এই পণ্ডিতই দায়ী, আর কেহ নয়।

গদাধর বলিল—হুজুর, ঐ আমার শশার মাচা—ওখানে ছাত্ররা যোগ বিয়োগ শিখে থাকে। একবার দয়া করে পদার্পণ—

নরেশ ক্রুদ্ধভাবে বলিল—না থাক, আর দরকার নেই।

সে পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া বাসায় চলিয়া গেল। বাসায় গিয়া সে অভয়কুমারকে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠশালা ও পণ্ডিতের সমস্ত ব্যাপার জানাইল

এবং মন্তব্য প্রকাশ করিল যে, এ সমস্তের জন্যই পণ্ডিত দায়ী। তাহাকে অবিলম্বে পদচ্যুত না করিলে জাতি-গঠন সম্ভব হইবে না। যেন ওই গদাধর পণ্ডিতই জাতি-গঠনের পথে ঐরাবতের বাধা সৃষ্টি করিয়া দণ্ডায়মান। যেন ওই একটিমাত্র বাধা অপসৃত হইলেই জাতীয় জীবনের জাহ্নবীধারা অনর্গল গতিতে প্রবাহিত হইবে। চিঠিখানা লিখিয়া ডাকে দিয়া নরেশ অনেকটা স্বস্তি বোধ করিল। জাতির প্রতি কর্তব্য যেন তাহার সমাপ্ত হইল।

আটদশ দিন পরের কথা। একদিন বিকালবেলা নরেশ বেড়াইয়া ফিরিতেছে। গ্রামের এ দিকটায় সে ইতিপূর্বে আসে নাই। একজনকে পুছিল —ওই বাড়ীটি কার ?

লোকটা বলিল—ওটা গদাধর পণ্ডিতের বাড়ী।

নরেশের কৌতূহল হইল গদাধর পণ্ডিতের বাড়ীখানা একবার দেখিয়া আসে। সে বাড়ীর কাছে গিয়া দেখিল, বাড়ী তো ভারি। জীর্ণ খান দুই খড়ের ঘর—চারিদিকে আগাছার জঙ্গলে পরিবেষ্টিত। সে দাঁড়াইয়া গদাধর পণ্ডিতের নাম ধরিয়া ডাকিতে সুরু করিল। পাঁচ সাতবার ডাকিবার পরেও কোন উত্তর আসিল না, অথচ ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়া লোকের আভাস পাওয়া যাইতেছে। গদাধর পণ্ডিতের গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয়লাভের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সে বেড়া ধাক্কাইতে সুরু করিল। তখন ছোট্ট কাঠের একটা জানালা খুলিয়া গেল এবং ভিতর হইতে গদাধর পণ্ডিত বলিল—হুজুর, বেড়া ধাক্কাবেন না, বেড়া পড়ে যাবে।

নরেশ রুষ্টভাবে কহিল (সে দিনের পর হইতে সে পণ্ডিতের উপর রাগিয়া আছে)—ভিতরে কি করছেন ? আসুন না। এতক্ষণ ডাকাডাকি করছি— আচ্ছা ভদ্রলোক তো !

পণ্ডিত বলিল—ডাক শুনছি হুজুর, কিন্তু বাইরে যাবার উপায় নেই।

অপমানিত বোধ করিয়া নরেশ বলিল—কেন ?

গদাধর বলিল—আমরা স্ত্রী-পুরুষে নল-দময়ন্তীর পালা অভিনয় করছি।

নরেশ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল—ঠাট্টা করবার আর লোক পেলেন না ?

সর্বনাশ, হুজুরের সঙ্গে কি ঠাট্টা করতে পারি !

তারপরে সে ঘরের মধ্যে কাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল—আঃ, তুমি

একটু চুপ করো তো। হুজুরকে বলবো না তো কাকে বলবো? এবারে হুজুর জানলেন—দেখো এবারে কাপড় মেলে কি না।

এ পর্যন্ত বলিয়া সে পুনরায় নরেশকে লক্ষ্য করিয়া শুরু করিল—হুজুর, স্ত্রী-পুরুষে মিলে আমাদের দু'খানা বস্ত্র, দু'খানাই ধুতি। একখানা আমি পরি, একখানা আমার সহধর্মিণী পরে। পরতে পরতে যখন খুব ময়লা হয়, তখন কেচে নিতে হয়। রবিবারটা ছুটি—আজ একখানা কেচে শুকোতে দিয়েছি। যতক্ষণ না শুকোচ্ছে আমরা স্ত্রী-পুরুষ একখানা ধুতির দুই দিক জড়িয়ে ঘরে বন্ধ হ'য়ে থাকি। এ সেই নল-দময়ন্তীর কথা আর কি? ভাগ্যিস্ পুরাণে এই গল্পটা ছিল—নইলে কি যে করতাম, হুজুর! এই বলিয়া সে খুব একটা সপ্রতিভের হাসি হাসিল। নরেশ হাসিবে কি কাঁদিবে স্থির করিতে না পারিয়া প্রস্থান করিল।

বাসায় আসিয়া একখানা ধুতি চাকরের হাতে দিয়া সে পণ্ডিতের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল। বাঙ্গালা দেশের লোক সে, দারিদ্র্য দেখিয়াছে, দারিদ্র্যের নগ্নরূপও দেখিয়াছে—কিন্তু নগ্নতা ঢাকিবার এমন পৌরাণিক প্রয়াস যে ঘটিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। হাসির ছটায় দারিদ্র্য যে কি মর্মান্তিক তাহা এই প্রথম সে দেখিল। আজকার ঘটনায় গদাধর পণ্ডিতের সম্যক চেহারা তাহার চোখে পড়িল। এমন হত-দরিদ্রের হাতে যাহারা জাতিগঠনের ভার দিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকে—দোষ সেই জাতির। গদাধর পণ্ডিতকে সমস্ত দায়িত্ব-মুক্ত বলিয়া এবারে তাহার ধারণা হইল। তাহাকে বরখাস্ত করিবার জন্য চিঠি লিখিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া তাহার আক্ষেপ হইল। স্থির করিল, কালকার ডাকেই অভয়কুমারকে সব ঘটনা লিখিয়া জানাইবে—পণ্ডিতের চাকুরির যেন কোন ক্ষতি না হয়।

এই ঘটনার পরে সে আর কখনো গদাধর পণ্ডিতের পাঠশালায় বা বাড়ীতে যায় নাই, পণ্ডিতকে এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত। তাহার কাছে নিজেকে অপরাধী বলিয়া তাহার মনে হইত। এমন সময়ে সে একদিন অভয়কুমারের চিঠি পাইল। অভয়কুমার পণ্ডিতের কার্যে অবহেলার বিষয়ে তাহার সঙ্গে একমত। সে লিখিয়াছে যে, আমি গদাধর পণ্ডিতকে পদচ্যুত করিবার ব্যবস্থা করিলাম। শীঘ্রই অন্য পণ্ডিত যাহাতে ওখানে নিযুক্ত হয় তাহার ত্রুটি করিব না, আর তুমি যে কষ্ট স্বীকার করিয়া এদিকে দৃষ্টি দিয়াছ এজন্য ধন্যবাদ জানিবে। চিঠিখানা পড়িয়া নরেশ একেবারে বসিয়া পড়িল। তাহার দ্বিতীয় পত্র কি

যথাসময়ে পৌঁছায় নাই? গড়িমসি করিয়া চিঠি লিখিতে দু'চার দিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। এখন সে গদাধর পণ্ডিতকে কি বলিবে? তাহার জন্যই যে পণ্ডিতের চাকুরি গেল—ইহা তো বুঝিতে বাধিবে না। এখন উপায় কি? পণ্ডিত অবশ্য কাজকর্ম কিছুই করে না, কিন্তু চার টাকা মাহিনার এগার মাস বাকি পড়িলে কি খাইয়া কাজ করিবে? ছেলেমেয়ে, স্ত্রীপুরুষে যে তাহারা ছয়টি প্রাণী! আদর্শবাদের ঝোঁকে সে কি করিতে কি করিয়া ফেলিল!

পরদিন সকালবেলা নরেশ একাকী বসিয়া আছে এমন সময়ে অপ্রত্যাশিত-ভাবে গদাধর পণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত। নরেশ পালাইতে পারিলে বাঁচিত, কিন্তু সে পথ ছিল না।

পণ্ডিত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল—হুজুর, আমার চাকুরিটা গিয়াছে। এবারে বোধ হয় আমার দুরবস্থা ঘুচবে।

এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। এরকম তৃপ্তির হাসি নরেশ তাহার মুখে আর কখনো দেখে নাই।

পণ্ডিত গদগদ কণ্ঠে বলিয়া চলিল—ইচ্ছে থাকলেও চাকুরিটা ছাড়া সম্ভব হয় নি। তিন পুরুষ হ'ল আমরা এই কাজ করছি। সে কি সহজে ছাড়া যায়? অথচ জানতাম, একটু নড়াচড়া করলেই দু'পয়সা বেশি আনতে পারি। এবারে সেই সুযোগ মিল্‌লো।

নরেশ অপরাধীর কণ্ঠে বলিল—তা এ কথা আমাকে জানাবার কারণ কি?

পণ্ডিত বলিল—শুনছিলাম হুজুরের একজন পাচক ব্রাহ্মণের দরকার। আমি তো ব্রাহ্মণ, ভাবলাম একবার জেনেই আসি—এখন তো আর পাঠশালার হাঙ্গামা নেই।

নরেশ ইহার কি উত্তর দিবে? পণ্ডিতের কথায় তাহার আদর্শবাদের মাথায় 'এটম বোম' নিক্ষিপ্ত হইল। যে-দেশের পাঠশালার পণ্ডিত চাকুরি গেলে খুশি হয়—অপরের পাচকবৃত্তিকে শ্রেয়ঃ মনে করে, মনে করে এবার তাহার সাংসারিক উন্নতি হইবে—সে দেশের কি আর ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু আছে!

সে তখন পণ্ডিতকে একটা ছুতানাতা করিয়া বিদায় দিল। আর সেই রাত্রেই সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় রওনা হইল। কলিকাতায় পৌঁছাইয়াই চাকুরিতে ইস্তফা পত্র পাঠাইয়া দিল। তারপরে আর কখনো সে দেশের উন্নতি করিতে চেষ্টা করে নাই। এখন সে সিভিল সাপ্লাই-এ কাজ করে, বেতন মোটা।

সিন্দুক

পাশের ঘরে সদ্য মৃত রামবাবুর দেহটি পড়িয়া আছে, আর এ ঘরে তাঁহার চারি পুত্র পিতার সিন্দুকটি জড়াইয়া পড়িয়া আছে, নড়েও না চড়েও না। দৃশ্যটি সময়োচিত নয়, কিন্তু সংসারে সময়োচিত কয়টা ঘটনা ঘটে? রামবাবু বিপত্নীক, কাজেই কাঁদিবার আসল লোকটি ছিল না; আর যাহাদের কাঁদিবার কথা তাহাদের বিষয় তো উল্লেখ করিলাম। শ্মশানে যাইবার সময় অতিক্রান্ত হয় অথচ পুত্রদের সেদিকে দৃষ্টি নাই, অবশেষে পাড়াপ্রতিবেশী উদ্যোগী হইয়া মৃতদেহ সৎকারের জন্য লইয়া গেল—পিতৃশোকাতুর পুত্রেরা পৈত্রিক সিন্দুকটি বুকে জড়াইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

বিচক্ষণ পাঠক ইতিমধ্যে নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে সিন্দুকটি সামান্য নহে। বাস্তবিক, সিন্দুকটির একটু ইতিহাস আছে, অথবা সিন্দুকটিই ইতিহাস। সেই ইতিহাসই এই কাহিনীর বর্ণনীয়।

রামবাবু গ্রামের মধ্যে ধনী; তাঁহাকে গাঁয়ের লোক মানে, পাঁচ গাঁয়ের লোক চেনে, দশ গাঁয়ের লোকে ধনীর দৃষ্টান্ত দিতে হইলে একবাক্যে রামবাবুর উল্লেখ করে। কিন্তু রামবাবুর ধনের মূলে কি—নিশ্চয় করিয়া কেহ জানে না। তালুক মুলুক জমিদারী নাই; ক্ষেতখামার জমিজমা যাহা আছে তাহাতে সংসার চলে কিন্তু সংসারে ধনী নাম অর্জন চলে না; ব্যবসাবাণিজ্য রামবাবুর নাই; লগ্নীকারবার বা তেজারতি আছে বলিয়াও কেহ জানে না। এ ছাড়া বাকি থাকিল পৈত্রিক ধন আর গুপ্ত ধন। ও-দুটির বিষয়ে অনুমান চলে, প্রমাণ চলে না। কিন্তু পরের ধন সম্পর্কে অনুমান যেমন সচল, প্রমাণ তেমনি অচল। কাজেই বিনা প্রমাণে রামবাবুর ধনখ্যাতি ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানের মতো সকলের বিস্ময় ও বাহবা উদ্রেক করিয়া বিরাজমান; শূন্যোদ্যানের ফুলগুলি এত উচ্চে বিকশিত যে স্বভাবতঃই তাহাকে কল্পবৃক্ষ বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু এতৎ-সত্ত্বেও সত্যের খাতিরে বলিতে হয় যে রামবাবুর কোন ধন ছিল না বলা চলে না, তাঁহার মূলধন ঐ সিন্দুকটি।

বাস্তবিক এত বড় সিন্দুক একালে দেখা যায় না, সেকালেও কদাচিৎ দেখা যাইত—এই সিন্দুকের তুলনা দিতে হইলে এক সিন্দবাদের বিখ্যাত সিন্দুকটি ধরিয়া টান দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুক ঘরের আধখানা জুড়িয়া বিরাজ করে। মোটা মোটা লোহার পাত দিয়া আগাগোড়া জড়ানো; ভিতরে পাঁচ সাতটা লোক অনায়াসে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া থাকিতে পারে। আর তালাটাই বা কত বড়ো! একটা মানুষের আস্ত মাথার মতো। সিন্দুকের সারা গায়ে সিন্দুর আর চন্দনের দাগ—কত বছরের পুরাতন, কত বিচিত্র রকমের চিহ্ন!

এই সিন্দুকটি যে রামবাবু কি সূত্রে পাইয়াছিলেন লোকে জানে না। খুব সম্ভবতঃ পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত। গ্রামের বৃদ্ধদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, গ্রামের নদীটি যখন সচল ছিল, সে বহু বছর আগেকার কথা, তখন নদী দিয়া বড় বড় পালোয়ারী নৌকা যাতায়াত করিত। তখন নবাবী আমল—একবার ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদগামী একখানি নবাবী বজরা ঝড় উঠিয়া এখানে নদীর বাঁকে ডুবিয়া যায়। সেই নৌকায় নাকি মোহর-ভরা এই সিন্দুক ছিল। রামবাবুর কোন পূর্বপুরুষ জল হইতে এই সিন্দুকটি উদ্ধার করিয়া বাড়ী লইয়া আসেন। সেই হইতেই তাঁহার ঐশ্বর্যের সূত্রপাত।

অন্যান্য কিম্বদন্তীর মতো হয় তো এ ঘটনাও সত্য নয়, বিশেষ রামবাবুর অতীত বা বর্তমান ঐশ্বর্যের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। কিন্তু গাঁয়ের লোকে এত তলাইয়া বোঝে না—সিন্দুকটাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়? গ্রামের মধ্যে যাহারা সূক্ষ্ম হিসাবী তাহারা সিন্দুকের বর্ষফল কষিয়া বহুবার বহু রকমে হিসাব করিয়াছে—মোহর ভর্তি হইলে কত? টাকায় ভর্তি হইলে কত? আর কোম্পানীর কাগজে ঠাসা হইলেই বা কত মূল্য রামবাবুর ঐশ্বর্যের। আর এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে সিন্দুকটা শূন্য—তাহা হইলে তো রামবাবুকে ঐন্দ্রজালিক বলিতে হয়—শূন্য সিন্দুকে এরূপ খ্যাতির পূর্ণতা! ঐন্দ্রজালিকেরও মায়া বিস্তারের জন্য একখানা শুষ্ক হাড়ের প্রয়োজন হয়।

রামবাবুর গ্রামের নাম জোড়াদীঘি। জোড়াদীঘিতে একবার পর পর ডাকাতি শুরু হইল। ডাকাত অন্য গ্রামের। জোড়াদীঘির লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। কিন্তু ডাকাতের সঙ্গে পারিয়া উঠিবার উপায় নাই—তাহাদের বন্দুক আছে, ঢাল শড়কি আছে। এ সব না হইলে ডাকাতের দলকে বাধা

দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু টাকা কোথায়? তখন গাঁয়ের লোক কাঁদিয়া আসিয়া রামবাবুর পায়ের উপর পড়িল,—বলিল—কর্তা, আর তো সহ্য হয় না, একবার সিন্দুকটা খুলে কিছু বের করুন, দুশমনদের আমরা দেখে নিই।

রামবাবু সব শুনিয়া, অনেকক্ষণ ভাবিয়া, একটা খড়কে দিয়া দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন—তা হ'লে সিন্দুক খুলতেই হ'ল দেখ্‌ছি।

গাঁয়ের লোক আশ্বস্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু সিন্দুক খুলিবার আর প্রয়োজন হইল না—যে কারণেই হোক ডাকাতি বন্ধ হইয়া গেল।

গ্রামের লোক নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—দুশমনেরা এবার খবর পেয়েছে যে কর্তা এবারে সিন্দুক খুলবেন। সিন্দুকের নামেই দুশমনদের এমন ভয় জানিয়া গাঁয়ের লোক খুব এক চোট হাসিয়া লইল। সিন্দুকের উপরে তাহাদের আস্থা বাড়িয়া গেল।

আর একবারের কথা। বন্যা হইয়া ক্ষেত-খামার ভাসিয়া গেল। লোকে রামবাবুর কাছে আসিয়া বলিল—কর্তা, সিন্দুক না খুললে তো প্রাণে মরি।

রামবাবু বলিলেন—সে কথা ঠিক। এ রকম ক্ষেত্রে সিন্দুক না খুললে আর কবে খুলবো।

কিন্তু খুলিবার প্রয়োজন হইল না। দু'একদিনের মধ্যেই চাউল ও বস্ত্র বিতরণের জন্য সদর হইতে লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। রামবাবু সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন—না, এরা আমাকে খরচ করতেই দেবে না দেখছি।

সকলে বলিল—দুঃখ করবেন না, হুজুর, অসময়ের জন্য আপনার সিন্দুক থাকুক। রামবাবু দাঁত খুঁটিতে খুঁটিতে বলিলেন—তোমরা যখন চাইছো, তাই থাক—সিন্দুকের উপরে সকলের ভক্তি বাড়িয়া গেল।

সিন্দুকটাকে লইয়া রামবাবু কিছু ঘটা করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা স্নান করিয়া গরদের ধুতি চাদর গায়ে সিন্দুকের সম্মুখে বসিয়া পূজার্চনা করিতেন এবং অবশেষে সিন্দুকটাকে ধূপ দীপ লইয়া আরতি করিতেন। অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে সিন্দুকটাকে বটের পল্লব দিয়া সাজাইতেন আর বিজয়া দশমীতে সিন্দুকটিকে আগাগোড়া সিন্দুর ও চন্দন দ্বারা আলিম্পিত করিতেন। বাড়ীর চাকরবাকর ও আত্মীয়-পরিজন মুগ্ধবিস্ময়ে কর্তার কাণ্ড দেখিত।

এই আব্‌হাওয়ার মধ্যে রামবাবুর পুত্রগণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার চারি পুত্র। পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই বুঝিতে পারিল ওই সিন্দুকটাই তাহাদের পরিবারের হৃৎপিণ্ড। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের গতিবিধি সিন্দুকের কাছে ক্রমেই সন্দেহজনক হইয়া উঠিতে লাগিল। রামবাবু দেখিতে পাইলে বলিতেন—উঁহু, ওদিকে না, যাও পড়ো গে! পুত্রেরা ছুটিয়া পলাইত। তাহারা এক আধবার গোপনে সিন্দুকটা খুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু লৌহ-আবরণ নির্দয়, আর চাবিও অলভ্য। বাস্তবিক তাহার চাবি যে কোথায় তাহা কেহই জানিত না, রামবাবুর সতর্কতা অসীম। নিরুপায় পুত্রেরা ভাবিত—এখন না হোক, একদিন সিন্দুকের রহস্য-উদ্ধার হইবেই পিতার মৃত্যুর পরে।

সেই বহু প্রতীক্ষিত শুভদিন আজ সমাগত। পুত্রগণ সিন্দুক জড়াইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু চাবি কোথায়? কেহই জানে না। কাহাকেও ছাড়িয়া কেহ খুঁজিতে যাইতে রাজী নয়—কি জানি অপরে কি করিয়া বসে। কাজেই অধিকার সাব্যস্ত করিয়া সিন্দুক জড়াইয়া পড়িয়া থাকা ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। হয় তো এমনি করিয়া পড়িয়া থাকিয়াই শেষ পর্যন্ত তাহাদের প্রয়োপবেশনে মরিতে হইত, দিনে দিনে, তিলে তিলে। এমন সময়ে গভীর রাত্রে শ্মশানবন্ধুগণ ফিরিয়া আসিয়া প্রকাণ্ড একটা চাবি পুত্রদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া দিল,—বলিল—কর্তার কোমরে ছিল। পুত্রগণ চাবি লুফিয়া লইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল।

তখন সেই গভীর রাত্রে ক্ষীণ দীপালোকমাত্র সহায়ে রামবাবুর চারিপুত্র বহুকালের রহস্য-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইল। তালার চাবি ঘুরাইতেই খট্ করিয়া শব্দ করিয়া দুর্জয় তালা খুলিয়া গেল। চার জনে মিলিয়া আট হাতের শক্তিতে সিন্দুকের গুরুভার ঢাকনা তুলিল এবং সকলে একসঙ্গে দীপালোক তুলিয়া ভিতরে তাকাইল। সিন্দুক শূন্য! কোথাও কিছু নাই! নাঃ, এ তাদের চোখের ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। চারিজন ভিতরে নামিয়া পড়িয়া ডুবারি যেমন করিয়া রত্ন সন্ধান করে তেমনি করিয়া হাতড়াইয়া মরিতে লাগিল। সত্যই কোথাও কিছু নাই। এমন সময়ে একখানা কাগজের টুকরা দেখিতে পাইল। চারজনে সেখানা লুব্ধের মতো লইয়া বাহিরে আসিল। ছোট্ট একখানা কাগজের চিরকুট। দীপালোকে দেখিল—তাহাতে পিতার হস্তাক্ষর। চার

পুত্র একসঙ্গে চার-কণ্ঠস্বরে তাহা পাঠ করিল। কাগজে রামবাবুর হস্তাক্ষরে লিখিত—"বাপু সকল, আমার মৃত্যুর পরে সিন্দুক খুলিলেই দেখিতে পাইবে সিন্দুক শূন্য। সিন্দুক যেমন, আমার অদৃষ্টও তেমন—দুই-ই শূন্য। কিন্তু বুদ্ধি একেবারে শূন্য নয়। দেখ না, সিন্দুক লইয়া কেমন আসর জমাইয়া গেলাম। এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও তবে ইচ্ছা করিলেই আমার সুনাম ও ধনগৌরব বজায় রাখিতে পারো। তোমাদের কাজ শুধু ধনাপবাদ পরিপাক করা। সব অপবাদের প্রতিবাদ করিবে—কেবল ধনাপবাদ ছাড়া। তুমি যে ধনী, অপরের এই বিশ্বাসই প্রকৃত ধন। ইহাকে রক্ষা করিতে সামান্য একটুখানি বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই প্রয়োজন নাই। প্রমাণ—আমার সিন্দুক। তোমরা ধনী—অপরের মনে এই বিশ্বাস আমি স্থাপন করিয়া গেলাম। ইহাই তোমাদের একমাত্র পৈত্রিক সম্পত্তি। এখন ইহাকে রক্ষা করা বা না করা তোমাদের দায়িত্ব। পিতার কর্তব্য আমি পালন করিয়া গেলাম। ইতি নিঃস্ব কিন্তু ধনাপবাদগ্রস্ত পিতা।"

চারিপুত্র পিতার পত্র পড়িয়া মূঢ়ের মতো বসিয়া নীরবে চুল ছিঁড়িতে লাগিল। কেবল জ্যেষ্ঠের মাথায় সুবৃহৎ টাক বলিয়া সে কনিষ্ঠের চুল ছিঁড়িতে থাকিল। ধনতত্ত্ব সম্বন্ধে চরম কথা রামবাবুর পত্রে থাকা সত্ত্বেও পুত্রদের মনে পিতার সম্বন্ধে যে-সব অব্যক্তভাব উদিত হইতে লাগিল তাহা প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ—কারণ জগতে এখনো পিতৃভক্ত পুত্রের অভাব ঘটে নাই।

তিমিঙ্গিল

আর কিছুই নয়, শুধু একখানি পত্র পাইয়াছি, পোষ্টকার্ডের খোলা পত্র, এবং সেই হইতে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছি। আমার ভাবনা-চিন্তার ধারা অনেকক্ষণ হইল সমাধানহীনতার অকূল সিন্ধুতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, কাজেই চিন্তা করিবারও আর কিছু নাই, কেবল মাথা ঘুরিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছি যে পৃথিবীও ঘূর্ণনশীল।

পণ্ডিতেরা বলেন যে মানুষের দুষ্কৃতি জন্মান্তর অতিক্রম করিয়াও দেখা দিয়া থাকে—একদিন না একদিন তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। সুকৃতিরও কি এই নিয়ম না কি? পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একমত নহেন। সুকৃতি কি আমার হিসাবে কিছুই জমা নাই, তবে তাহারা দেখা দেয় না কেন? এ পর্যন্ত দেখা দিল না কেন? পূর্বতন দুষ্কৃতি তো মাঝে মাঝেই দেখা দিয়া থাকে—এবারে বেশ ঘটা করিয়া দেখা দিতে আসিয়াছে, আর তাহারই পায়ের প্রতিধ্বনি মাত্রে আমাকে আড়াই ঘণ্টা হইল অকূল পাথারে নিক্ষেপ করিয়াছে।

পাঠক হয় তো ভাবিতেছেন যে আমার দুশ্চিন্তার বিষয় যেমন জটিল তেমনি পারমার্থিক। জটিল সন্দেহ নাই, কিন্তু পারমার্থিক নয়, তবে অর্থের পরিমাণ প্রচুর হইলে যদি পারমার্থিক বলা সঙ্গত হয় তবে অবশ্যই পারমার্থিক।

প্রায় দশ বছর আগে একজনের কাছে কিছু টাকা ঋণ করিয়াছিলাম, তারপরে সেটা আর শোধ করা হয় নাই, অর্থাৎ সে ব্যক্তি আর টাকা লইতে আসে নাই, নতুবা স্বেচ্ছায় আর কে কবে ঋণ শোধ করে? সেই ব্যক্তি এতদিনে আমার সন্ধান পাইয়া জানাইয়াছে যে কাল শুভ প্রাতে অর্থাৎ সাড়ে আটটার সময়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। টাকার জন্যই একথা লেখে নাই, কিন্তু না লিখিলেও যে-সব বিষয় বুঝিতে পারা যায় এটা তাহাদের অন্তর্গত। কিন্তু আমার ঠিকানা পাইল কিরূপে? ইতিমধ্যে অন্ততঃ দশ বার বাসস্থান বদলাইয়াছি, এমন কি দেশটাও বদলাইয়াছি, এবং পরাধীনতা হইতে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। লোকটার গবেষণা-শক্তি অসীম সন্দেহ নাই!

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেও চলে! আর এই দশ বছরের মধ্যে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মহামারী, নরহত্যা তো কম ঘটে নাই—অথচ লোকটা দিব্য টিঁকিয়া আছে। এত যে লক্ষ লক্ষ লোক মরিল সবই কি শুধু খবরের কাগজে না কি? কিন্তু তাই বা বলি কি প্রকারে? আমার কাছেও দু'চারজন লোক ঋণী ছিল, তাহাদের তো আর দেখা পাই না। মরিতে কি তাহারাই মরিল না কি? অর্থের ঋণ যদি দুশ্চিন্তায় শোধ হইত, তবে এই সার্ধ দুই ঘণ্টাকালে যে-পরিমাণে চিন্তা করিয়াছি তাহাতে সুদে আসলে সমস্ত ঋণ শোধ হইয়া গিয়া হাতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত।

পাঠকের কি অভিজ্ঞতা জানি না, অবাধ্য উত্তমর্ণের উপরে অধমর্ণের ক্রোধ সঞ্জাত হইয়া থাকে। আমারও হইল। মনে হইল লোকটার আক্কেল কি রকম! এ ঋণ হিটলার-মুসোলিনীর আমলের। তাহারা তল গেল তবু সেই পুরাতন কাসুন্দির দাবী! যে ব্রিটিশ-ভারতে বসিয়া ঋণ করিয়াছিলাম সে ব্রিটিশও গিয়াছে, আবার ভারতের আধাআধি গত—তবু তাহার দাবীটা যায় না! লোকটা কি নাছোড়বান্দা! Objective condition-এর সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে অক্ষম! এমন লোকের সাজা হওয়া উচিত! তখনি মনে হইল বিধাতা আমার হাতে দিয়া তাহাকে দণ্ড দিবেন! ক্রমে বুঝিলাম যে আমিই বিধাতার হাকিম ও 'বেলিফ'! এই বোধ হইবামাত্র মনে পরম শান্তি পাইলাম।

তখন চাকরকে ডাকিয়া বলিলাম, কাল সকালে আমি খুব ব্যস্ত থাকিব; সাড়ে আটটা নাগাদ সময়ে কোন ব্যক্তি দেখা করিতে আসিলে বলিবে যে বাবু বাড়ী নাই।

—বাবুর চেহারা কেমন? হ্যাঁ, এ প্রশ্ন সঙ্গত বটে! লম্বা হানো, ছিপছিপে, চুল পাকা এবং মাথায় টাক। দশ বৎসর আগে এ দুটি ছিল না কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া আমার দিব্যচক্ষু নির্দেশ দিল!

চাকরটা বলিল—তাই হইবে।

পরদিন বেলা নয়টার সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল, বাবুকে ভাগাইয়া দিয়াছি!

জিতা রহো! এই তো চাই

—কি বলিল?

—কিছুই নয়, শুধু এই চিঠিখানি দিয়া গেল।

"অমলেশ বাবু, প্রায় দশ বছর আগে দেওঘরে আপনার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলাম, শোধ করা হয়নি। দোষ অবশ্য হয়েছে, কিন্তু গত দশ বছর যে দশ যুগ, মানুষের দশ দশার প্রতীক। যাই হোক, অনেক দিনের চেষ্টায় আপনার সন্ধান পেয়ে শোধ করতে এসেছিলাম। শুনলাম আপনি বাড়ী নেই। বড়ই দুঃখিত। আবার পরে আসবো। ইতি—সিদ্ধিনাথ।

—ও বাবুকে তাড়ালি কেন?

—আজ্ঞে লম্বা হানো, ছিপছিপে, মাথাভরা টাক।

সিদ্ধিনাথের তো ওরকম চেহারা ছিল না!

পরে আসিবে? কতদিন পরে? আবার দশ বছর পার করিয়া না কি? দুঃখিত হইয়াছে কিন্তু আমার দুঃখের কি খোঁজ রাখে! চাকরকে বলিলাম, কোন বাবু আসিলে তাড়াইও না। দশ বৎসরে কার চেহারার কি পরিবর্তন হইয়াছে কে জানে!

তবু সান্ত্বনা এই যে উত্তমর্ণ আসিল না! এ-ও কি সম্ভব? কেন নয়? দশ বছর আগেকার অধমর্ণ যদি ঋণ শোধ করিতে আসে, তবে উত্তমর্ণ কথার খেলাপ করিবে তাহাতেই বা বিস্ময়ের কি?

সন্ধ্যাবেলায় উপরে বসিয়া আছি এমন সময়ে অন্য চাকরটি (আগের জন এখন সান্ধ্য ভ্রমণে বহির্গত) বলিল—একজন বাবু এসেছেন।

—কি রকম চেহারা?

—আজ্ঞে, লম্বা, ছিপছিপে—

তাহার কথা শেষ হইবার আগেই বলিলাম, বাস্ বাস্! বেঁচে থাকো সিদ্ধিনাথ, তুমি নবযুগের হরিশ্চন্দ্র!

ছুটিয়া নীচে গেলাম—ঘরে ঢুকিয়াই চমকিয়া উঠিলাম—এ যে বঙ্কুবিহারী, আমার উত্তমর্ণ!

—আপনার তো সকালে আসবার কথা ছিল। (যেন যথা সময়ে না আসা কত বড় অপরাধ! ভাবটা—ঐ অপরাধের জন্যই ঋণ পরিশোধ না করা উচিত!)

—বুঝ্‌লেন না, ঐটুকু 'পলিটিক্‌স্‌' করতে হ'ল। অনেক দেন্দার করে কি জানেন ? পাওনাদারের আসবার সময় জানলে তখন আর বাড়ী থাকে না, সেইজন্য একটা সময় নির্দেশ ক'রে আর এক সময়ে আসতে হয়।

লোকটা আমাকে শঠ ভাবিতেছে, এবারে রাগ করিলে অন্যায় হইবে না।

এমন সময়ে সে হাসিয়া বলিল—অবশ্য আপনি তেমন করবেন না জানতাম।

তবু রাগ করা উচিত ! ইহাকে রীতিমতো ক্ষমা প্রার্থনা বলে না।

—অনেক দিনের টাকাটা, এবারে যদি দিয়ে ফেলেন !

এখন কি বলা উচিত তাই ভাবিতেছি, অবশ্য টাকা দেওয়ার কথা উঠিতেই পারে না।

এমন সময়ে ঘরের আর এক দরজায় ও কে ? সিদ্ধিনাথ যে !

—এসো, এসো ভাই !

সে যেন অকূলসমুদ্রে তৃণখণ্ড ! কিন্তু পরমুহূর্তেই বুঝিলাম তৃণখণ্ড নয়, লাইফ বোট !

সিদ্ধিনাথকে দেখিবামাত্র বঙ্কুবিহারী এক লাফে চেয়ার পরিত্যাগ করিয়া এখনি আসছি' বলিয়া অন্য দ্বারপথে সবেগে প্রস্থান করিল।

—ব্যাপার কি ?

—সিদ্ধিনাথ বলিল—ও যে বঙ্কুবিহারী !

—তার মানে ?

—যুদ্ধের সময়ে দু'জনে একসঙ্গে কিছুদিন ব্যবসা ক'রেছিলাম, ও ছিল 'পার্টনার', আমার কাছ থেকে এক দফায় দশ হাজার টাকা নিয়েছিল। তার পর এই প্রথম দেখা।

—এবং নিশ্চয় জেনো শেষ দেখা।

—মনে হচ্ছে তাই।

—পলায়নের ব্যস্ততা দেখেও বুঝলে না ! আমি বলিলাম, সিদ্ধিনাথ ভাই, তুমি তিমিঙ্গিল।

—সে আবার কি ?

—পরে ব্যাখ্যা করবো, এখন চা খাও। আপাততঃ এইটুকু জেনে রাখো

যে তিমি ভয়ানক জন্তু, কিন্তু তিমিঙ্গিল তার চেয়েও ভয়ানক! তাই তিমিঙ্গিলকে দেখে তিমি ভয়ে পলায়ন করে।

তারপরে বঙ্কুবিহারী আর কখনো টাকা আদায়ের জন্য আমার বাড়ী আসে নাই। সিদ্ধিনাথের কাছে সামান্য টাকা পাইতাম, বঙ্কুবিহারীর কাছে আমার ঋণ অনেক বেশি। কিন্তু রহস্য এই যে সিদ্ধিনাথের কাছে আমার পাওনা বঙ্কুবিহারীর কাছে প্রচুর দেনাকে অবাধে ঠেকাইয়া দিল। আমার ন্যায়তঃ ধর্মতঃ উচিত যে সিদ্ধিনাথের দেনাটা ছাড়িয়া দেওয়া, তাহাতেও আমার প্রচুর মুনাফা থাকিত। পাঠক আশ্বস্ত হইতে পারেন যে সিদ্ধিনাথের দেনা সব আদায় করিয়া লইয়াছি, এক পয়সাও ছাড়ি নাই। তবে হাঁ, এক কাজ করিয়াছি। সিদ্ধিনাথের একখানা ছবি তুলিয়া বৈঠকখানায় টাঙাইয়া রাখিয়াছি। তিমিঙ্গিলের ছবিতে তিমির ভয় পাইবার কথা! ভবিষ্যতে যদি আবার আক্রমণ করে!

রাঘব বোয়াল

অবশেষে ওঙ্কারনাথ স্থির করিয়া ফেলিল যে, অতঃপর সে চুরি করিবে। সিদ্ধান্তটি শুনিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার মধ্যে কত যুগ-যুগান্তরের সংস্কার সঞ্চিত, কত মনীষী মহাপুরুষের নিষেধ পুঞ্জীভূত, কত বিধি-বিধান, কত আইনআদালত —তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কাজেই সে দিক দিয়া বিচার করিলে ওঙ্কারনাথের সিদ্ধান্তটি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইবে না।

অবশ্য হঠাৎ সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় নাই ; তাহাকে বাহ্য এবং আন্তর অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। খুলিয়া না বলিলেও তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন নয়।

ইহার পরেও যদি, পাঠক, তুমি আরও বিশদ ব্যাখা চাও, তবে বলিব, ব্যাখা বাহিরে খুঁজিবার কি প্রয়োজন, নিজের মনের মধ্যে সন্ধান কর না কেন! কখনও কি তোমার চুরি করিতে ইচ্ছা হয় নাই ? ভয় নাই, আমি উত্তর দাবি করিব না, কিন্তু নিজের কানে কানে একবার—অন্তত একবারও সত্য কথা বল দেখি! যখন দেখিয়াছ যে, তোমার চেয়ে স্বল্পতর বেতনের লোকটির বাড়ি তৈয়ারি হইল, আর তুমি আজও ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাস করিতেছ ; মাসের শেষে খরচের টানাটানিতে গৃহিণীর মুখচন্দ্র যখন রাহুগ্রস্ত হইয়াছে, তোমার নিম্নতম কর্মচারী যখন তোমাকে ডিঙ্গাইয়া তরতর করিয়া উপরে উঠিয়া গেল ; ক্রমবর্ধমান দুহিতার বয়স যখন বিবাহের সীমানা অতিক্রম করে-করে ; পুত্রকে একবার শুধু বিলাত ঘুরাইয়া আনিতে পারিলেই মোটা বেতনের চাকুরিটা তাহার করায়ত্ত হইয়া যায় ; তৃতীয় শ্রেণীর রেল গাড়িতে যখন দম বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম ; আর শীতের রাত্রের খাটো লেপের মত সংকীর্ণ বেতনে যখন মাথা ও পায়ের একদিক অনাচ্ছাদিত রহিয়া যায় ; তখন কি কখনও মনে হয় নাই—দূর ছাই, ও-সব নীতিকথার রাবিশে কি পেট ভরে ? এবারে অমুকবাবুর মতো চুরি করিব। কিন্তু জানি, তোমার সেই ক্ষণিক ইচ্ছা

সিদ্ধান্তে পরিণত হয় নাই। ওঙ্কারনাথের হইয়াছে, কেন না, পাঠক তুমি লেখকের মতই একজন সাধারণ মানুষ—আর ওঙ্কারনাথ একজন মহাপুরুষ, ক্ষণকালের পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় ক্ষণজন্মা পুরুষ, টলমল করিয়াও দিব্য টিঁকিয়া আছেন, পড়ি-পড়ি করিয়াও পড়িবার নাম করেন না।

তবে এক জায়গায় তোমার আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওঙ্কারনাথের অভিজ্ঞতার মিল আছে, সেটা একেবারে মূলগত। যে সব কারণে তোমার কখনও কখনও চুরি করিতে ইচ্ছা করে, ওঙ্কারনাথের জীবনেও সে সমস্তই ঘটিয়াছে। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, তাহার ইচ্ছার পশ্চাতে প্রত্যয় আছে, জ্ঞানের পশ্চাতে কর্মস্পৃহা আছে, এবং এরূপ মণিকাঞ্চন যোগাযোগের ফলে ওঙ্কারনাথ স্থির করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে চুরি করিবে।

চুরি করিবার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যেসব যুক্তি আছে বলিয়া তাহার বিশ্বাস সেগুলি অনেকবার মনে মনে সে আলোচনা করিয়াছে, এমন কি লিখিত আকারে সম্মুখে রাখিয়াও বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে যে চুরি না করিবার পক্ষে একটি মাত্র যুক্তি—কোন কোন শাস্ত্রের ও তথাকথিত মহাপুরুষের নিষেধ, আর স্বপক্ষে যুক্তির অন্ত নাই। আর কোন কারণে না হোক, নিছক ভোটের জোরেও চুরির স্বপক্ষগণের জিতিয়া যাইবার সম্ভাবনা। চুরির স্বপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তির একটি তালিকা আমরা উদ্ধার করিয়া দিলাম। একবার দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সমস্ত সমস্যাটি জলের মত সহজগ্রাহ্য হইয়া আসিবে—এবং চাই কি, পাঠক, অভীষ্ট মত সংগঠনে তোমাকে কিছু সাহায্য করিলেও করিতে পারে।

(১) কেন চুরি করিব

১। সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে চুরি করিতেছে।

২। সার্থক চোরকে কেহ নিন্দা করে না, বরঞ্চ তাহার সামাজিক মানমর্যাদার অভাব হয় না।

৩। চুরি না করিলে আদর্শবাদ দূরে থাকুক, সংসারও চলে না।

৪। চুরি না করিলে গৃহিণী কাপুরুষ, বন্ধুরা ভণ্ড এবং ভৃত্যগণ বেকার মনে করিবে।

৫। চুরি না করিয়া এ পর্যন্ত কেহ বড় হয় নাই।

৬। ধরা না পড়িলে চুরির মত ধনাগমের সহজ পন্থা আর নাই।

৭। তুমি সাধু বলিয়া কেহ তোমার অভাবে সাহায্য করিবে কি ?

৮। ঐ অমুকবাবু একজন বনেদী চোর—তাঁহার মানমর্যাদা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা কাহার চেয়ে কম ?

৯। যেখানে সকলেই চোর, সেখানে চুরি না করা এক প্রকার সমাজদ্রোহিতা।

১০। আমার অভাব, ধনীর অতিরিক্ত,—চুরির ক্ষেত্র বলিতে গেলে স্বয়ং ভগবানই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

(২) কেন করিব না

১। শাস্ত্র বলিয়া কথিত কোন কোন গ্রন্থের এবং মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত কোন কোন মানুষের নিষেধ।

∴ চুরি করিবই করিব। তবে কাজটা আইন বাঁচাইয়া করিতে হইবে। তবে সেটাও প্রথম দিকে, পরে জানাজানি হইয়া গেলে, সার্থকনামা চোর বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে সেটুকু নষ্ট করিবারও আর প্রয়োজন হইবে না।

ইহাই সংক্ষেপে ওঙ্কারনাথের সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত যুক্তি ও বিশ্লেষণ।

২

আজ ওঙ্কারনাথের জীবন-ক্যালেণ্ডারে নূতন তারিখ—লাল কালিতে ছাপা। আজ হইতে সে চুরি শুরু করিবে, ওসব আদর্শবাদের ধাপ্পা আর নয়, গুড্‌বাই টু অল ছাট্।

আইনসঙ্গত চুরির নিরাপত্তম উপায়—ধার করা। প্রয়োজন হইলে ধার অনেকেই করে, শোধ করিয়াও দেয়, অন্ততঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধার করিবার সময়ে শোধ করিবার ইচ্ছা মনে থাকে। সে ধার স্বতন্ত্র জাতের। এ ধার অন্য বস্তু। গোড়া হইতেই সঙ্কল্প—ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না। আইনের ভয় নাই, ঐটুকু ছাড়া ও এক রকম পকেট-কাটাই বটে।

ওঙ্কারনাথ স্থির করিল অধস্তন কর্মচারীর নিকটে ধার করিতে হইবে; সহসা ফিরিয়া চাহিতে পারিবে না।

ওঙ্কারনাথ যথাসময়ে আপিসে গেল। আপিস ছুটি হইবার সময়ে অধস্তন এক কর্মচারীকে নিভৃতে ডাকিয়া হঠাৎ দরকার পড়িয়াছে বলিয়া একশো টাকা চাহিল, (অনভ্যাসবশত গলাটা একটু কাঁপিয়া গিয়াছিল, কিছুদিন পরে আর যাইবে না।) বলিল, মাসের প্রথমেই—

কর্মচারীটি বাধা দিয়া বলিল, সে জানি।

কর্মচারীটি নিজের অভূতপূর্ব সৌভাগ্যে খুশি হইয়া হেড দরোয়ানের নিকট হইতে টাকাটা চাহিয়া আনিয়া ওঙ্কারনাথের হাতে দিল।

ভাগ্যের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের ৫ রাউণ্ডে এইভাবে জয়ী ওঙ্কারনাথ বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাড়িতে ঢুকিয়াই ওঙ্কারনাথ দেখিল, স্ত্রীর মুখখানি বড় হাসি হাসি।

ব্যাপার কি?

তুমিই অনুমান কর দেখি!

আমি কি জানি!

জানিই হও, আর জানোয়ারই হও, আর মানুষই হও, কখনই বলতে পারবে না।

তা হ'লে আর জিজ্ঞাসা কর কেন? নিজেই বল।

আজ তোমার আপিসের সাহেবের (মানে অফিসার বড় হইলেই সাহেব, সাদা চামড়া হইবার প্রয়োজন সব সময়ে হয় না) স্ত্রী এসেছিলেন।

মিসেস বোস?

হ্যাঁ গো।

তিনি তো কখনও কারও বাড়ি, বিশেষ অধস্তন অফিসারের বাড়ি যান না!

তা নইলে আর সৌভাগ্য বলছি কেন?

কোনও কাজ ছিল?

আসল সৌভাগ্য তো এখনও বলি নি।

সেটা আবার কি?

হঠাৎ দরকার পড়েছে ব'লে পাঁচশো টাকা চেয়ে নিয়ে গেলেন, বললেন, মাসের ঠিক প্রথমেই—

ওঙ্কারনাথ ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সেও তো টাকা ধার লইবার সময় ঠিক ওই আশ্বাসই দিয়াছিল, কাজেই ও-কথার দৌড় কতখানি তাহার চেয়ে বেশি কেহ জানে না।

কি গো, তোমার হঠাৎ কি হ'ল?

না, কিচ্ছু না, বেশ আছি। এই বলিয়া ওঙ্কারনাথ একটু একাকী থাকিবার আশায় বাথ-রুমে গিয়া ঢুকিল।

চিন্তার এক চমকে চুরির সার্থকতা যেমন সে বুঝিতে পারিয়াছিল, চিন্তার আর এক চমকে তেমনি বুঝিতে পারিল ও-পথের সার্থকতা সকলের জন্য নহে,

কারণ তুমি যদি অপরের একশো টাকা চুরি কর, অপরে তোমার পাঁচশো টাকা চুরি করিতে পারে। ঘটিয়াছেও তাই।

তিমি যত বড়ই হোক, তিমিঙ্গিল তাহার চেয়েও বড়। তাহার চাইতেও অনেক বড় রাঘব বোয়াল। অতএব সংসারের আর দশটা দুর্গম পথের ন্যায় চুরির পথও নির্বোধের পক্ষে সুগম নয়।

ওঙ্কারনাথ স্থির করিল যে, চুরি করিবে না। অধস্তন কর্মচারীর একশো টাকা মাসের প্রথমেই সে ফেরত দিয়াছে, যদিচ সাহেবের স্ত্রী টাকাটা এখনও ফেরত দিয়া যায় নাই। চুরি না করিবার পক্ষে আর একটি যুক্তি অভিজ্ঞতা হইতে সে খুঁজিয়া পাইয়াছে—

"সার্থকভাবে চুরি করিতেও বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন। তাহা না থাকিলে ও-পথে অগ্রসর হইও না, ঠকিয়া মরিবে।"

নিশীথিনী

সিংভূম জেলা আদিম পাহাড় ও অরণ্যে পরিপূর্ণ। উত্তরাপথ যখন মহাসমুদ্রের অংশ ছিল, প্রাগৈতিহাসিক জলচর জীবেরা যখন অতিকায়িক বপু লইয়া সেই বিশাল জলময় মরুতে সন্তরণ করিত, সিংভূমের ভূখণ্ডে তখন প্রাচীন শ্বাপদ ও প্রাচীন উদ্ভিদ্ দেখা দিয়াছে। মানবহীন নির্জনতায় তাহারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত, পাহাড়ের গুহায় গুহায় তাহাদের আবাস ছিল, প্রাচীন স্বুবর্ণরেখার বারি পান করিয়া তাহারা তৃষ্ণা মিটাইত। সুবর্ণরেখা গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্রের তুলনায় কৌলিন্যে দীন হইলেও অস্তিত্বের দলিল তাহার অনেক বেশি পাকা।

সিংভূমের পাহাড় পর্বতরাজ হিমালয়ের আত্মীয় নয়, তাহাদের সগোত্রত্ব বিন্ধ্যপর্বতের সহিত। এ সব পাহাড় বিন্ধ্যপর্বতের দূরাতিদূর জ্ঞাতিবন্ধু। এখানকার অরণ্যমালাও প্রাচীন। তাহাদের শাখা-প্রশাখায় যে বাণী মর্মরিত হইয়া ওঠে—তাহার ভাষা হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের বনস্পতিদের অজ্ঞাত। হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গয়র প্রভৃতি যে-সব শ্বাপদ এখানে বাস করে, অরণ্যের তুলনায় তাহারা এতই অর্বাচীন যে অরণ্য তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করে না। এখানকার আদিম অরণ্য ও পর্বত চিরস্থায়ী রাত্রির মতো সিংভূমের অনেকটা স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিতেছে—সেই রাত্রির বুকে দুঃস্বপ্নের মতো শ্বাপদের দল ঘুরিয়া বেড়ায়—স্বপ্নের গোঙানির মতো তাহাদের গর্জন নিস্তব্ধতাকে কণ্টকিত করিয়া তোলে। সেই অন্ধকারের সীমানা ঘেঁষিয়া জমাট অন্ধকারে গড়া যাহাদের দেহ সেই আদিবাসীর দল বাস করে, তাহারা আধুনিক শহর ও জনপদে বড় আসে না। সিংভূমের এমন অনেক অঞ্চল আছে, সভ্য মানুষ এখনও সেখানে প্রবেশ করে নাই।

আজ এমনই একটি স্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখিতে উদ্যত হইয়াছি।

নরসিংগড় সিংভূম জেলার একটি ছোট জায়গা, বেশি লোকের নজর এখানে পড়ে নাই, কিন্তু ভ্রমণরসিকেরা জানে সিংভূমের পার্বত্য অরণ্য অঞ্চলে

প্রবেশের সিংহদ্বার এই ছোট জায়গাটি। এখানে একটি ডাকঘর আছে, আর আছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের একটি অফিস। এখানকার অফিসের ছোট সাহেব আমাদের একজন বন্ধু। তার নাম তরুণ গুপ্ত। সে অনেকবার লিখিয়াছে যে বেড়াইবার শখ থাকিলে আমরা যেন সেখানে যাই—শখ মিটাইয়া দিবে। কিন্তু কাজের চাপে যাওয়া হয় না। সেবারে বড়দিনের ছুটিতে প্রকাশ নামে এক বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া নরসিংগড়ে গিয়া পৌঁছিলাম। তখন সন্ধ্যাকাল। গুপ্ত ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল। কাছেই তার সরকারী বাসা। গুপ্ত অবিবাহিত। কাজেই তিনজনে মিলিয়া নিঃসপত্ন অধিকারে রাত্রিটা বেশ কাটিল। আহারাদির পরে গুপ্ত বলিল—কাল তোমাদের নিয়ে বের হ'ব।

সে বলিল—আমার জিপ আছে, পাহাড়ে চলে বেড়াতে জিপের জুড়ি নেই। এমন সব জায়গায় যাবো—যার জুড়ি ভারতবর্ষে পাবে না, এক মধ্য আফ্রিকার অরণ্যে গেলে তার দোসর মিলবে।

রাত্রি ভোর হইলে বারান্দায় বাহির হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ দুইদিক দেখিয়া লইলাম। দক্ষিণ দিকে কিছু দূরে সুবর্ণরেখা নদী—তারপরে মাঠ, মাঠের পরে পাহাড়ের শ্রেণী—ভাঁজে ভাঁজে পাহাড়, কতদূর আন্দাজ করা সম্ভব নয়। আর উত্তর দিকে পাহাড় আরও আছে—সে পাহাড়ের শ্রেণীরও অন্ত নাই।

এমন সময় গুপ্ত বাহিরে আসিল, বলিল—পাহাড় দেখ্‌ছ?

সে বলিল ঐ দক্ষিণ দিকের পাহাড় আমার এলাকার বাহিরে—ওগুলো ময়ূরভঞ্জের পাহাড়।

তারপরে বলিল—উত্তর দিকের পাহাড়ে আমরা যাবো।

আহারাদি দশটার মধ্যে সারিয়া লইয়া আমরা তিনজনে জিপযোগে উত্তর দিকে রওনা হইলাম। গুপ্ত জিপ চালাইতেছে। সন্ধ্যার আগেই ফিরিব স্থির হইয়াছিল, কাজেই সঙ্গে সামান্য কিছু খাদ্যমাত্র লওয়া হইল।

মাঠের পথ ধরিয়া জিপ ছুটিতে লাগিল—দুইদিকের মাঠে আম গাছ, মহুয়া গাছ, শাল, হর্তুকি, পিয়াশাল, আরও কত কি গাছ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, কোনটা বাঙালীদের, কোনটা বা আদিবাসীদের। সবে ধান-কেটে-নেওয়া নেড়া মাঠ থাকে থাকে উঠিয়া নামিয়া দিগন্তে মিশিয়াছে। জিপ অগ্রসর হইতেছে, পাহাড় ক্রমেই স্পষ্টতর হইতেছে। পাহাড়ের মাথায় ঘন অরণ্য। অবশেষে একটা পাহাড়ের গায়ে গাড়ী দাঁড়াইল।

আমি শুধালাম, কি, নামতে হবে না কি ?

গুপ্ত বলিল—না।

তারপরে তিনজনে তিনটি সিগারেট খাওয়া শেষ করিলে গাড়ী আবার ছাড়িল। এবার গাড়ী পাহাড়ে উঠিতেছে, পথ সঙ্কীর্ণ, কোন রকমে কাজ চালানো গোছের।

গুপ্ত বলিল—বর্ষাকালে পথগুলো ধ্বসে যায়, বর্ষার পরে ব্যবসায়ীরা আবার তৈরী ক'রে নেয়।

পাহাড়ে শালের গাছই বেশি—কিন্তু অন্য জাতের গাছও অল্প নয়—সে সব গাছ বাংলার মাটিতে বড় জন্মায় না। গধ, কেঁদ, পিয়াশাল। এবারে পাহাড়ের কাঁধে উঠিয়াছি, বাঁদিকে খাড়া পাহাড়ে থাকে থাকে পুঞ্জিত অরণ্য, ডানদিকে সুগভীর খাদ—ঝুঁকিয়া পড়িলে দেখা যায় অতিনিম্নে একটা শুভ্র স্বচ্ছ জলধারা—পাহাড়ের সর্ব্বত্র তাহার গুঞ্জন শোনা যায়। ঐ একটিমাত্র গুঞ্জন একতারার একটি সুরের মতো ধ্বনিত হইতেছে। ইতিপূর্বে এমন নির্জনতাও দেখি নাই ; এমন নিস্তব্ধতাও জানি নাই। অথচ মনে হইতেছে চারিদিক শূন্য নয়—কেমন যেন একটা গম্ গম্ ছম্ ছম্ ভাবে সমস্ত পূর্ণ! নিস্তব্ধতার মধ্যে যে একটা পূর্ণতা আছে তাহা এই প্রথম অনুভব করিলাম। ডানদিকে খাদের অপর পারে একটা পাহাড়, তাহার গায়েও অরণ্যের মেঘ-জমা।

এবারে গাড়ী নামিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ীটা একটা সমতল মাঠে আসিয়া পড়িল ! মাঠ বটে কিন্তু তার চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা ; পাহাড়ের পা হইতে চুড়া অবধি ঘন অরণ্যে ঠাসা। মাঠের মাঝে বেশি গাছ নাই—কতকগুলি গাছ এদিকে ওদিকে ছড়ানো।

প্রকাশ শুধাইল—এসব বনে কি থাকে ?

অরুণ বলিল—সব রকম প্রাণীই থাকে, হাতী, বাঘ, ভালুক, বুনো মহিষ, বুনো শূকর, আরও কত কি !

এ সব কথায় শহরবাসীর মনে ভয় জন্মানো অস্বাভাবিক নয় ভাবিয়া সে বলিল—কিন্তু ওরা দিনের বেলায় বের হয় না।

দিনের বেলায় বাহির হইলেই বা ক্ষতি কি ? এখানে দিনে রাতে প্রভেদ কোথায় ?

গুপ্ত বলিল—ঐ যে উঁচু মাচাটা দেখছ—ওটা চাষীরা হাতী তাড়াবার জন্যে তৈরি করেছিল।

অদূরে প্রকাণ্ড একটা আম গাছকে আশ্রয় করিয়া একটি উঁচু মাচা বাঁধা আছে বটে। আর চাষীর উল্লেখে নজর পড়িল সম্মুখেই কয়েকখণ্ড ধান-কাটা নেড়া ক্ষেত।

আমি বলিলাম—হাতী কি এখানে আসে না কি?

—আসে বই কি। এই সেদিনেও এক পাল হাতী নেমেছিল।

তবে একটি নয়, এক পাল। খুব আশ্বাসের সংবাদ বটে।

গাড়ী আসিয়া একটা পাহাড়ের নীচে থামিল।

গুপ্ত বলিল—এবারে নামা যাক। সকলে নামিলে সে বলিল—ওখানে একটা বড় ঝরণা আছে—চলো দেখে আসি।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম, শাল, পিয়াশালের গাছে জায়গাটা অন্ধকার—কিন্তু বনভূমি বেশ পরিষ্কার, বাংলা দেশের বনের মতো আগাছায় আচ্ছন্ন নয়। শুঁড়ি পথ অসমতল, ছোটবড় পাথরে আকীর্ণ। আরও কিছু দূর আসিয়া জলধারার শব্দ কানে আসিল—একটা গাছের আড়াল কাটাইয়া চোখে পড়িল প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু হইতে একটি জলধারা সবেগে নীচে পড়িতেছে—এই সেই ঝরণা। ঝরণার ধারার নামে পাহাড়টার নাম ধারাগিরি।

ঝরণার কাছে আসিয়া তিন জনে দাঁড়াইলাম। জল পড়িয়া নীচে গভীর গর্ত হইয়াছে—তাহাতে জল সঞ্চিত। অরুণ বলিল যে বর্ষাকালে ঝরণা অত্যন্ত স্ফীত হইয়া সমস্ত জায়গাটাকে প্লাবিত করিয়া দেয়। এখন শীতকালে ঝরণার ধারা সঙ্কুচিত। উপরে চাহিয়া দেখি ধাপে ধাপে পাহাড়, থাকে থাকে অরণ্য। ঐ ঝরণার ঝরঝর শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বন্য পাখীর ডাক কানে আসিতেছে, কখনো বা এক আধটা হাম্বারব—বুঝিতে পারা যায় নিকটবর্তী গ্রাম হইতে রাখালেরা গোরু চরাইতে আসিয়াছে।

ঝরণার নিকট হইতে জিপ গাড়ীর কাছে যখন ফিরিলাম তখন অপরাহ্ন।

অরুণ বলিল—জায়গাটা চারদিকে পাহাড়-ঘেরা ব'লে অন্ধকার এখানে অতর্কিতে এসে পড়ে।

সে আরও বল্‌ল—হঠাৎ আলো, হঠাৎ অন্ধকার এখানকার নিয়ম।

সে জানালো দিনের বেলায় এখানে যেমন ভয়ের কোন কারণ নেই, সন্ধ্যার ছায়া নামবামাত্র তেমনি ভয়ের কারণ আসন্ন হ'য়ে ওঠে।

—ভয়টা কিসের ?

—বাঘ ভালুকের।

—বাঘ ভালুকের তো বটেই—

—আবার কি হবে ?

অরুণ বলিল—সে কথা ভালো ক'রে বোঝাতে পারবো না, কারণ তা আমার অভিজ্ঞতার বাইরে, তবে অনেক লোকের মুখে শুনেছি যে—তারা সবাই যে অশিক্ষিত গ্রাম্যলোক এমন নয়—তারা বলেছে যে—

—কি বলেছে খুলেই বলো না, এত ভূমিকা কিসের ?

—সুদীর্ঘ ভূমিকা করলেও ভালো ক'রে বোঝাতে পারবো না, কারণ নিজেই বুঝিনি। যে সব কথা শুনেছি তা নিজের জ্ঞানের ও বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খায় না।

—চোর-ডাকাত নিশ্চয়ই নয়।

—ও বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এখানে মহামূল্য জিনিস ফেলে গেলেও পরদিন ফিরে পাবে, খোয়া যাবে না।

—তবে আর কি হতে পারে ?

—সেই তো বুঝতে পারি না।

—ভূত-প্রেত ?

—না, তাও ঠিক নয়। আমরা যাকে ভূত-প্রেত বলি তার আবাস লোকালয়ের কাছাকাছি। এ আর এক রকম সত্তা।

প্রকাশ অধীর হইয়া বলিল—তুমি এইসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করো।

—বিশ্বাস করি এমন বলিনি, তবে যারা বিশ্বাস করে, প্রত্যক্ষ করেছে তাদের কথাই বলছি।

—তারা হাম্বাগ্‌।

ততক্ষণে জিপের নিকট পৌঁছিয়া ফ্লাস্কে-ভরা চা আর টিফিন-বাস্কেটে-ভরা খাদ্যগুলো বাহির করিয়া তিনজনে খাইতে শুরু করিলাম।

আমি বলিলাম—খুলেই বলো না তারা কি বলেছে ?

তরুণ বলিল—বাড়ী ফিরে গিয়ে হবে।

—কেন এখানে ভয়টা কিসের?

—ভয় ঠিক নয়। বাড়ী গিয়ে পৌঁছে ধীরে সুস্থে আলোচনা করা যাবে।

—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে ভয়ের কারণ অল্প স্বল্প আছে।

—আছে বলেই শুনেছি। ওসব আলোচনায় নাকি তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

—তারা কারা?

—তারা এক রকম ওআইল্ড স্পিরিট।

প্রকাশ বলিল—বনে ঘুরে ঘুরে তুমি বুনো হ'য়ে গিয়েছ দেখ্‌ছি, গুপ্ত!

—এতই যদি অবিশ্বাস, তবে আবার আগ্রহ কেন?

—অহৈতুক কৌতূহল ছাড়া কিছু নয়।

—রূপকথা শুনি বলে কি তাতে বিশ্বাসও করতে হবে? পক্ষিরাজ ঘোড়ায় তুমি কি বিশ্বাস করতে বলো?

—আমি কিছুই বলি না। কিন্তু লোকে ঐ রকম বিচিত্র পশুপক্ষী এখানে দেখতে পেয়েছে। যারা দেখেছে তারা তোমার আমার চেয়ে কম শিক্ষিত নয়, কম বুদ্ধিমান্ নয়।

—এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে?

—এখানে বিংশ শতাব্দী কোথায়? একে খৃষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার শতাব্দী বলতে দোষ কি? তুমি আমি বিংশ শতাব্দীর লোক, ঐ নরসিংগড় শহর বিংশ শতাব্দীর—কিন্তু এই পাহাড়, এই অরণ্য, এই সমতল ক্ষেত্র—এ কি বিংশ শতকের? পাঁচ হাজার বছর আগে এসব যেমন ছিল আর পাঁচ হাজার বছর পরেও ঠিক তেমনি থাকবে। এখানকার সংস্কার স্বতন্ত্র।

—তোমার ফিলজফির ব্যাখ্যা রেখে আসল ব্যাপারটা কি খুলে বলো।

তরুণ আরম্ভ করিল—এদেশে যেসব আদি অধিবাসী আছে, সভ্য মানুষ আসবার আগেও তারা ছিল, তেমনি অদৃশ্য লোকে বা প্রেতলোকে এক শ্রেণীর আদি অধিবাসী আছে—তাদের বাস এইসব জায়গায়। মৃত মানুষের প্রেতাত্মার সঙ্গে তাদের একটা প্রভেদ আছে। প্রেতাত্মা অদৃশ্য লোকে আসে, আবার পুনর্জন্ম নিয়ে চলে যায়। কিন্তু প্রেতলোকের অধিবাসীরা চিরকাল সমানভাবে বিরাজ করছে। তারা কোন মানুষের প্রেতাত্মা নয়—ঐ ভাবেই

তাদের সৃষ্টি এবং স্থিতি। কি রকম জানো, বিধাতা যেন তাদের গড়তে গড়তে অসম্পূর্ণ করে রেখে তারপরে তাদের কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছেন। তাই এদের জগতের নিয়মের সঙ্গে সাধারণতঃ আমরা যাকে প্রেতজগৎ বলি তার নিয়ম মেলে না।

—তার মানে বল্‌তে চাও এ একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা জগৎ ?

—তাই বটে! এ জগতের মানুষ, পশু, পাখী, এমন কি গাছপালারও স্বতন্ত্র নিয়ম।

—অর্থাৎ ভূতে-পাওয়া গাছ? গুপ্ত তোমার রোগ চিকিৎসার বাইরে।

গুপ্ত হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—চলো, আর দেরী নয়।

তারপরে নিজের মনেই যেন বলিল—নাঃ, খুব দেরী হ'য়ে গেল।

—কেন এত ভয় কিসের ?

সে এবারে বিরক্ত হইয়া বলিল—প্রকাশ, তোমার জানা জগৎ ছাড়াও যে অন্য নিয়মের জগৎ থাকতে পারে এই মোটা কথাটায় বিশ্বাস করতে পারো না কেন? অন্ধকার হ'বামাত্র এখানকার নিয়ম পালটে যায়। এটা আমার অভিজ্ঞতার কথা। নাও ওঠো।

জিপ ছুটিল। কিন্তু তর্কবিতর্কে যে আমরা কতক্ষণ কাটাইয়া দিয়াছি সে হুঁস ছিল না। সমতল হইতে পাহাড়টার গোড়ায় আসিবার আগেই দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ অন্ধকার হইয়া গেল। অন্ধকার যে এমন অতর্কিতে আসিতে পারে সে ধারণা আমাদের ছিল না। গুপ্ত একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করিয়া এঞ্জিনে জোর দিল, আলো দুটা জ্বালাইয়া দিল—গাড়ী পাহাড়ে উঠিতে লাগিল। পথ সরল নয়, ঘন ঘন মোড় ঘুরিয়াছে। একবার একটা মোড় ঘুরিতেই গুপ্ত অস্ফুটস্বরে নিজ মনে বলিয়া উঠিল—যা ভেবেছিলাম—

আমরা দু'জনে চকিত হইয়া উঠিলাম, ব্যাপার কি ?

তিনজনেই দেখিতে পাইলাম, পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথ রুদ্ধ করিয়া বৃহদাকার কি একটা বস্তু পড়িয়া আছে।

গাছ? পাথর? না, কোন বন্য জন্তু? জিনিসটার নড়াচড়া নাই। গুপ্ত এঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিল। আমরা বলিলাম—এ কি করলে? সে বলিল—যদি হাতী হয় ?

—বুনো হাতী ?

—বনে বুনো হাতী ছাড়া আর কি আসবে ?

—এঞ্জিন বন্ধ করলে কেন ?

অনেক সময়ে চার্জ করে।

এক মুহূর্ত পরে তিনজনেই একসঙ্গে দেখিলাম কোথাও কিছু নাই।

প্রকাশ হাসিয়া বলিল—গাছের ছায়া টায়া হবে।

গুপ্ত বলিল—অন্ধকারে ছায়া পড়তে যাবে কেন ?

তারপরে বলিল—এ রকম অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। সামনে আর একটা খারাপ জায়গা আছে—সেটা পার হ'তে পারলেই—

—রাস্তা খারাপ ?

—না, জায়গাটাই খারাপ।

—তার মানে।

গুপ্ত অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিল—এখানে নয়, বাড়ী গিয়ে হবে।

যেন কাহার ভয়ে সে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নীচে নামাইয়া কথাটি উচ্চারণ করিল।

জিপ ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে একটি মোড় ঘুরিল, দুদিকেই সমান অন্ধকার, একদিকে খাড়া পাহাড়, একদিকে গভীর খাদ ; খাদের মধ্যে প্রবাহিত নদীর শব্দ এখন দিনের চেয়ে অনেক স্পষ্ট, সম্মুখে জিপের যুগল আলোয় প্রত্যক্ষ পথ, সম্মুখে কোন বাধা নাই। এমন সময়ে বারকয়েক গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া এঞ্জিন থামিয়া গেল। অনেক সাধ্য-সাধনাতেও এঞ্জিন আর চলিল না। প্রকাশ মোটর যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ, সে গুপ্তর পাশে বসিয়া ছিল, সেও সাধ্যমত চেষ্টা করিল, কিন্তু এঞ্জিন চলিবার বা গাড়ী নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

প্রকাশ বলিল—হঠাৎ এমন হ'ল কেন ?

গুপ্ত বলিল—হঠাৎ এমন নয়, আগেই আশঙ্কা ক'রেছিলাম। এ জায়গাটাতে রাতবিরেতে গাড়ী প্রায়ই খারাপ হ'য়ে থাকে।

—এখন কর্তব্য কি ?

গুপ্ত বলিল—ফিরে চলো—

—গাড়ী যে অচল—

—গাড়ী এখানে থাক্, আমাদের হেঁটে ফিরতে হবে—

—এই বলিয়া সে নামিয়া পড়িল, বিজলি বাতির মশাল জ্বালাইয়া চারিদিক দেখিয়া লইয়া বলিল—তোমরা এসো।

তিনজনে সারবন্দী ভাবে ফিরিয়া রওনা হইলাম। পাহাড়ের উপর বেশি দূর উঠি নাই, অল্পক্ষণ পরেই সমতলে নামিয়া আসিলাম। আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া হাতী-তাড়ানো সেই মাচাটার কাছে গুপ্ত আসিয়া দাঁড়াইল। যাইবার সময়ে এটাকে দেখিয়াছিলাম, একটা আমগাছকে আশ্রয় করিয়া মাচাটি বাঁধা।

গুপ্ত বলিল—উঠে পড়ো, আজ রাতটা এখানে কাটাতে হবে।

আমরা একসঙ্গে বলিলাম—এ কি ব্যবস্থা?

গুপ্ত বলিল—তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো, বেশিক্ষণ নীচে থাকা নিরাপদ নয়। বাঘ ভালুক নিকটেই থাকতে পারে।

অগত্যা মাচায় উঠিলাম, গুপ্ত সব শেষে উঠিল।

মাচার বাঁশের পাটাতনের উপরে এক পত্তন খড় পাতা, উপরে খড়ের একটা ছাউনি।

একটু সুস্থ হইলে পরে গুপ্ত বলিল—তোমাদের এখানে এনে ভালো করিনি, আর আসলেও সময় মতো ফেরা উচিত ছিল।

—ভয়টা কিসের?

—ভূত প্রেতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। বাঘ ভালুকের ভয় তো আছে।

—অতএব?

—অতএব কষ্ট করে এখানে রাত্রিযাপন ব্যতীত উপায় নাই, এমন আরও একবার আগে ঘটেছে।

প্রকাশ বলিল—ভূত-প্রেত দেখেছ না কি?

—না।

তাহার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তরে কেমন যেন সন্দেহ হইল, বলিলাম,—বাঘ ভালুক?

—না, তাও দেখিনি।

বিজলি আলোকে ঘড়িতে দেখিলাম কেবল আটটা। কিন্তু এ কি নিশুতি! যেন ভুলিয়া-যাওয়া জগতের খনির ভিতরকার অন্ধকার!

সারাদিন ঘোরাঘুরি হইয়াছিল, কাজেই যাহার গায়ে যা গরম কাপড় ছিল তাহাই জড়াইয়া কোন রকমে শুইয়া পড়িলাম। ঘুম আসিতে বিলম্ব হইল না।

তখন কত রাত জানি না হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেল, জাগিয়া উঠিয়া দেখি সমস্ত বনে যেন ঝড় বহিতেছে, গাছের ডাল-পালার সে উদ্দাম মাতামাতি। কিন্তু আরও একটু সম্বিৎ হইবামাত্র বুঝিলাম যে এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। সমস্ত অরণ্যটা নড়িতেছে—অথচ আমাদের গাছটায় একটুও সাড়া নাই—আর হাওয়া কোথায়! একটা বনকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে যে প্রচণ্ড ঝড়ের দরকার তাহাতে মাচা সমেত আমাদের উড়িয়া যাইবার কথা! কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ নাই।

ভাবিতে লাগিলাম এ অবস্থায় কর্তব্য কি! দেখিলাম, প্রকাশ ও গুপ্ত অঘোরে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। একবার মনে হইল তাহাদের জাগান যাক, আবার ভাবিলাম তাহাদের সুখস্বপ্নে ব্যাঘাত করিয়া কি ফল? দেখাই যাক না কতদূর কি হয়। এই ভাবিয়া গাছের একটা ডাল ঠেসান দিয়া সুস্থ হইয়া বসিলাম, ঘুমাইবার আশা অনেকক্ষণ বিসর্জন দিয়াছিলাম।

হঠাৎ অরণ্যের চঞ্চলতা থামিয়া গেল। চারিদিক ঘুমন্ত শিশুর মত নিস্তব্ধ হইল। হাওয়া যেমন মন্ত্রে উঠিয়াছিল তেমনি মন্ত্রেই যেন থামিল। চারিদিকে খাড়া পাহাড়ে-ঘেরা উপত্যকার মধ্যে অন্ধকার রাত্রি সরোবরের বদ্ধ জলের মতো বোবা—তাহার ভার যেন মনের উপর চাপিয়া বসে। এ রকমভাবে মূঢ়ের মতো জাগিয়া থাকা নিরর্থক মনে করিয়া আবার শুইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময়ে হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম—এ কি! যতদূর মনে পড়িতেছে দিনের বেলায় তো এমন লক্ষ্য করি নাই। দিনের বেলায় দেখিয়াছিলাম—উপত্যকাটা ফাঁকা, গাছপালা বিরল, বন আরম্ভ হইয়াছে পাহাড়গুলার পাদদেশে। এখন মনে হইল উপত্যকা যেন গাছে ভরিয়া গিয়াছে—মাঝখানে সামান্য একটুখানি ফাঁক। এত গাছ আসিল কোথা হইতে? বুঝিলাম রাত্রির অন্ধকার ও স্থানের অপরিচয় দুইয়ে মিলিয়া চোখের ধাঁধা সৃষ্টি করিয়াছে—নতুবা গাছ গজাইবার সম্ভাবনা কোথায়? বিজলি বাতিটা তুলিয়া লইয়া আলোর পিচকারি ছুঁড়িলাম—যতদূর দেখিলাম উপত্যকা ফাঁকা। কিন্তু যেমনি আলো নিভাইয়া দিলাম, অমনি আবার গাছপালার ভিড়ের অনুভূতি হইল। আরো দুই তিনবার আলো জ্বালাইয়া পরীক্ষা করিলাম—ফলাফল পূর্ববৎ। এ কি চোখের মায়া, না আর কিছু?

মনে পড়িল গুপ্ত বলিয়াছিল যে এখানকার গাছপালাও জীবিত। কথাটা সত্য হইতে পারে না। কিন্তু সমস্যাটা লইয়া বুদ্ধি আর সংস্কারের মতভেদ দেখা দিল। বুদ্ধি বলে কেমন করিয়া হইবে? সংস্কার বলে—চোখে দেখিতে পাইতেছ না কি? ভাবিলাম জগতের সব রহস্যই কি আমার অবগত। যদি সত্যই গাছপালাগুলি জীবন্ত হয়। তবে তাহাদের আগাইয়া আসা তো অসম্ভব নয়। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? সারিবদ্ধ শ্রেণীর মতো তাহারা আগাইয়া আসিতেছে কেন? কে তাহাদের লক্ষ্য? আমরা কি? গা-টা ছমছম করিয়া উঠিল? তবে তো এই মাচা-বাঁধা আমগাছটাও জীবন্ত হইতে পারে! সভয়ে একবার এদিক ওদিক চাহিলাম। নাঃ, গাছটা গাছের মতো অচল ও নীরব। তবু ভয় যায় না।

এ সব কথা দিনের বেলায় শুনিয়া লোকে হাসিবে, আমিও হাসিয়াছি—সেদিন রাত্রে, সেখানে বসিয়া যে-ভাব মনে উদিত হইয়াছিল তাহার সঙ্গে হাসির মিল নাই। একবার ভাবিলাম গুপ্ত ও প্রকাশকে জাগাই, তারপরে ভাবিলাম বেচারারা ঘুমাইতেছে, তাহাদের সুখে ব্যাঘাত করিয়া কি লাভ? মূঢ়ের মতো, সর্পমুগ্ধ হরিণের মতো একদৃষ্টে উপত্যকার দিকে তাকাইয়া জাগিয়া বসিয়া রহিলাম!

বনে যে এত রকম বিচিত্র শব্দ হইতে পারে তাহা জানিতাম না, দিনের বেলায় অন্ততঃ শুনি নাই। কোন শব্দ বা টুং টুং করিয়া ঘণ্টার মতো বাজিতেছে, কোথাও বা একটানা করুণ আওয়াজ; কোন শব্দ বা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের মতো। পরে খোঁজ করিয়া জানিয়াছিলাম ও সব বন্য পাখীর ডাক। হঠাৎ অদূরে গাধার ডাক শোনা গেল। গাধা গৃহপালিত জীব—এখানে আসিবে কি ভাবে? ইহার সম্বন্ধেও পরে খোঁজ করিয়াছিলাম, শুনিয়াছিলাম যে, বুনো হাতীর ডাক অনেকটা গাধার ডাকের মতো শ্রুত হয়। বিচিত্র শব্দের ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে সমস্ত অরণ্যটাকে সজীব বলিয়া মনে হইল! আমার কেমন যেন বোধ হইল যে সারা বনময় একটা কানাকানি, জানাজানি, উসখুস, ফিসফাস পড়িয়া গিয়াছে, যেন একটা ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ।

আমার মনের একটা অংশ যখন এই সব চিন্তা করিতেছিল তখন আর একটা অংশ ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সংশয়পোষণ করিয়া হাসিতেছিল—মনের মধ্যে দুটা পরস্পরবিরোধী ধারা পাশাপাশি বহিতেছিল, সে বিষয়ে আমি ক্ষণে ক্ষণে সচেতন

হইয়া উঠিতেছিলাম—আর সেই দোটানার স্রোতে অসহায় আমি তরণীর মতো উৎক্ষিপ্ত নিক্ষিপ্ত হইতেছিলাম! এ এক অভাবিত অভিজ্ঞতা। হঠাৎ গাছের ফাঁক দিয়া উপরের দিকে নজর পড়িতেই দেখিতে পাইলাম শিশিরমার্জিত আকাশে গোটা দুই উজ্জ্বল তারকা জাদুকরের মোহময় চক্ষুর মতো আমার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া আছে। চিরকাল আকাশের তারা আমরা মানবপরিবেশ হইতে দেখিতে অভ্যস্ত, আজ মানবস্পর্শবিমুক্ত প্রকৃতির বুকের কাছে বসিয়া তাহাদের দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম তারা কেবল সুন্দর নয়, ভয়ালও বটে। বটে, তবে এই মোহদৃষ্টি ঐ জাদুকরেরই কাজ? তবে এ সমস্তই ঐ নিশীথিনীরই কাজ!

হে জাদুকরী, হে নিশীথিনী, তোমার অন্ধকারের থলি হইতে জাদুদণ্ড বাহির করিয়া কেন বিশ্বের চোখে বুলাইয়া দিয়াছ জানি না, কিন্তু তাহাতে যে সমস্ত দৃশ্যের, সমস্ত মূল্যের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে তাহা তো প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ পাথরেগড়া পাহাড় এখন ছায়াসম, ঐ মাটিতে শৃঙ্খলিত অরণ্য সৈন্য-বাহিনীর মতো সচল, ঐ পশুপক্ষীর রব এখন সুগভীর ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ, ঐ যে-দিবালোকের নিরীহ নীরস জগৎটা এখন মায়াপুরীর উন্মুক্ত বাতায়নের নিকটবর্তী অলিন্দের মতো প্রতিভাত—এ তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি! এই মুহূর্তে ইহার মধ্যে অবিশ্বাসের সূচ্যগ্র বিঁধাইবার স্থানও তো নাই! দিনের বেলায় একথা মনে পড়িয়া হাসি আসিবে—কিন্তু যে উৎকর্ণ উৎকণ্ঠায় বসিয়া আছি তাহা তো মিথ্যা নয়।

অরণ্যের চঞ্চলতায় আমার সাময়িক মুগ্ধভাব ভঙ্গ হইল। আবার ঝড় উঠিয়াছে—গাছের ডালপালার আর্তনাদ—অথচ এক ফোঁটা বাতাস গায়ে লাগিতেছে না, এ যেন ছবির ঝড়। এ কোন্ মায়ালোকের ঝড়! কোন্ জাদুজগতের অন্তঃকুহর হইতে এই ঝঞ্ঝা যেন প্রশ্বসিত! আমি এই জাদুজগতের অন্তর্গত নই বলিয়াই তাহা আমাকে স্পর্শ করিতেছে না।

এবারে আমাদের গাছটাও মড়মড় করিতেছে—কিন্তু বলাবাহুল্য কোথাও বাতাস নাই। সিগারেট ধরাইলাম। দেশলাইয়ে কাঠি নিঃস্পন্দ শিখায় জ্বলিল। উপত্যকার বনময় এই যে মাতামাতি এ যেন অন্ধকারকে মন্থন করিয়া কি এক রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা। কি সেই রহস্য? তাহা যদি জানিতাম তবে প্রকৃতির শেষ কথাটাই হয় তো জানা হইয়া যাইত! সে রহস্য

মানুষের জানিবার নয়—কেবল সেই রহস্য-পারাবারের তীরে বসিয়া ঢেউ খাইবার, অনুমান করিবার, শীকরজালে অঙ্কিত রামধনু দেখিবার এবং অতলে তলাইয়া যাইবার অধিকার মানুষের আছে ; সে রহস্য জানিবার অধিকার নাই।

প্রকাশ ঠেলিতেছে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম।

প্রকাশ বলিল—খুব ঘুমোলে !

গুপ্ত বলিল—সিগারেটের ছাই এলো কোথা থেকে ?

আমি বলিলাম—রাতে একবার উঠেছিলাম।

প্রকাশ বলিল—কিছু দেখতে পেলে ? গুপ্তর গাছের নড়াচড়া— ? সংক্ষেপে বলিলাম—না।

মনে হইল ঐ সিগারেটের ছাই সাক্ষী না থাকিলে রাতের অভিজ্ঞতাকে আমার নিজেরই তো স্বপ্ন বলিয়া মনে হইত, অন্যে কেন বিশ্বাস করিতে যাইবে। বুঝিলাম যে শেষ রাতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

প্রকাশ অবিশ্বাসে হাসিতে লাগিল ; প্রমাণাভাববশতঃ গুপ্ত চুপ করিয়া রহিল। আমিও নীরব ছিলাম, কিন্তু অন্য কারণে। রাত্রির অভিজ্ঞতাকে জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে ব্যস্ত ছিলাম, কথা বলিবার অবসর ছিল না।

তিনজনে মাচা হইতে নামিয়া জিপ গাড়ীটার কাছে আসিলাম। গাড়ী পূর্ববৎ রহিয়াছে। এবারে গাড়ীতে চড়িয়া যন্ত্রে দম দিতেই গাড়ী সুবোধ বালকটির মতো নড়িয়া উঠিয়া ছুটিল। রাত্রির অবাধ্যতার লক্ষণমাত্র প্রকাশ পাইল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নিরাপদে আমরা গুপ্তর সরকারী বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম।

তারপরে অনেক কাল গিয়াছে, এখনো সে রাত্রির অভিজ্ঞতা বিনা বাতাসে ঝড়ের মতো আমার মনকে মাঝে মাঝে নাড়া দেয়—জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে আজও তাহাদের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারি নাই।

চোখে-আঙুল-দাদা

পুরাকালে জম্বুদ্বীপে চোখে-আঙুল-দাদা নামে এক ব্যক্তি বাস করিত। তাহার এই অদ্ভুত নামটি নিজের কীর্তি দ্বারা অর্জিত। তাহার পিতৃদত্ত নাম সকলে ভুলিয়া গিয়াছিল। সকলের দোষ সে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিত বলিয়া সকলে তাহাকে চোখে-আঙুল-দাদা বলিয়া ডাকিত। তাহার দৃষ্টিতে কেহ বা কিছু নিখুঁত ছিল না। কোন লোককে সকলে সুপুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিবামাত্র তাহার ভ্রূকুঞ্চিত চোখের দৃষ্টি ছিদ্রান্বেষী হইয়া উঠিত, সুপুরুষ ব্যক্তিটিকে সে আপাদমস্তক খুঁটিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিত—এই যে! এই বলিয়া তাহার অঙ্গুলি সুপুরুষের গালের একটি তিলের উপরে গিয়া পড়িত। সে বলিত—এত বড় একটা তিল থাকিতে তোমরা সুপুরুষ বলিতেছ! ছিঃ!

পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে কোন ব্যক্তি মুগ্ধ হইলে চোখে-আঙুল-দাদা বলিত—তবু যদি না কলঙ্ক থাকিত। একবার ভাবিয়া দেখো দেখি—ঐ জায়গাটা কালো হওয়াতে কতটা আলো হইতে বঞ্চিত হইতেছি।

একদিন তাহার গ্রামের কোন যুবক সদ্য-বিবাহিত বধূকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। সকলে বউ দেখিতে গেল। বউটি অনুপম সুন্দরী। সকলেই বউ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। একজন চোখে-আঙুল-দাদাকে শুধাইল, কেমন দাদা, এবার তো সর্বাঙ্গসুন্দর দেখিলে?

চোখে-আঙুল-দাদা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—মন্দ নয়।

লোকটি বলিল—মন্দ নয়? এমন আর কখনো দেখিয়াছ?

দাদা বলিল—সুন্দর বটে। তবে একটি খুঁত আছে।

সকলে সমস্বরে শুধাইল—কি খুঁত আবার দেখিলে?

চোখে-আঙুল-দাদা বলিল—বউয়ের মুখে বসন্তের দাগ নাই কেন?

তার পরে সে বলিল—ভায়া, আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। জগতে কিছু নিখুঁত থাকিলে তবে তো নিখুঁত দেখিব!

● প্রমথনাথ বিশীর ●

সকলে বুঝিতে পারিত না তাহার দৃষ্টি কোন্ বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন? সকলে সংসারকে সুন্দর দেখে, চোখে-আঙুল-দাদার দৃষ্টিতে সংসারের মুখমণ্ডলে বার্ধক্যের বলি-চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া পড়ে ভাবিয়া লোকে তাহাকে সমীহ করিত এবং ভয়ও যে না করিত এমন নয়।

আর একদিনের ঘটনা বলিতেছি। শহরে একটি রাজপথের পার্শ্বে একটি গভীর নর্দমা ছিল। নর্দমাটি বিষাক্ত পঙ্কে পূর্ণ। একদিন হঠাৎ একজন লোক সেই নর্দমায় পড়িয়া গিয়া নিমজ্জিত হইতে লাগিল—সে রক্ষা পাইবার আশায় সকলকে ডাকিতে লাগিল। অনেক লোক জুটিয়া গেল—কিন্তু কে নামিবে? পঙ্ক যে কেবল গভীর মাত্র এমন নয়, বিষাক্ত বাষ্পে পরিপূর্ণ। যে নামিবে তাকে জীবনের আশা ছাড়িয়াই নামিতে হইবে। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল, ওদিকে লোকটির নিঃশ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিল। তখন একজন ভদ্রলোক গায়ের চাদর খুলিয়া ফেলিয়া নর্দমায় লাফাইয়া পড়িল এবং অনেক কষ্টে লোকটিকে উপরে তুলিল। কিন্তু বিষবাষ্পের ক্রিয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই জনেরই প্রাণ বাহির হইয়া গেল। শহরের লোকে স্থির করিল সেই মহাপ্রাণ উদ্ধারকর্তার উদ্দেশে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিবে। কথাটা চোখে-আঙুল-দাদার কানে গেল, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—স্তম্ভ স্থাপন করিবে করো—কিন্তু ইহার মধ্যে মহাপ্রাণতা কোথায়?

সকলে বলিল—সে কি, দাদা?

চোখে-আঙুল বলিল—তা বই কি? আসল কথা তো আমার অজ্ঞাত নয়। উদ্ধারকর্তা বিপন্ন লোকটির কাছে অনেক টাকা পাইত। পাছে লোকটি মারা গেলে তাহার টাকা মারা যায় সেই আশঙ্কায় সে নর্দমায় নামিয়াছিল। ইহা তো হিসাব-নিকাশ লাভ-লোকসানের ব্যাপার—ইহার মধ্যে মহত্ত্ব দেখিলে কোথায়?

লোকে তাহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল।

তারপরে চোখে-আঙুল-দাদা আরও বলিল—কোন্ কথাই বা আমি জানি না? এই স্তম্ভ স্থাপনের ব্যাপারে যে সব চেয়ে অগ্রণী, তাহার যে সুবৃহৎ মার্বেল পাথরের কারবার আছে—ইহা কে না জানে? স্তম্ভ স্থাপন করিলে তাহার মার্বেল পাথর বিক্রয় হইবে—এই কারণে কি তাহার উৎসাহ নয়?

তারপর সে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—তোমরা ভালো

মানুষ,—যাহার অপর নাম নির্বোধ, তোমরা ঠকিতে পারো, কিন্তু আমাকে ঠকানো অত সহজ নয়। এই বলিয়া সে হাসিল।

স্তম্ভটা স্থাপিত হইল বটে কিন্তু চোখে-আঙুলের ব্যাখ্যার গুণে লোকের আর তেমন উৎসাহ থাকিল না।

এই সব কারণে অর্থাৎ তাহার দৃষ্টির গুণে সবাই চোখে-আঙুলকে বড়ই ভয় করিত। পারতপক্ষে কেহ তাহার কাছে ঘেঁষিত না, তাহাকে এড়াইয়া চলিত, কোন কাজে অগ্রসর হইবার আগে তাহাকে যথাসম্ভব উপঢৌকন পাঠাইয়া দিত, সকালে বিকালে তাহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিত এবং উপদেশ লইবার অছিলায় তাহাকে খোসামোদ করিয়া আসিত। চোখে-আঙুল-দাদা বড় আরামে ছিল।

একবার চোখে-আঙুল-দাদা কামরূপ রাজ্যে বেড়াইতে গেল। সে তথায় পৌঁছিয়া দেখিল রাজ্যে বড় ধুম—ভারি উৎসবের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। সে দেশের অধিবাসিগণ নানা বর্ণের পোষাক পরিয়া, পতাকা তুরী ভেরী শঙ্খ জয়ঢাক লইয়া শোভাযাত্রায় বহির্গত। পথে অগণ্য পথিক, রথ অশ্ব হস্তী, কোথাও নৃত্যগীত হইতেছে, কোনখানে বা আতসবাজি পোড়ান হইতেছে, কোথাও বা যাত্রার আসরে শ্রোতার ভিড়।

ব্যাপারটা চোখে-আঙুল-দাদার বড়ই দৃষ্টিকটু ঠেকিল। সে ভাবিল—ইহারা নিতান্ত নাবালক দেখিতেছি, না বুঝিয়া কী ছেলেমানুষি কাণ্ড করিতেছে। তারপরে ভাবিল—আমি যখন আসিয়াছি, এবার সব শুনিয়া বুঝাইয়া দিই। বেচারা সব বৃথায় ছুটোছুটি করিয়া ঘামিয়া মরিতেছে।

তখন সে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ বাপু, তোমরা ছেলেমানুষি করিতেছ কেন? কিসের জন্য এমন আয়োজন আমাকে বুঝাইয়া দাও তো।

লোকটি বলিল—আজ কামরূপ রাজ্য স্বাধীন হইল। এক পাহাড়ী জাতি এ রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। তাহারা স্বেচ্ছায় এ রাজ্য ছাড়িয়া যাইতেছে—তাই এই উৎসব।

কারণ শুনিয়া চোখে-আঙুল-দাদা গালে হাত দিয়া বলিল—হায়, হায়, এত বড় ফাঁকিটা তোমরা ধরিতে পারিলে না! যদি ঘটে সেটুকু বুদ্ধি না থাকে—তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে কি হইয়াছিল?

লোকটি বিস্মিত হইয়া শুধাইল—ইহাতে ফাঁকি কোথায় দেখিলেন?

চোখে-আঙুল বলিল—আগা-গোড়াই ফাঁকি। সে বলিল—এ স্বাধীনতা স্বাধীনতা নয়, পরাধীনতার নূতন প্যাঁচ। এই সোজা কথাটা তোমরা বুঝিতে পারো নাই?

লোকটি বলিল—এখনও বুঝিতে পারিলাম না।

চোখে-আঙুল বলিল—তবে বুঝাইয়া দিই। আমাদের নূতন শাসকের মাথায় টাক এবং চোখে কালো চশমা—লক্ষ্য করিয়াছ কি? এ সবের অর্থ কি? তোমাদের প্রধান মন্ত্রী ধুতি-চাদর পরে এবং দ্বিতীয় মন্ত্রীর পায়ে জুতা জোটে না—এ সমস্তর কারণ অবগত আছ কি?

লোকটি বলিল—অবশ্যই আছি, কিন্তু এ সমস্ত যে নূতন পরাধীনতার লক্ষণ তা তো জানি না!

চোখে-আঙুল বলিল—তবে জানিয়া লও! এই বলিয়া খেদ করিতে লাগিল—হায়, হায়, একটা জাত আজ পরাধীন হইতে চলিল! ইতিমধ্যে তাহার চারিদিকে অনেকগুলি লোক জুটিয়া গেল। তখন সে তাহাদের সম্বোধন করিয়া বক্তৃতার সুরে বলিতে আরম্ভ করিল—ভাই সব, আজ তোমরা পরাধীন হইতে চলিলে! এ পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে আর কখনো মুক্ত হইতে পারিবে কি? শীঘ্র গিয়া নূতন শাসককে তোমরা সাদা নিশান দেখাও। তাহার কালো চশমায় সাদা নিশান কালো বলিয়া প্রতিভাত হইবে। শীঘ্র গিয়া প্রধান মন্ত্রীকে এক জোড়া শাল ও দ্বিতীয় মন্ত্রীকে এক জোড়া জুতা উপহার দাও। জামাহীন ও জুতাহীন মন্ত্রীর অধীনে বাস করা কি পরাধীনতা নয়? আর ওই যে অদূরে একটা শান্ত্রী দেখিতেছি লোকটাকে দেশী বলিয়া বোধ হইতেছে। অবশেষে দেশী সঙীনের খোঁচা খাইবে? হায়, হায়, এমন অধঃপতন তোমাদের ঘটিল!

সত্যকথা বলিতে কি, কামরূপের অধিবাসিগণ একেবারেই অতিথিপরায়ণ নয়। তাহারা চোখে-আঙুল-দাদার বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া তাহাকে মারিতে মারিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাকে সাধনোচিত ধামে প্রেরণ করিল।

২

চোখে-আঙুল-দাদা পরলোকে গিয়া সোজা বিধাতা-পুরুষের নিকটে উপস্থিত

হইল। বৃদ্ধ বিধাতা-পুরুষ তখন সূচ-সুতা লইয়া ইতিহাসের জীর্ণ কন্থা সীবন করিতেছিলেন।

চোখে-আঙুল-দাদা তাহাকে গিয়া বলিল—স্যর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

বৃদ্ধ বিধাতা মুখ তুলিয়া তাহার দিকে কিছুক্ষণ নির্বাক ভাবে তাকাইয়া থাকিয়া শুধাইল—কি ব্যাপার?

সে বলিল—আমার নাম চোখে-আঙুল-দাদা, আমার বাড়ী গৌড় দেশে। সকলের দোষ আমি চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিই। তাহার ফলে আমি সাধনোচিত ধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তুমিই বুঝি বিধাতা-পুরুষ?

বিধাতা বলিল—হাঁ। কি চাও?

সে বলিল—আর কিছুই নয়। বিশ্বসৃষ্টির আগে আমার সহিত consult করিলে না কেন তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

বিধাতা শুধাইল—কেন বাপু?

চোখে-আঙুল-দাদা বলিল—তাহা হইলে বিশ্বে এত ভুল-ত্রুটি থাকিত না। ধর না কেন—এই যে এমন সুন্দর চাঁদটি—তাহাতে কলঙ্ক থাকিয়া গেল কেন? আমাকে আগে consult করিলে বলিতাম, ও জায়গাটুকুও আলো দিয়া লেপিয়া দাও।

বিধাতার মুখ দিয়া কথা সরিল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

চোখে-আঙুল-দাদা বলিতে লাগিল—গোলাপফুলের সহিত কাঁটা দিবার কি আবশ্যক ছিল? আর কোকিলের স্বর এত মধুর করিলে কিন্তু তাহার রঙটা কালো করিলে কেন? মানুষের সংসারে সন্দেশ মাংস প্রভৃতি সুখাদ্য দিয়াছ কিন্তু তাহার সঙ্গে এত ব্যাধি কেন? মৎস্যকুলকে অবশ্য মানুষের খাদ্য করিয়াই জন্ম দিয়াছ কিন্তু তাহাদের দেহে অনর্থক এতগুলো কাঁটা দিবার হেতু কি? সংসার যদি সত্যই সুখের স্থান করিয়া গড়িলে তবে আধিব্যাধি জরা-মৃত্যু ও ইনকাম ট্যাক্স সৃষ্টি করিবার সার্থকতা কোথায়? আবার জিরাফের গলা অনাবশ্যক লম্বা কেন? ওই মাংসটা গণ্ডারের গলদেশে যোগ করিয়া দিলে তাহার মনঃকষ্ট কি লাঘব হইত না? কত আর বলিব? এ সমস্ত ত্রুটির কারণ বিশ্বসৃষ্টি করিবার আগে তুমি 'Expert Opinion' গ্রহণ

করো নাই! লোকে যাই বলুক, তোমাকে আমি নিখুঁত কারিগর বলিতে পারি না—বড় জোর তুমি মাঝারি-গোছের কারিগর মাত্র!

বিধাতা-পুরুষ বলিল—আমি স্বীকার করিতেছি যে আমার সৃষ্টি নিখুঁত নয়, অনেক ভুল-ত্রুটি করিয়া ফেলিয়াছি—আর সব চেয়ে বড় ত্রুটি এই যে আমি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। আচ্ছা বাপু, এক কাজ কর তো।

এই বলিয়া বিধাতা-পুরুষ তাহাকে এক তাল মাটি দিয়া বলিল—একটি মানুষ গড়ো তো।

চোখে-আঙুল-দাদাকে এমন পরীক্ষায় কেহ ফেলে নাই। সে চিরকাল এমন অধ্যবসায়ের সহিত পরের ত্রুটি ধরিয়া আসিয়াছে যে তাহার যে ভুল-ত্রুটি থাকিতে পারে কেহ চিন্তা করে নাই।

এবারে সে বিপদে পড়িল।

অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া মাটি দিয়া সে একটি পুতুল গড়িয়া বিধাতাকে বলিল—দেখ, কেমন হইল?

বিধাতা ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল—ভালো হইয়াছে, এবারে আমি এই মনুষ্য-পুত্তলিতে প্রাণদান করিতেছি—দেখ কি হয়।

এই বলিয়া বিধাতা মন্ত্র পড়িয়া দিল। মৃৎ-পুত্তলি প্রাণ পাইয়াই চোখে-আঙুল-দাদার গালে সজোরে এক চপেটাঘাত করিল, বলিল—তবে রে শালা, আমাকে এমন করিয়া গড়িলে কেন? আমার হাত দু'টা খাটো, এক চোখে দেখতে পাই না, দুইটা কানই বধির—আবার একটা লেজও দিয়াছ। তোমার আর কাজ ছিল না?

চপেটাঘাতে ঘূর্ণিত-শির চোখে-আঙুল-দাদা আসিয়া বিধাতা-পুরুষের পশ্চাতে আত্মগোপন করিল।

বিধাতা-পুরুষ বলিল—কেমন?

চোখে-আঙুল বলিল—তোমার মাটির দোষ।

বিধাতা বলিল—বেশ, একটু মাটি গড়িয়া নাও না কেন?

চোখে-আঙুল বলিল—পাইব কোথায়?

বিধাতা বলিল—একটু মাটি গড়িতে পারো না? এ আর এমন কি শক্ত?

চোখে-আঙুলকে স্বীকার করিতে হইল সে যেমন ভুল ধরিতে পারে, তেমন গঠন-দক্ষতা তাহার নাই। সে বলিল—আমি চোখে আঙুল দিয়া

দেখাইয়া দিতে পারি—কিন্তু সেই চোখ বা আঙুল তৈয়ারির ক্ষমতা আমার নাই।

তারপরে সে বিধাতাকে বলিল—তাই বলিয়া আমাকে হীন মনে করিও না। এত ভুল-ত্রুটি কার চোখে পড়ে?

বিধাতা বলিল—নরকবাসের ওই তো অসুবিধা।

চোখে-আঙুল চমকিয়া উঠিল, বলিল—নরকবাস? আমি তো স্বর্গে আসিয়াছি।

বিধাতা বলিল—তুমি যেখানেই আসো না কেন, নিশ্চয় জানিও তুমি নরকে বাস করিতেছ।

চোখে-আঙুল বলিল—কেন?

বিধাতা বলিল—যে সর্বদা ভুল-ত্রুটির জগতে বাস করিতেছে সে নরকের অধিবাসী ছাড়া আর কি?

বিধাতা বলিল—সৌন্দর্যই স্বর্গ, সে সৌন্দর্য যেখানেই থাক না কেন।

বিধাতা বলিল—সন্তোষই বৈকুণ্ঠ, সে সন্তোষ যত পাপী তাপী দীন অভাজনের হৃদয়েই থাকুক না কেন?

চোখে আঙুল বলিল—স্বর্গ কি একটি বিশিষ্ট স্থান নয়?

বিধাতা বলিল—স্বর্গ বিশ্বময় ছড়াইয়া আছে, বৈকুণ্ঠ বিশ্বময় ছড়াইয়া আছে। যেখানে একটু সৌন্দর্য প্রতিভাত, সেখানে একটু সন্তোষ অনুভূত, সেই স্থানই স্বর্গ, সেই স্থানই বৈকুণ্ঠ।

চোখে-আঙুল বলিল—তাই যদি হইবে তবে লোকে স্বর্গে আসিবার জন্য এত চেষ্টা করে কেন?

বিধাতা বলিল—না করিলেও ক্ষতি ছিল না। তবে সকলের বিশ্বাস, সৌন্দর্যের ধাপে-ধাপে উন্নীত হইলে মহত্তর সৌন্দর্যলোকে পৌঁছান যাইবে, তাই তাহারা স্বর্গে আসিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন তাহারা স্বর্গে আসিয়া পৌঁছায়, দেখিতে পায় যে মর্ত্যলোকের স্বর্গে ও এখানকার স্বর্গে কোন ভেদ নাই।

চোখে-আঙুল বলিল—তোমার এই থিওরিটাও নিখুঁত নয়। ওর গোড়াকার সিদ্ধান্তটাই ভ্রান্ত। যাক, এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করিতে চাই না—কারণ এ সব সূক্ষ্ম বিষয় তুমি বুঝিতে পারিবে না।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—এবারে আমি কি করিব বলিয়া দাও।

বিধাতা-পুরুষ বলিল—তুমি আবার জম্বুদ্বীপে ফিরিয়া যাও।

চোখে-আঙুল বলিল—সেখানে সবাই আমার উপরে রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

বিধাতা বলিল—স্বভাবটা ছাড়িতে পারো না?

চোখে-আঙুল বলিল—গৌড়বাসী সব পারে, কেবল স্বভাব ছাড়া।

বিধাতা বলিল—বাপু, এখানে তোমার স্থান হওয়া কঠিন। তুমি এক কাজ করো, গৌড় দেশেই যাও। এখন হইতে সে দেশের সমস্ত অধিবাসী তোমার স্বভাব পাইবে। বিশ্বের ভুল-ত্রুটি ছাড়া সে দেশের লোকের চোখে আর কিছুই পড়িবে না—কাজেই তোমার ভয়ের আর কিছু থাকিল না।

চোখে-আঙুল খুশী হইয়া বলিল—এতদিনে মনের মতন একটা বাসস্থান পাইলাম।

এই বলিয়া সে বিধাতা-পুরুষের উদ্দেশ্যে একটা অর্ধ-সমাপ্ত নমস্কার ঠুকিয়া প্রস্থান করিল—যাইবার সময়ে আপন মনে বলিল—A funny old fellow!

বিধাতা-পুরুষ আবার ইতিহাসের জীর্ণ কন্থা সীবনে মনোনিবেশ করিল।

ব্ল্যাকমেল

গোবর্ধন চক্রবর্তী বৃদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ এবং বিপত্নীক। দুর্মুখ এবং রগচটা এবং গ্রামের জমিদারের গোমস্তা।

একদিন চৈত্রমাসের দুপুর বেলা জমিদারের কাছারী হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিল যে, যে ঠিকা-ঝি আসিয়া ঘর দোর সাফ করিয়া উন্নুন ধরাইয়া দিয়া যায়, সে আর আসে নাই। সকাল বেলায় নিজে কলসীতে যে জল তুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, একটি বায়স তাহার মুখের ঢাকনীটা ফেলিয়া দিয়া বসিয়া স্বচ্ছন্দে জলপান করিতেছে। সে কাকটাকে তাড়াইয়া মারিতে গেলে কাকটা উড়িয়া পলাইল, গোবর্ধন কলসীর উপরে গিয়া পড়িল, মাটির কলসী উলটিয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল, এবং কানায় লাগিয়া গোবর্ধনের পা কাটিয়া গেল। সে দূরগত পাখীটার উদ্দেশ্যে যে-সব বিশেষণ প্রয়োগ করিল তাহা পাখীর উদ্দেশ্যে কখনো ব্যবহৃত হয়না, মানুষের উদ্দেশ্যেও কদাচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গোবর্ধন উনুন ধরাইতে বসিল, উনুন ধরিল না, তবে আগুনে হাতটা পুড়িয়া গেল। আর যখন সে হাতের সেবায় নিযুক্ত সেই সময়ে উনুনের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া দেখিতে দেখিতে তাহার ঘরখানি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। গোবর্ধন মুহূর্তকাল স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল—আজ শালাকে দেখে নেবো। এই বলিয়া যে হন্ হন্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

গোবর্ধন কিছুক্ষণ পরেই স্বর্গের দরজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া দারোয়ানজী বলিল, এই ঢুকো মৎ।

গোবর্ধন বলিল, তোমার মৎ ফৎ রাখো, অমন অনেক শালা দারোয়ান চাপরাশি দেখেছি, আজ খাস মনিবকে দেখে নেবো। এই বলিয়া সে ঢুকিয়া পড়িল। দারোয়ান বলিল—বড়ি তাজ্জব কি বাৎ! তারপরে খানিকটা খৈনি যথাবিধি তৈয়ারি করিয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পুনরায় সুখে ঢুকিতে লাগিল।

স্বর্গে প্রবেশ আদৌ কঠিন নয়, কেবল কিঞ্চিৎ সাহস ও দুর্বাক্যের আবশ্যক।

গোবর্ধনকে স্বর্গে প্রবিষ্ট দেখিয়া ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শুধাইল—তুমি কে!

গোবর্ধন বলিল—আমার পরিচয়ে তোমাদের দরকারটা কি শুনি!

দেবতারা বলিল—অন্ততঃ আমাদের পরিচয়টা লও।

গোবর্ধন বলিল—যাত্রাগানের কৃপায় তোমাদের পরিচয় আমার বেশ জানা আছে—ঐ পাঁচমুণ্ড বেটাতো মহাদেব।

মহাদেব ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেল।

ব্রহ্মা বলিল, তোমার প্রয়োজন কি?

গোবর্ধন বলিল—সেই শালাকে আজ দেখিয়া লইব।

কে সেই সৌভাগ্যবান দেবতারা বুঝিতে পারে নাই দেখিয়া গোবধন বলিল—তোমাদের দিয়ে আমার কাজ হইবে না, আমি তোমাদের নাটের গুরু সেই খোদ ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাই।

তারপরে শুধাইল—ভালো চাও তো বলো বেটা কোথায় আছে।

গোবর্ধনের তত্ত্বজিজ্ঞাসায় হতবুদ্ধি দেবগণ মাটিতে বসিয়া পড়িল।

স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে দেবগণ ইতিপূর্বে কখনো জমিদারের জীবন্ত গোমস্তার পাল্লায় পড়ে নাই।

বিষ্ণু দেবতাদের মধ্যে পলিটিশিয়ান অর্থাৎ যখন যেমন তখন তেমন ব্যবহার করিতে পারে; সে বলিল, এতো উত্তম কথা। আপনি এখন স্নানাহার করিয়া বিশ্রাম করুন, তারপরে ভগবানের সঙ্গে দেখা করিবেন, এখন তিনি নিদ্রিত।

গোবর্ধন বলিল—বেটা না ঘুমোলে আর আমার এমন দশা হয়।

যাই হোক দেবতাগণের তোষণে গোবর্ধন স্নানাহার সম্পন্ন করিলে বিষ্ণু বলিল,—আপনি একটু ঘুমোন, ভগবান জাগিলে আপনাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইব।

'সেই ভালো' বলিয়া গোবর্ধন শয়ন করিল এবং চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন ব্রাহ্মণকে নিদ্রিত মনে করিয়া দেবগণ অদূরে বসিয়া কথোপকথন শুরু করিল।

ব্রহ্মা বলিল—আজ সেরেছে। এই বুড়ো বাম্‌নাকে সামাল দেওয়া সহজ হবে না। মহাদেব বলিল, বেটার যে রাগ, তাতে আবার আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে—আমি ওর মধ্যে নাই। ইন্দ্র বলিল—বেটা যদি আমাদের ফাঁকি ধরিয়া ফেলে, আর পৃথিবীতে ফিরিয়া গিয়া সব রটাইয়া দেয়, তবেই আমাদের দেবত্ব গেল—আর কেহ কি মানিবে ?

ব্রহ্মা শুধাইল—এখন কর্তব্য স্থির করো।

বিষ্ণু বলিল—পলিটিক্‌স করিতে গেলে মাঝে মাঝে এমন বিপদ অনিবার্য, —তাই বলিয়া ঘাবড়াইলে চলিবে কেন ?

ব্রহ্মা বলিল—ঘাবড়ানোর কথা নয়, কিন্তু যাহা নাই তাহা আছে বলিয়া প্রমাণ করি কিরূপে ?

ইন্দ্র বলিল—এ কথা স্বরূপ। ভগবান বলিয়া কেহ নাই, অথচ আমরা সকলে মিলিয়া ঐ ধাপ্পা দিয়া জগৎ সংসার চালাইতেছি। ঐ ধাপ্পায় এতকাল বেশ চলিয়াছে, কিন্তু আজ দেখিতেছি সমূহ বিপদ।

চন্দ্র বলিল—যাহার যখনি বিপদ হইয়াছে আমরা বলিয়া দিয়াছি, ভগবানের ইচ্ছা। লোকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়াছে।

বায়ু বলিল—আবার যখনি যাহার সম্পদ হইয়াছে, আমরা বলিয়া দিয়াছি, ভগবানের ইচ্ছা। লোকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কখনো ভগবানকে দেখিতে চাহে নাই।

ব্রহ্মা বলিল—আর চাহিলেও বলিয়াছি যে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন, এমনকি 'অপ্রাপ্য মনসা সহ'। লোকে ইহাকে উচ্চাঙ্গের ফিলজফি বলিয়া গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে।

বিষ্ণু বলিল—এমন ছেলেমানুষী আজ ধরা পড়িবার মুখে বলিয়া সন্ত্রস্ত না হইয়া এতদিন যে চালু ছিল তাহার জন্য নিজেদের অভিনন্দিত করা আবশ্যক।

তারপরে একটু থামিয়া বিষ্ণু বলিল—আচ্ছা, কাহাকেও ভগবান্ সাজাইয়া দেখাইয়া দিলে কেমন হয় ? কোন কথা বলিতে হইবে না, কেবল গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িলেই চলিবে ! —আচ্ছা মহাদেব, তুমি ভগবান্ সাজো না কেন ?

মহাদেব বলিল—ভাই, আমি তো আগেই বলিয়া দিয়াছি যে আমি ওর মধ্যে নাই। বাম্‌না বিষম রাগী—হঠাৎ যদি assault করিয়া বসে !

বিষ্ণু বলিল, তাহাতে তোমার প্রাণ যাইবে না, কিন্তু ধাপ্পা একেবারে ফাঁস হইয়া গেলে সকলেরই দেবত্ব যে যাইবে!

—যায় যাক্! বলিয়া মহাদেব শুইয়া পড়িল।

বিষ্ণু বলিল—তাহলে এক কাজ করো। বামুন টাকাকড়ি যা চায় দিয়া খুশী করিয়া ফিরিয়া পাঠাও, তবে সবদিক্ রক্ষা পায়।

ব্রহ্মা বলিল—বেটা যদি মোক্ষ চায়?

বিষ্ণু বলিল—ভায়া, তুমি কি পাগল হইয়াছ? মোক্ষ কামনায় কেহ কি ভর দুপুরবেলা অস্নাত অভুক্ত স্বর্গে আসিয়া উপস্থিত হয়! ও ভয় করিও না।

—আর তাছাড়া মোক্ষও তো আমাদেরই রচিত সুচতুর ধাপ্পা, যে পায় নাই তাহার কথা ও বিষয়ে গ্রাহ্য নয়, আর যে পাইয়াছে সে কখনো বলিতে আসে না! কি কৌশল! বাবা, বিশ্বচালনা কি সহজ? কত মাথা খাটাইতে হয়!

—কিন্তু আজকার সমস্যার সমাধান কি? বুড়ো বাম্‌নাকে ঠেকাবার কি উপায়?

এমন সময়ে গোবর্ধন সোজা উঠিয়া বসিল।

ব্রহ্মা শুধাল—আপনার ঘুম হইল?

গোবর্ধন বলিল—ঘুম হোক না হোক, জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তোমাদের ধাপ্পা সম্যক্ অবগত হইয়াছি। তোমরা কয়েকজনে মিলিয়া বেশ জোচ্চোরী কারবার খুলিয়াছ আর কি! ইহার কাছে কোথায় লাগে লিমিটেড কোম্পানীর ব্যবসা!

ব্রহ্মা বলিল—ঘুমের মধ্যে কি শুনিতে কি শুনিয়াছেন!

গোবর্ধন বলিল—বেশ তাই ভালো। আমি পৃথিবীতে গিয়া সব ফাঁস করিয়া দিতেছি।

বিষ্ণু বলিল—আপনি শুনিয়াছেন ঠিকই, তবে অর্থবোধ হয় নাই, আমরা পরিহাস করিতেছিলাম, দেখিতেছিলাম আপনি বুঝিতে পারেন কি না।

গোবর্ধন বলিল—আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি ভাবিয়াই মন খুলিয়া কথা বলিয়াছ, অথচ আমি আদৌ ঘুমাই নাই, কাজেই বোঝা যাইতেছে যে অন্যান্য গুণের মতোই অন্তর্যামী গুণটা একটা অলীক বস্তু! আজ পৃথিবীতে ফিরিয়া গিয়া তোমাদের তাসের কেল্লা ভাঙিবার ব্যবস্থা করিতেছি।

মহাদেব বলিল—নাও, আমি আগেই বলিয়াছিলাম, বাম্‌না সহজ পাত্র নয়।

বিষ্ণু বলিল—ঠাকুর, তুমি কি চাও বলো দেখি ?

গোবর্ধন বলিল—আমি যখন যা চাই দিতে পারবে ?

বিষ্ণু বলিল—ইহাকে যে Blackmail করা বলে !

ব্রাহ্মণ বলিল—আর তোমরা যে আদিকাল হইতে মানুষকে Blackmail করিয়া আসিতেছ, তাহার কি হয় ? 'ভগবান আছে' 'ভগবান আছে' বলিয়া কি কম ভোগা দিয়াছ ! আজ দেখিতেছি সব ফাঁকি। ইহার চেয়ে limited monarchyর রাজাও অনেক সত্য ! কাজেই Blackmail করিবার কথাটা নাই তুলিলে !

বিষ্ণু বলিল—তথাস্তু ! যখন যা চাহিবে তাহাই পাইবে।

ব্রাহ্মণ জমিদারের গোমস্তা ! সে বলিল—মাইরি, তোমাদের কথায় যে বিশ্বাস করে সে—

বিষ্ণু বলিল, থাক্, থাক, আর খুলিয়া বলিতে হইবে না, বুঝিতে পারিয়াছি। এখনই নগদ কিছু চাও, এইতো ? কি চাও ?

ব্রাহ্মণ সুদীর্ঘ এক ফর্দ ফেলিয়া দিল। দেবগণ চাঁদা তুলিয়া ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূরণ করিল।

গোবর্ধন হাতীঘোড়া, সোনারূপা ও অতুল ঐশ্বর্য লইয়া মর্তে ফিরিয়া আসিল।

তারপরে তাহার যখনই যাহা প্রয়োজন হইত, চাহিত। দেবগণ ইতস্তত: করিলে গোবর্ধন সমস্ত ফাঁস করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া দেবতাদের Blackmail করিত। দেবগণ অগত্যা তাহার প্রার্থনা পূরণ করিতে বাধ্য হইত।

কোন কোন ছোকরা-দেবতা আপত্তি করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি ঝানু দেবতাগণ তাহাদের বুঝাইত, বাপু, ইহাতে আপত্তি করিলে চলিবে কেন ? আমরা যে-ভাবে মানুষকে Blackmail করিয়া আসিতেছি, তাহার তুলনায় বামুনের দাবী তো অকিঞ্চিৎকর। বিশেষ তাহার দাবীতে অসম্মত হইলে তোমাদের দেবত্ব থাকিবে কোথায় ? তখন যে না খাইয়া মরিবে ? খাটিয়া খাইবে তাহার উপায় নাই, কেন না তোমরা Trade Union-এর মেম্বার নও, এমন কি কেহ তোমাদের দিন-মজুর রূপেও রাখিবে না, কেন না তোমরা যে বুর্জোয়া একথা সুপরিজ্ঞাত। অতএব বৎসগণ, বেশি ট্যাফোঁ করিও না, ব্রাহ্মণ যখন যাহা চায় দিয়া যাও, তাহাতে দেবত্ব ও রাজত্ব দুই-ই থাকিবে, নতুবা—

চ্যাংড়া দেবতাগণ বলিত, বুঝিয়াছি, আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

জেনুইন লুনাটিক্

যুদ্ধান্তে ভানুপ্রকাশ বেকার হইয়া রোজগারের পন্থা খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু দু'চার দিন পরেই বুঝিতে পারিল কাজটি সহজ নয়। যুদ্ধকালে সে মানুষ-মারা শিখিয়াছিল, মানুষ মারিতে উৎসাহ পাইয়াছিল—এখন নাগরিক জীবনে সে পন্থা অনুসরণ করিতে গিয়া দেখিল আইন অলঙ্ঘ্য বাধা—এবং সেই পথের শেষ সীমায় দুরারোহ ফাঁসিকাষ্ঠ দণ্ডায়মান। তখন সে কিছুকাল পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল।

কিছুদিন পরে অপ্রত্যাশিতরূপে ভাগ্য তাহার প্রতি সদয় হইল। সে শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল—এমন সময়ে ঠিক তাহার সম্মুখেই এক ভদ্রলোক অনবধানবশতঃ একখানি দ্রুতগামী মোটরের সম্মুখে গিয়া পড়িল—আর একটু হইলেই চাপা পড়িত! ভানুপ্রকাশ নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ভদ্রলোকটিকে টানিয়া সরাইয়া দিল। ভদ্রলোকটি বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া রক্ষাকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল—তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিল, কিছুতেই ছাড়িল না।

ভদ্রলোকটি শুধাইল—আপনার কি করতে পারি? আপনি তো আমাকে প্রাণে বাঁচালেন!

ভানুপ্রকাশ বাড়ীর দরজায় ভদ্রলোকের নাম, ডাক্তারি ডিগ্রি ও বিবরণ দেখিয়া বুঝিয়াছিল—ভদ্রলোকটি একজন উচ্চ উপাধিধারী পাগলের ডাক্তার।

ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া তাহার মস্তিষ্কে প্রতিভার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে বলিল—আমার উপকার যদি করতে চান—তবে আমাকে একখানি পাগলামির সার্টিফিকেট দিন।

ডাক্তার বলিলেন—সে কি! আপনি তো দিব্য সুস্থ!

ভানুপ্রকাশ বলিল—এখন সুস্থ বটে! কিন্তু মাঝে মাঝে অনেক দিনের জন্য মাথা খারাপ হয়ে যায়—তখন আমি বদ্ধ উন্মাদ।

তারপরে বলিল—আপনার সার্টিফিকেট পেলে আমার পক্ষে কোন

পাগলাগারদে গিয়ে ভর্তি হওয়া সহজ হবে। পয়সা খরচ ক'রে সার্টিফিকেট নেওয়ার সাধ্য আমার নেই।

ডাক্তার তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া সার্টিফিকেট লিখিতে বসিলেন। ভানুপ্রকাশ বলিল—আপনি লিখে দেবেন, পাগল অবস্থায় আমি violent হ'য়ে উঠি, অন্য সময় আমি বেশ non-violent!

ডাক্তার তাহার বর্ণনা অনুসারে সে যে একজন 'জেনুইন লুনাটিক্' এবং 'ভায়োলেন্ট লুনাটিক্'—এইরূপ সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন। ভানুপ্রকাশ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পরিচয়পত্রখানি পকেটে লইয়া প্রস্থান করিল।

ভানুপ্রকাশ কিছুকাল পথচারণা করিয়া বুঝিয়াছে যে, সংসারে ধনীর স্থান আছে, মানীর স্থান আছে, দরিদ্রের স্থান আছে, উন্মাদের স্থান আছে, কিন্তু সাধারণের স্থান নাই। ভানুপ্রকাশ নিতান্তই সাধারণ—এমন কি তাহার দারিদ্র্যও অসাধারণ নয়। এখন সে পাগলের ছাড়পত্র পাইয়াছে, এবার সংসারের পথ অনেকটা সুগম হইবে বলিয়া তাহার মনে হইল। ছাড়পত্রের বলে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার পূর্বে সে একটি শৌখিন ভোজনাগারে গিয়া বসিল। অনেকদিন পরে সে পেট ভরিয়া সুখাদ্য খাইল। আহারান্তে খানসামা বিল আনিলে বিলখানি হাতে লইয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল, আর লবণদানি হইতে খানিকটা লবণ মুখে দিয়া চিবাইতে শুরু করিল।

খানসামা বিস্মিত হইল, ব্যাপার কি?

ভানুপ্রকাশ খানসামার দিকে অধিকতর বিস্ময়ে তাকাইয়া বলিল, খানিকটা sauce নিয়ে এসো।

বিল খাইবার এমন উপকরণের প্রস্তাবনা খানসামাটি ইতিপূর্বে আর শোনে নাই। সে ছুটিয়া ম্যানেজারের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, একঠো পাগলা আদমি আয়া হ্যায়।

এবারে খানসামা সমভিব্যাহারে ম্যানেজার আসিয়া উপস্থিত হইল। ভানুপ্রকাশ তখন চর্বিত বিলটিকে মাটিতে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের দেখিয়া চর্বিতচর্বণ শুরু করিল। বেগতিক দেখিলে অনেকেই উক্ত কাজটি করিয়া থাকে।

ভানুপ্রকাশ ইংরাজি ভাষায় ম্যানেজারকে বলিল, তোমাদের শেষের খাদ্যটি তেমন রুচিকর নয়, আমি বড়ই অসন্তুষ্ট হয়েছি।

ম্যানেজার বলিল—ওটা বিল।

ভানুপ্রকাশ বলিল, যে নামই দাও না কেন, ভোজনাগারে ভোজ্য ছাড়া আর কি পাওয়া যায় ?

ইতিমধ্যে সে কৌশলে পকেট হইতে ডাক্তারের সার্টিফিকেটখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া ম্যানেজারকে সেখানা তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিল।

ম্যানেজার কাগজখানা তুলিয়া তাহার হাতে দিবার অবকাশের মধ্যে এক নজর সেখানা পড়িয়া লইল।

সর্বনাশ! ভায়োলেণ্ট লুনাটিক্!

ম্যানেজার সবিনয়ে জানাইল, আপনি যেতে পারেন. মূল্য দিতে হবে না।

ভানুপ্রকাশ উঠিয়া ম্যানেজারকে একটা নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ম্যানেজার ভাবিল, খুব প্রাণে বেঁচে গেলাম! কারণ চোর, বদমাশ, চোরা-কারবারী, হঠাৎ-ধনী, হঠাৎ-গরীব নানারকম লোকের হাতে নিত্যই সে পড়িয়া থাকে কিন্তু ইতিপূর্বে আর কখনো ভায়োলেণ্ট লুনাটিকের হাতে সে পড়ে নাই!

ভানুপ্রকাশ বাহিরে আসিয়া একটু নির্জন স্থান সন্ধান করিতে লাগিল।

আমরা বলিব ভানুপ্রকাশের নমস্কার করা উচিত হয় নাই—ওটা লুনাটিকের লক্ষণ নয়। যাহাই হউক কালক্রমে সব সংশোধন হইয়া যাইবে —ইহা তাহার শিক্ষানবিশীর প্রথম ধাপ বই তো নয়।

ভানুপ্রকাশ কিন্তু অন্য কথা ভাবিতেছিল। সে ভাবিতেছিল যে কেবল প্রথম রাউণ্ডে সে বিজয়ী হইয়াছে, চরম বিজয়ের এখনো অনেক বাকি। জীবন-সংগ্রামের পরিকল্পনা প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে সে কার্জন পার্কের একান্তে গিয়া বসিল।

ভানুপ্রকাশ দু'চার দিনেই বুঝিতে পারিল যে, একটা আস্ত প্রকৃতিস্থ মানুষের পক্ষে জেনুইন লুনাটিকের নিখুঁত অভিনয় করা সহজ ব্যাপার নয়, এমন কি বড় ডাক্তারের সার্টিফিকেট থাকিলেও নয়। অনেক জায়গাতেই পাগলের অভিনয় করিতে গিয়া সে সন্দেহ উদ্রেক করিয়া দিয়াছে। সংসারে পাগল দুই শ্রেণীর। বদ্ধোন্মাদ আর মুক্তোন্মাদ। যাহাদের পাগলা-গারদে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় তাহাদের বদ্ধোন্মাদ বলে; তাহাদের সংখ্যা কম। আর যে-সব পাগল সাধারণ মানুষের মতো পথে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ায়

তাহারা মুক্তোন্মাদ। তাহাদের জন্য পাগলা-গারদ নাই—খুব সম্ভব এত বড় পাগলা-গারদ তৈরি করা সম্ভব নয়। এখন ভানুপ্রকাশ বুঝিতে পারিল যে তাহাকে মুক্তোন্মাদ শ্রেণীতে পড়িলে চলিবে না, তাহাতে সমস্যার সমাধান হইবে না; বদ্ধোন্মাদ শ্রেণীতে ভর্তি হইতে হইবে, তবেই তাহার সমস্যা সমাধান হইবার সম্ভাবনা।

তখন ভানুপ্রকাশ বুঝিল যে তাহাকে বদ্ধোন্মাদের আচার-ব্যবহার শিখিতে হইবে। কিন্তু তাহার উপায় কি? অবশ্য বই পড়িয়া শেখা যায় কিন্তু প্রকৃত উপায় হইতেছে সরেজমিনে অর্থাৎ খাঁটি বদ্ধোন্মাদের নিকট হইতে পাঠ লওয়া। ভানুপ্রকাশ স্থির করিল তাহাই করিবে এবং সেই উদ্দেশ্যে বদ্ধোন্মাদগণের দিব্যধাম রাঁচির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

গাড়ীতে উঠিয়া সে এক বিপদে পড়িল। সকলেই জানেন যে এক শ্রেণীর কর্মচারী আছে যাহারা যাত্রীদের টিকিট দেখিতে চায়। যাত্রীদের হয়রানি করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। সেই রকম এক কর্মচারী আসিয়া ভানুর টিকিট দেখিতে চাহিল। বলাবাহুল্য ভানুপ্রকাশের টিকিট ছিল না, টিকিটই যদি কিনিবে তবে আর সে বদ্ধোন্মাদ কেন, তবে মুক্তোন্মাদের সঙ্গে তাহার প্রভেদটা কি? ভানু টিকিটের পরিবর্তে ডাক্তারী সার্টিফিকেটখানি বাহির করিয়া দিল। টিকিট চেকার সেখানা ভালো করিয়া দেখিয়া বলিল, টিকিট কোথায়? ভানু পকেট খুঁজিয়া একখানা পুরাতন ডাকটিকিট বাহির করিয়া দিল।

চেকার বলিল—ওসব চালাকি রাখুন, টিকিট দিন, নতুবা হাজতে চলুন।

ভানু বলিল—তাই তো যাচ্ছি!

চেকার শুধাইল—কোথায়?

ভানু বলিল—রাঁচিতে।

—কেন?

—কেন কি? দেখছেন না আমি উন্মাদ।

—কোন লক্ষণ তো দেখছি না।

ভানু বুঝিল তাহার কথাবার্তা অত্যন্ত বেশি মুক্তোন্মাদের মত হইতেছে, এমন আর কিছুক্ষণ চলিলে তাহার কেস্ নষ্ট হইয়া যাইবে। তাই সে বলিল—লক্ষণ দেখাচ্ছি!

এই বলিয়া সে মাথা নীচু দিকে দিয়া পা দু'খানা উঁচুতে সোজা করিয়া খাড়া করিল। সে শুনিয়াছিল প্রকৃত পাগলেরা মাঝে মাঝে এমন করিয়া থাকে। কিন্তু অনভ্যাসবশতঃ পা দু'খানা সোজা খাড়া না হইয়া কিঞ্চিৎ বাঁকিয়া গেল।

তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া অন্য যাত্রীরা বলিয়া উঠিল—লোকটা পাগল না কি?

এমন আশার কথা ভানুর কানে আর কথনো প্রবেশ করে নাই—সে চেকারের উদ্দেশ্যে বলিল—শুনছেন তো? লোকে কি বলছে? জনগণের সিদ্ধান্তই এ যুগের বেদবাক্য—অতএব আপনি সরে পড়ুন।

অভাবিত হাঙ্গামায় পড়িতে হয় দেখিয়া চেকার সরিয়া পড়িল। ভানুপ্রকাশ আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে যাত্রীরা বুঝিল লোকটা পাগল। তাহারা সরিয়া গেল। অনেকটা জায়গা পাইয়া ভানুপ্রকাশ টান হইয়া শুইয়া পড়িল, এবং পাগলরা যে ঘুমায় না সে কথা ভুলিয়া গিয়া অল্পক্ষণেই ঘুমাইয়া পড়িল।

তারপরে সে যথাসময়ে ও যথাশাস্ত্র রাঁচিতে পৌঁছিল। পথে আর কোন বিঘ্ন ঘটে নাই।

রাঁচিতে উপস্থিত হইয়া দর্শকরূপে সে পাগলা গারদ দেখিতে গেল। সে দেখিল সারি সারি বদ্ধ ঘরে বদ্ধোন্মাদের দল বিরাজ করিতেছে। হঠাৎ দেখিলে মুক্তোন্মাদের সঙ্গে তাহাদের কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। ভানু আরও দেখিল যে নিয়মিত সময়ে পাগলেরা প্রচুর আহার্য পাইতেছে। সে ভাবিল—আহা, ইহারা দিব্য আরামে আছে। তাহার মনে হইল—আচ্ছা, সুখ যদি থাকে তবে এখনো এইখানে আছে—এই বদ্ধোন্মাদ-ধামে। সে স্থির করিল—যেমন করিয়াই হোক এখানে ভর্তি হইতে হইবে। পৃথিবীতে নদনদী যেমন সমুদ্রে মিশিয়া অবসিত হয়, তেমনি সংসারের সব সমস্যার সমাধান এই পাগলা-গারদে।

তারপরে সে একটা পাগলকে বলিল—এই, বাইরে আসবি?

সে বলিল—দরজা খুলে দে না।

ভানু তাহার দরজা খুলিয়া দিতেই লোকটা বেগে প্রস্থান করিল, আর ভানু ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইল।

যথাসময়ে পাচক তাহার খাদ্য দিয়া গেল, ডাক্তার ঔষধ দিয়া গেল। ভানু খাদ্য খাইল, ঔষধটা ফেলিয়া দিল এবং তারপরে নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া পড়িল। আহা, ভানু এখন সাংসারিক চিন্তার মোক্ষধামে উপনীত।

মাঝে মাঝে তাহার দরজার সম্মুখে দর্শক আসে, ভানু বলে, আপনারা ভাবছেন আমি পাগল, মোটেই তা নয়! এখানে দিব্য আরামে আছি, আপনারাও আসুন না!

কোন দর্শক বলে, লোকটা আস্ত পাগল।

কোন দর্শক বলে, পাগলে নিজেকে কখনো পাগল বলে না।

কোন দর্শক শুধায়, তোমার নাম কি?

—ভানুপ্রকাশ।

দর্শক বলে—ঐ দেখুন! দরজায় লেখা আছে রামতারণ!

রামতারণ লেখাই আছে বটে—আগে যে ছিল তাহার নাম।

ভানু ক্রমে বুঝিতে পারিল পাগলের খাঁচাও নিরঙ্কুশ সুখকর নয়, কেননা এখানে চা পাওয়া যায় না, এবং সিগারেট পাওয়া যায় না, এবং সর্বোপরি খবরের কাগজ পাওয়া যায় না। ভানু ভাবিল, হায়, স্বর্গেও দুঃখ আছে। কেবল অনভিজ্ঞ মানুষ দূর হইতেই স্বর্গকে নিরবচ্ছিন্ন সুখের স্থান বলিয়া ভ্রম করে!

ভানু স্থির করিল, এই দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটাইতে হইবে। এবং সেই উদ্দেশ্যে একদিন রাত্রে পাগলা-গারদের প্রহরীরা যখন কর্তব্য পালন উপলক্ষে নিদ্রিত, তখন সে সমস্ত পাগলকে সমবেত করিয়া এক সভার আয়োজন করিল।

আপনারা নিশ্চয় ভাবিতেছেন যে, এমন কখনো ঘটিতে পারে না। আমিও জানি ঘটিতে পারে না, বাস্তবে এমন অবস্থা ঘটে না, কিন্তু গল্পে হামেশাই ঘটিয়া থাকে, নতুবা গল্প-লেখা কঠিন হইয়া পড়ে।

ভানু বদ্ধোন্মাদগণের সভায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া সম্বোধন করিল—ভাইসব, (অবশ্য দু'চারজন ভগ্নীও ছিল, তাহাদের আর স্বতন্ত্র সম্বোধন করিল না, তাহারাও আপত্তি করিল না, মুক্তোন্মাদ হইলে নিশ্চয়ই আপত্তি করিত)।

ভানু সকলকে অসুবিধার কথা জানাইল। এবং বলিল—ইহার প্রতিকার আবশ্যক। অধিকাংশ পাগলই বলিল, তাই বলিয়া মুক্তি চাই না এবং বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাই না।

ভানু বলিল—বাড়ী ফিরিবার কথা আমিও বলি না। কেবল এমন অবস্থার উদ্ভব করতে হবে যাতে গারদের সুখ আর মুক্তির আনন্দ এক সঙ্গে পাওয়া সম্ভব হয়। সে বলিল—ইংরাজিতে যাকে বলে best of both the worlds—সেই প্রকার ব্যবস্থা করা দরকার।

সবাই শুধাইল—কি প্রকারে সম্ভব?

ভানু বলিল—চলুন, গারদের প্রহরী ও অফিসারগণ এখন নিদ্রিত। আমরা বাহির হয়ে তাদের ধরে আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দিই। আর আমরা তাদের পোশাক পরে তাদের স্থান অধিকার করি। তাহলেই পাগলা-গারদের বিরাম ও বাহিরের জগতের আরাম একত্রে পাওয়া যাবে।

সকলে তাহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া 'ভানুপ্রকাশ জিন্দাবাদ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ভানু সবিনয়ে বলিল—অন্য ধ্বনি করুন, বলুন 'বদ্ধোন্মাদ জিন্দাবাদ'।

সকলেই সেই ধ্বনি করিল। এবং সবেগে বাহির হইয়া পড়িয়া নিদ্রিত প্রহরী, অফিসার, কেরানী, ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি সকলকে এক-একটি পাগলের ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া নিজেরা তাহাদের পোশাক পরিয়া ঘরগুলির দরজা বন্ধ করিয়া দিল। অতি অনায়াসে এই ব্যাপারটি ঘটিল। (পাঠকদের আবার স্মরণ করাইয়া দিই, ঘটনা যতই কঠিন হোক না কেন লেখক ইচ্ছা করিলে এমনি অনায়াসেই তাহা ঘটিয়া থাকে।)

কার্য সমাপ্ত হইলে ভানুপ্রকাশ চীৎকার করিয়া উঠিল—'Lunatics of the world unite!' সকলে সানন্দে সেই ধ্বনি করিল।

এহেন বিপর্যয় ও বিপ্লব কাটিয়া যাওয়া সত্ত্বেও পরদিন যথারীতি প্রভাত হইল এবং পাগলা-গারদের কাজ যথারীতি পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। কেহ কোন প্রভেদ লক্ষ্য করিল না।

পাগলের ঘরের নূতন বাসিন্দারা নিজেদের পাগলা-গারদে বন্ধ দেখিয়া ভাবিল—সত্যই তাহারা পাগল, নতুবা এখানে তাহাদের ভরিবে কেন? কাজেই তাহারা পাগলের মতো আচরণ করিতে লাগিল। তাহারা চেঁচায়, গান করে, ঝগড়া করে, মারামারি করে—আর দর্শক আসিলে বলে যে তাহারা পাগল নয়, পাগল ঐ বাহিরের কর্মচারীর দল।

আবার পাগলা-গারদের নতুন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ভূতপূর্ব পাগলের দল

স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে পড়িয়া স্বভাবের অনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল—অর্থাৎ তাহারাও চেঁচায়, গান করে, ঝগড়া করে, মারামারি করে আর দর্শক আসিলে বলে যে তাহারা পাগল নয়, পাগল ঐ ভিতরের খাঁচার লোকগুলা।

ইহা ছাড়া আর কি-ই বা বলিবার থাকিতে পারে!

দর্শকেরা বুদ্ধিমান। তাহারা খাঁচার ভিতরের কথা শুনিয়া হাসে, বলে, আহা!

আর বাহিরের কথা শুনিয়া গম্ভীর হয়, বলে, তা জানি!

ভানুপ্রকাশ এখন পাগলা-গারদের সর্বময় কর্তা, সুখের চরমে সে উপনীত। তবে কি না মানুষের ভাগ্য চক্রবৎ আবর্তিত হয়, আবার যদি সঙ্কটের দিন আসে তাই সে এবার গোপনে গোপনে জেনুইন লুনাটিকের লক্ষণগুলি আয়ত্ত করিবার অভ্যাস করিয়া থাকে। সম্মুখে এতগুলি দৃষ্টান্ত থাকাতে তাহার খুব সুবিধা হইয়াছে।

এখানেই আমার গল্পের শেষ। কিন্তু গল্পের মরাল বা নীতিকথাটি এখনো বাকি আছে। সেই নীতিটি হইতেছে যে, দুনিয়ায় সকলেই পাগল। কিন্তু পাগলামি নানা ধরনের বলিয়া এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীকে পাগল বলে। নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলিবে—বাপু হে! তোমাদের সকলেরই এক অবস্থা। ঘটনাচক্রে যদি এক-আধটা প্রকৃতিস্থ লোক সত্যই জন্মগ্রহণ করে—তবে তাহাদের সমূহ বিপদ! এই বিপদ কাটাইবার একমাত্র উপায়ঃ হয় তাহাদিগকে পাগল বনিতে হইবে, নতুবা পাগলের ভান করিতে হইবে। এ দুয়ের একটাও না করিতে পারিলে দুনিয়ার পাগলেরা মিলিয়া তাহাকে হয় মারিয়া ফেলিবে, নয় পাগলা-গারদে পুরিয়া রাখিবে। সংসারে পাগলা-গারদের স্থান সঙ্কীর্ণ, কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে খাঁটি প্রকৃতিস্থ লোকের সংখ্যা একেবারেই অল্প। আমি তো জীবনে ঐ একটিমাত্র লোককে দেখিয়াছি—সে এই কাহিনীটির নায়ক ভানুপ্রকাশ।*

* কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের সৌজন্যে

ভগবান কি বাঙালী?

পাঠক, আমি একজন বাঙালী। আমার পিতা বাঙালী, পিতামহ বাঙালী, আমার চৌদ্দপুরুষ বাঙালী। আমি আপাদমস্তক বাঙালী, মাথায় বহরে বাঙালী, একেবারে নিরেট বাঙালী—অর্থাৎ আমি ষোল আনা বাঙালী। নিন্দুকেরা বলিয়া থাকে ষোল আনা বাঙালী পনরো আনা বর্বর।

পাঠক, মাঝে মাঝে আমার বাঙালী রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে, দেহের শিরা উপশিরায় বাঙালী রক্ত যখন আশ্বিনের ক্ষেপা কুকুরের মত উত্তাল হইয়া উঠে, তখন আর নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিতে পারি না, চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠি, পার্শ্ববর্তী কেরানীটি শুধায়, কি হ'ল আপনার গৌড়চন্দ্র বাবু! কি হইল কেমন করিয়া বুঝাই? আমার শোণিত-সমুদ্রে যে তখন বিজয় সিংহের সিংহলযাত্রী নৌবহর ছুটিয়াছে—আমি কেমন করিয়া আফিসের লেজারের হিসাব মিলাইব?

একদিন আমার হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়-স্বজন আমাকে ডাক্তারের কাছে ধরিয়া লইয়া গেল। বিজ্ঞ ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিল—ব্লাড প্রেশার। ব্লাড প্রেশারই বটে, তবে সাধারণ প্রেশার নয়। বাঙালীর আবহমান কালের রক্তধারা তখন আমার মস্তিকে চাপিয়াছে, আমি উতলা না হইয়া করি কি?

আজ যখন শুনিতে পাই যে আসামী, বিহারী, মাদ্রাজী, মুসলমান, ওড়িয়া বাঙালীকে মারিতেছে, তখন আমার অভিমন্যুর কথা মনে পড়ে। অভিমন্যু সপ্তরথীর মার খাইয়াছিল, তাই বলিয়া কি সে বীর ছিল না? অবশ্য মার খাইয়া আমি ফিরিয়া মারি না, "রক্ত চাই" বক্তৃতা করি এবং বাঙালী জীবনের শেষ ভরসা সংবাদপত্রে তাহার প্রতিবাদ করি।

পাঠক, যদি শুধাও যে সবাই বাঙালীকে কেন মারিতেছে। এক কথায় তাহার উত্তর দিতে পারি, ঈর্ষা! বাঙালী যে বড়, বাঙালী যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, তাই সকলের চোখ টাটায়, তাই তাহারা মারে। বাঙালী বড় চাকুরী করে, তাই সকলের চোখ টাটায়। অন্য প্রদেশের মূর্খরা বুঝিতে পারে না যে

বড় চাকুরী করিবার সনদ লইয়াই বিধাতার নিকট হইতে বাঙালী আসিয়াছে। যে প্রদেশে যত মোটা মাহিনার চাকুরী আছে, সবগুলিতে বাঙালীর জন্মগত অধিকার। বিহারে, আসামে, উড়িষ্যায়, মাদ্রাজে, বোম্বাইতে, পাঞ্জাবে যেখানে যত মোটা চাকুরী সব আমি করিব, আমার ভাই করিবে, আমার ভাইপো করিবে, আমার ভাগ্নে করিবে, আমার শালা, সম্বন্ধী, তাঐ, শ্বশুর, তাহার শ্বশুর করিবে। সেই প্রদেশের লোকে সামান্যমাত্র আপত্তি করিলে তাহারা দেশদ্রোহী, বঙ্গদ্রোহী। পৃথিবীর বড় বড় চাকরীগুলিতে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে শীঘ্রই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দরবারে আমরা একটি ডেপুটেশন পাঠাইব। অবশ্য সব চাকরী আমরা চাহি এমন স্বার্থপর নই, চৌকীদারী, দফাদারী, কেরানীগিরি অন্য প্রদেশের লোকদের ছাড়িয়া দিতে রাজী আছি। বাঙালী আর যাই হোক, স্বার্থপর নয়। হইবেই বা কেমন করিয়া ? "Service is our birthright" এমন উদার-বাণী গৌতম বুদ্ধের পরে জগতে আর ধ্বনিত হইয়াছে কি ?

বাঙালী যে বড়, বড় চাকুরী তাহার প্রথম প্রমাণ। আরও প্রমাণ আছে। পাঠক, তুমি কি জানো যে জগতে যেখানে যত মহাপুরুষ হইয়াছেন সবাই বাঙালী ছিলেন। বাঙালী রক্ত ছাড়া মহাপুরুষ সম্ভবে না। এক ফোঁটা বাঙালী রক্তে তিনকোটি বিলিয়ন মহত্ত্বের বীজাণু কিলবিল করিতেছে। বাঙালীর ইতিহাস যখন বাঙালীর কলমে লিখিত হইবে—তখন সমস্ত রহস্য আমূল প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ততদিন যদি সবুর করিতে না পারো, সামান্য কিছু আভাস দিতে পারি। বুদ্ধ, যীশু, আলেকজাণ্ডার, আমেন হোটেপ, নেবু-কাডনেজার, টুটেন খামেন, কনফিউসিয়াস, শঙ্করাচার্য, কালিদাস, কোমাগাটা মারু, মাউন্ট ভিসুভিয়াস, টাইটানিক, ক্রমওয়েল, সিজার, নেপোলিয়ান, ইকোয়েটার, ল্যাটিচুড, জুপিটার, জেনারেল রোমেল, হিটলার, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, Radar, হনুলুলু এবং লেখক স্বয়ং গৌড়চন্দ্র সবাই বাঙালী। নামের তালিকা বাড়াইয়া লাভ নাই—কোন মহাপুরুষের নাম মনে পড়িলেই ধরিয়া লইবে সে বাঙালী। প্রমাণ ? ওইতো, তোমার মনে নিশ্চয় কোন অবাঙালী মন উঁকিঝুঁকি মারিতেছে নতুবা বাঙালীর গৌরব নির্ধারণের সময়ে প্রমাণের অপেক্ষা করিবে কেন ? বরঞ্চ সিদ্ধান্ত আগে স্থির করিয়া আমার কাছে পাঠাইয়া দিও, আমি প্রয়োজনমতো প্রমাণ আবিষ্কার করিব।

বাঙালীর মহত্ত্বের আরও প্রমাণ আছে। মানুষের ইতিহাস তাহারই কীর্তির ইতিহাস। বাঙালীর ভয়েই আলেকজাণ্ডারকে পাঞ্জাব হইতে ফিরিতে হইয়াছিল। তুমি ভাবিতেছ এ আবার কি? এইমাত্র বলিয়াছি, আলেকজাণ্ডার বাঙালী ছিলেন—তবে আবার তিনি ফিরিবেন কেন? ফিরিবেন না কেন? বাঙালী বলিয়াই তিনি বাঙালীর বীরত্ব জানিতেন। কেমন খুশী হইলে তো? প্রমাণের চাহিদা মিটিল তো? এরূপ প্রমাণ আমি ঝুড়ি ঝুড়ি দিতে পারি। আরও চাও? বাঙালী বিজয়সিংহ সিংহল জয় করিয়াছিল। বাঙালী সিজার বৃটেন জয় করিয়াছিল। (ছুয়ো ইংরাজ!) বাঙালী নেপোলিয়ান ইউরোপ জয় করিয়াছিল। বাঙালী মাউণ্ট এভারেষ্ট পৃথিবীর উচ্চতম ব্যক্তি। আরও দৃষ্টান্ত চাও? পাণ্ডবগণ বাঙালীর ভয়েই এদেশে আসে নাই। গৌতম বুদ্ধ পার্শ্ববর্তী মগধে ঘোরাফেরা করিয়াছে। এদেশে পদার্পণ করিতে সাহস করে নাই। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর এদেশে আসিলে আদর্শবাদী বাঙালীরা তাহার প্রতি কুকুর লেলাইয়া দিয়াছিল। আর এই গৌরবের পুস্তকে উচ্চতম পৃষ্ঠাখানি সম্প্রতি যুক্ত হইয়াছে। বাঙালী গান্ধীর মস্তকে লাঠি মারিয়াছে। তাহার গায়ে ঢিল ছুঁড়িয়াছে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র আমার হৃদয় বেলুনের মত ফুলিয়া উঠিয়া আমি গৌরবের আকাশে আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছি। একি কম গর্ব, কম উল্লাসের কথা? যাহা নোয়াখালির গোঁয়ার মুসলমানে পারে নাই, অসভ্য ইংরেজ পারে নাই, বাঙালীর ছেলে সেই কাজ করিয়াছে। পাঁচশত যুবকে মিলিয়া একক বৃদ্ধকে লাঠির আঘাত করিয়াছে, আগে ঘরের বাতি নিভাইয়া দিয়া, টেলিফোনের তার কাটিয়া দিয়া তারপরে আঘাত করিয়াছে। উঃ, কি অপূর্ব রণকৌশল। ইহাতেও কি প্রমাণ হয় না যে নেপোলিয়ান ও রোমেল বাঙালী ছিল।

আক্রমণকারীগণ পূর্বাহ্ণে মদ পান করিয়া লইয়াছিল, প্রত্যেকে নগদ পঞ্চাশ টাকা পাইয়াছিল এবং গান্ধীকে স্থানচ্যুত বা পৃথিবীচ্যুত করিতে পারিলে প্রত্যেকে একখণ্ড জমি ও নারী পাইবে আশ্বাস লাভ করিয়াছিল। ইহাই তো যুদ্ধের চিরাচরিত রীতিনীতি। কোন্ সৈনিক মদ্য পান না করিয়া যুদ্ধে নামে? কোন্ সৈনিক বেতন না লইয়া অগ্রসর হয়? আর প্রত্যাবর্তনের পরে পুরস্কারের আশা না করিয়া থাকে কে? গান্ধী একক বলিয়া নগণ্য নয়। যে গান্ধী বৃটিশ সাম্রাজ্যকে পরাভূত করিয়াছে, বাঙালী সেই গান্ধীর মাথায় লাঠি

মারিয়াছে, অতএব বাঙালী বৃটিশ সাম্রাজ্যকে পরাভূত করিয়াছে! কেমন, ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ঠিক বলিয়াছি কিনা ?

পাঠক, তুমি শুধাইতে পারো বর্তমানে আমি কি করিতেছি। আমি একটি কঠিন, কঠিনতম গবেষণায় যুক্ত আছি। এই গবেষণায় সিদ্ধিলাভ করিলে বাঙালীর মহিমা, আর ভগবানের মহিমা সমার্থক হইয়া দাঁড়াইবে। আমি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছি যে স্বয়ং ভগবান বা ঈশ্বর বা God বাঙালী। অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি। পুস্তকখানি সমাপ্ত হইলে সাতচল্লিশ হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইবে। ইহাতে পাঁচ হাজার প্লেট, দশ হাজার নক্সা, পঞ্চাশ হাজার diagram প্রভৃতি থাকিবে। অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি ইতিমধ্যেই বলিতে শুরু করিয়াছে যে এতবড় নিরেট পুস্তক পৃথিবীতে লিখিত হয় নাই, কিম্বা আর লিখিত হইবারও সম্ভাবনা নাই। কারণ ভগবান বাঙালী বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেলে আর কি বলিবার বা ভাবিবার থাকিবে ?

এই নিরেট গবেষণার আর কিছু কিঞ্চিৎ আভাস তোমাকে দিব।

ভগবানের স্বভাব চরিত্র আচার ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্রাদি হইতে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি যে বাঙালী অর্থাৎ জাতিকে যে তাঁহার নিজের প্রকৃতি অনুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না।

(১) পাঠক, প্রথমেই দেখো, ভগবান অদৃশ্য, কিন্তু কোন কোন লোককে তিনি নাকি দেখা দিয়া থাকেন, বাঙালীর কি ইহাই স্বভাব নয় ?

অন্তঃপুর-আশ্রয়ী বাঙালী সাধারণের চোখে অদৃশ্যপ্রায় কিন্তু কোন কোন লোক অর্থাৎ নিজের দেন্দারের নিকটে সে অত্যন্ত দৃশ্য এবং অত্যন্ত স্পষ্টভাষী।

(২) দ্বিতীয় প্রমাণ ভগবান শক্তের ভক্ত, কিন্তু ভক্তকে বেঘোরে ফেলিয়া পলায়ন করেন। রাবণ ও নৃসিংহকশিপুকে, তিন জন্মেই তিনি উদ্ধার করিয়াছেন অথচ যীশু, সক্রেটিস প্রভৃতি তাঁহার নাম-করা প্রচারকগণ মরিলেও তিনি অঙ্গুলিটিও উত্তোলন করেন নাই।

বাঙালীদেরও কি ইহাই স্বভাবগত নয়? বাঙালী শক্তের ভক্ত নরমের যম। প্রমাণ? প্রমাণ, তুমি আমি সকলেই। যে আসিয়া প্রণাম করে, তাহাকে খড়ম পেটা করি, আর যে লোককে শক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহার খড়ম মাথায় ধরি।

(৩) ভগবান স্তাবকতা প্রিয়। এ পর্যন্ত গীতা, বাইবেল, বেদ প্রভৃতি যে-সব ধর্মগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহার পনরো আনাই নিছক এবং নির্লজ্জ খোশামুদি। ভগবান তাহাতেই মুগ্ধ।

স্তুতি না করিলে কোন বাঙালী চোখ মেলিয়াও চাহে না।

(৪) ভগবান সর্বশক্তিমান, অথচ কাজের বেলায় দেখি তোমার পাঁচটাকা মাহিনা বৃদ্ধি করিতেও অক্ষম।

এ বিষয়ে বাঙালী ভগবানের অনুকরণস্থল। বাঙালী ইচ্ছা করিলে সাগর শুষিতে পারে, গিরি লঙ্ঘিতে পারে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিপ্লব সাধন করিতে পারে কিন্তু সাগরের পরিবর্তে তাহারা পুঁইডাটা ও কলের জল গেলে, রাস্তার এপার হইতে ওপারে যাইতেও চাহে না—আর বিপ্লব সাধন সে কেবল কাগজে কলমেই করে।

(৫) ভগবান পরম কারুণিক। করুণায় বাঙালীই বা কি কম ? সে তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রী এবং শ্যালক শ্যালিকাগণের প্রতি করুণায় ভরপুর। এত করুণা যে অপরের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

পাঠক, এইসব প্রমাণের একটিও নিশ্চয় অগ্রাহ্য করিবার মতো নয়। কিন্তু এতো সবে কলির সন্ধ্যা। আরও প্রমাণ আছে, সাতচল্লিশ হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী প্রমাণ আছে, এইটুকুতে কত আর লিখিব ? জ্যামিতি, বীজগণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ণশাস্ত্রের সহায়তায় আমি প্রমাণ করিয়াছি যে ভগবান বাঙালী। কেবল একটি সন্দেহ এখনও মনের মধ্যে খচখচ করিতেছে, কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই, তাহা এই যে ভগবান বাঙালীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, না বাঙালী ভগবানকে সৃষ্টি করিয়াছেন—অথবা দুই-ই তৃতীয় কোন সত্তার দ্বারা সৃষ্ট। যাহাই হউক না কেন, আমার এই নিরেট গবেষণা প্রকাশ হইলে বাঙালীর ভগবৎসমত্ব প্রমাণ হইবে। তখন বাঙালী বিশ্বের যাবতীয় জাতির পূজা আদায় করিবে এবং যথার্থভাবে বলিতে পারিবে—"আমরা বাঙালী"—অর্থাৎ পাঠক, তুমি আমি খুদু নেড়া যদু মধু এরা ভগবান—সবাই বাঙালী।

এই স্ব-নির্বাচিত গল্পগ্রন্থ সিরিজের প্রতিটি গ্রন্থে একটি করিয়া এই ধরনের কূপন থাকিবে। কূপন-গুলিতে সিরিজের সংখ্যানুসারে একটি ক্রমিক নম্বর দেওয়া থাকিবে। বারোখানি বিভিন্ন সংখ্যক কূপন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীতে দিলে একখণ্ড স্ব-নির্বাচিত গল্পগ্রন্থ (যাহার ক্রমিক-নম্বর-যুক্ত কূপন আপনার নাই) বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। একই নম্বর-যুক্ত **দুটি** বা **ততোধিক** কূপন গ্রাহ্য হইবে না।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

